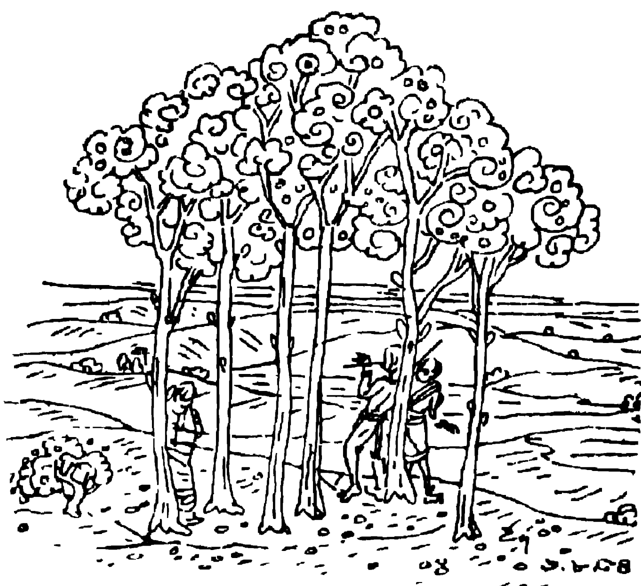


বনভূমি

উৎসর্গ

শ্রীসারদা ভট্টাচার্য

বন্ধুবরেষু

বনভূমি

বিমল কর



ত্রিবেণী প্রকাশন
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

প্রথম ত্রিবেণী সংস্করণ
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
১৭৭এ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ৪

মুদ্রাকর
দেবেন্দ্র নাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

প্রচ্ছদশিল্পী
ইন্দ্র দুগার

বর্ণলিপি
অর্ধেন্দু দত্ত

বাঁধিয়েছেন
ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

দাম তিন টাকা

কোনো কোনো পুরনো লেখা সম্পর্কে লেখকের নিজের এক আশ্চর্য দুর্বলতা থাকে। বছর চারেকেরও বেশি হল, 'ঝড় ও শিশির' নামে আমার যে উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্পর্কে আমার দুর্বলতাও সে-ধরনের। তার কারণ হয়ত এই, বিশুদ্ধ সাহিত্য-উপন্যাস বলতে ওইটিই আমার প্রথম গ্রন্থ। দ্বিতীয় কারণ, আলোচ্য উপন্যাসের আঙ্গিক অথবা বক্তব্য, আমার ধারণা, মামুলি ছিল না। একটি সুসম্পূর্ণ একক-কাহিনী গড়ে তোলার ওপর চোখ না রেখে, চেষ্টা করেছিলাম একটি মূল আইডিয়াকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যাচাই করতে। সাফল্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ভিন্ন রুচি পাঠক, ভাল মন্দ লাগা সম্পূর্ণ তাঁদের ব্যাপার। গ্রন্থটি নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় তা ছাপা হল। নতুন করে ছাপাই শুধু নয়, নতুন করে অনেক কিছু যোগ-বিয়োগ করতে হয়েছে। প্রায় ঢেলে সাজা আর কি। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে বলতে পারি না। তবে এক বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, নতুন নামকরণের দ্বারা উপন্যাসের বক্তব্য আরও সুপরিস্ফুট হয়েছে।

উপেক্ষা অবহেলা কিছু কম নয় ; পায়রা খোপের মতন ছোট একটি ঘর, ঢেউ-খেলান টিনের যৎসামান্য আচ্ছাদন—প্লাটফর্মের কোনো অস্তিত্বই নাই, তবু লোকে বলে স্টেশন, টাইম টেবলের পাতায় একটি নামও পাওয়া যায়, বারবুয়া। বি-এন রেলের কোনো এক ব্রাঞ্চ লাইনের একেবারে শেষ স্টেশন।

মিটার গেজ লাইনের পল্‌কা পথ ধরিয়া সকালে একটা মালগাড়ি আসে। তাহারই শেষপ্রান্তে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুটি কামরা জোড়া। কয়েকজন যাত্রী কোনোদিন নামে, কোনোদিন নামেও না। বিকালে যখন কয়লা বোঝাই হইয়া মালগাড়িটা ফেরে—প্যাসেঞ্জার গাড়ির কামরা দুটি আবার জুড়িয়া দেওয়া হয়। কদাচিত রাত্রে কোনো স্পেশ্যাল গুড্‌স ট্রেন আসে। নয়ত বারবুয়া স্টেশনের ঘর, শেড্‌, সম্মুখের বন্ধুর জমিটুকু, লাইন আর মাঠ-আগাছার বিস্তৃত প্রান্তর, এমনকি কাঠের জাফরি দেওয়া একটি কোয়ার্টারও এই নিরিবিলিতে মন্থর প্রহরের সহিত তাল রাখিয়া আলস্য আর ঘুমে নিঃঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে।

বারবুঁয়ার জীবনের স্পন্দনটা এমনই মৃদু, মন্থর, বিলম্বিত ছন্দে গাঁথা।

বন্য প্রকৃতির কিছু খামখেয়ালি বদান্যতা ছাড়া বারবুয়ায় আর কি বা আছে! আশে পাশে অরণ্যের আভাস, সেগুন শাল কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় রুক্ষ ফাটল-ধরা ভূমির বিস্তৃত প্রচ্ছদপট, আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। দূরে পাওয়ার হাউসের চিমনির একটি কালো সুউচ্চ চোঙা দেখা যায়। নিরবচ্ছিন্ন ধূম্রোদ্গার করিতেছে। আরো দূরে এই অরণ্য পরিবেশের অন্তরালে কিছু ভূমিজ সম্পদ। কয়লা খাদ। লোকে বলে, কয়লা খাদের জন্যই এই স্টেশন—বারবুয়ার অস্তিত্ব। কয়লা বোঝাইয়ের মাশুলটা হিসাবে জমা না পড়িলে বারবুয়া রেল-কোম্পানীর লোকসানের অংশ নিছক জারি করিত বৈ তো নয়।

বারবুয়ায় কিছু মানুষও আছে। স্টেশন মাস্টার হেমন্তবাবু, পোর্টার শিবলাল, কাওয়ালী হীরা। স্টেশনের ক'হাত দূরেই কাঠের জাফরি-আড়াল

বারান্দা ঘেরা ছোট একটি কোয়ার্টারে সপরিবারে হেমন্তবাবুর বাস। সপরিবারে বলিতে স্ত্রী পদ্ম আর পাঁচ বছরের একটা মেয়ে। কন্যা নয় ; ভাগ্নি। পোর্টার শিবলাল থাকে হোম-সিগনালের কাছে—ভাঙ্গা মালগাড়িতে। স্টেশনের সামনে, টিনের চালা তোলা ঘরে হীরা। হীরার সাথী বলিতে লছমী—বছর তেরো বয়স। স্টেশনের চৌহদ্দির এ-পাশে ও-পাশে কাছাকাছি দু-চার ঘর কুলিকামিন যে না আছে তাহা নয়। অবশ্য এই এলাকার বাহিরে মানুষ কিছু কম নাই। বারলেস্ কোম্পানির পাওয়ার হাউস আর খাদের কল্যাণে খানিকটা দূরেই একটা বসতি আছে। দু'চার মাইলের মধ্যে ছোট ছোট খাদ চালুর জায়গাগুলিতেও ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, কুলি কামিনের বাস। তবে ইহাদের সহিত বারবুয়ার সম্পর্ক অল্পই। নেহাত কোথাও যাওয়া-আসার বেলায় স্টেশনে আসিয়া গাড়ি ধরে, গাড়ি হইতে নামিলে বাড়ি ফেরে। সপ্তাহে একটি দিন শুধু বারবুয়া স্টেশনে ভিড় জমে, কিছু কলরব শোনা যায়। সে-দিন দুটি ট্রেন চাব দফা যাওয়া-আসা করে—বারবুয়া আর খিদরগাঁওয়ের মধ্যে। রবিবারে বিরাট হাট বসে খিদরগাঁওয়ে। সপ্তাহের খোরাকি সংগ্রহের জন্য আশেপাশের কয়লাখাদের মানুষগুলি বারবুয়ায় ভিড় জমায়।

সপ্তাহের ক্ষণিক অতিথিগুলি বারবুয়ার জীবনে কিছুটা জীবন স্পন্দন জাগায় বটে, কিন্তু অস্থায়ী এই চঞ্চলতা রাতের অন্ধকারেই বারবুয়ার জীবন হইতে মুছিয়া যায়। আবার সেই একটানা অলস মন্থর নিরুপদ্রব জীবন।

বারবুয়ার মানুষগুলিও যেন এই ঢিলে ঢালা সাধারণ ছন্দের সহিত ছন্দ মিলাইয়া একটানা মৃদু মন্থর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

হঠাতই ছন্দ পতন।

আকস্মিকভাবে একদিন ঝড় জাগিল। সব ঝড়ই যেমন সর্বনাশা ঝড় নয়, তেমন আবার কোনো কোনো ঝড়ে গাছ পড়ে, ঘর ভাঙে, ভিতরে বাহিরে একটা ওলট পালট ঘটিয়া যায়।

বারবুয়ার আকাশেও একদিন কালবৈশাখীর ঝড় জাগিল।

সূর্যাস্তের শেষ মুহূর্তে ঈশান কোণের আকাশটা হঠাৎ বড় বেশি লাল হইয়া উঠিল। অসহ্য গুমোট আবহাওয়া। সমস্ত জায়গাটা থমথম করিতে থাকে। নভোচারী শকুনির দল নীচে নামিয়া আসে। পাখি পাখিদের পাখার শব্দে আর কর্কশ চীৎকারে আশু দুর্ঘটনার আভাস।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কী যেন ঘটিয়া যায়। নিকষ কালো মেঘের দল বন্য মহিষের মত আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য কোণ হইতে ছুটিয়া আসে।

চোখের নিমেষে সমস্ত আকাশটার রূপ বদলাইয়া যায়। ব্লটিং পেপারের উপর কে যেন কালো কালি ঢালিয়া দিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

ঝড় জাগে। কালবৈশাখীর ঝড়।

উপরতলায় এবার অট্টহাসির হাট; নীচেরতলায় মাটির পায়ে মাথা কোটাকুটি।

ঝড় বাড়িতে থাকে।

এই বয়সে এমন ঝড়বৃষ্টি হেমন্তবাবুর আব ভাল লাগে না। বরং ভয় হয়। প্রকৃতির কযেক ঘণ্টাব হঠকারিতাব ফলাফল হয়তো তাঁহাকে সপ্তাহ এমন কি মাসখানেক ধরিয়াও ভুগিতে হইতে পাবে। কোথায় যে কি হইবে কে জানে! লাইন ঠিক থাকে কিনা, টেলিগ্রাফেব তার টি কিবে, না ছিঁড়িয়া তছনছ হইয়া যাইবে কে বলিবে! তেমন কিছু হইলে কাজের আর বিরাম নাই। 'টরে-টক্কা' কবিতে করিতে এবং তদাবক করিতে আসা, ট্রলির উপর সমাসীন সাহেবকে সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইবে।

পঞ্চাশের সীমানায় আসিয়া এই নির্বান্ধব পুরীতে স্টেশনমাস্টারী করা আর চলে না। লোকে বলে বটে, তাঁহার আর কিই বা কাজ? এটা কি একটা স্টেশন নাকি? দ্বিতীয় লোকেব প্রয়োজনই বা কেন হইবে? লোকের কথা আলাদা। তাহারা কি-ই বা বোঝে!

হেমন্তবাবু তক্তপোশ হইতে নামিয়া আসিয়া টেবিলটার কাছে দাঁড়ান। কি করা যায়? এ ভাবে একা একা ভালো লাগে না। পদ্ম যে রান্নাঘরে কি কবিতেছে কে জানে? টিন চাপা পড়িয়া শেষ পর্যন্ত মেয়ে আর বউটা না মারা পড়ে। পাঁচ বছরের একটা মেয়ে—তাহাকে লইয়া মাথা খারাপ হইবার যোগাড়; খাটুনিরও শেষ নাই। বায়না ধবিয়াছে দিদিমাব কাছে যাইবে। ছোট ছেলেব বায়না, বিশেষত মাতৃহীন শিশুব চোখের জল সহ্য করা কঠিন। হেমন্ত বাবু নিঃসন্তান। পদ্মও দিন দিন কেমন যেন হইয়া পড়িতে ছিল। এবার বড় ভাগ্নির বিবাহে গিয়া পদ্ম প্রায় জোর করিয়াই কল্যাণীকে লইয়া আসিয়াছে। কল্যাণী হেমন্তবাবুর মেজ বোনের মেয়ে। অল্প বয়সেই মাতৃহীন হইয়াছে। দিদিমার কাছেই কল্যাণী মানুষ। দিদিমাকেই মা বলিয়া জানে। পদ্মর

আদর ও খেলনা কিনিয়া দিবার বহর দেখিয়া কল্যাণী অবশ্য পদ্মর সহিত পাড়ি জমাইয়াছিল। পাঁচ মাস মামা-মামির আদর যত্নে শরীরটা তাহার ভালোও হইয়াছে। কিন্তু মেয়েটা এখানে আর থাকিতে চায় না। রোজ দিদিমার জন্য বায়না ধরে। পদ্ম তাহাকে ভোলায়। হেমন্তবাবু জানেন—কল্যাণীকে আর বেশিদিন ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। তাহার দিদিমাও কল্যাণীকে রাখিয়া দিয়া আসিবার জন্য তাগাদা দিতেছেন। কলিকাতা কাছে নয়, সাতশো মাইলের উপর। তাই না। নচেৎ এতোদিন কবে কল্যাণীর দিদিমা লোক পাঠাইয়া নাতনীকে লইয়া যাইতেন।

কল্যাণী চলিয়া গেলে পদ্মর কি হইবে?

হেমন্তবাবু চিন্তিত মনে টেবিলের উপরকার এটা সেটা নাড়িতে থাকেন। ঘরে ঢুকিয়া পদ্ম বলে, 'কানে কি তোমার কিছুই ঢোকে না? কালা হয়ে বসে আছ?'

হেমন্তবাবু সচকিত হইয়া পদ্মর দিকে তাকান। পদ্ম কল্যাণীকে বিছানার উপর বসাইয়া দেয়।

—ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোকটা যে বাইরের দরজা ভেঙ্গে ফেলবার যোগাড় করল। শুনতে পাচ্ছো না?

হেমন্তবাবু বিস্মিত হন। এই ঝড় বাদলের দিনে কে আবার দরজায় ধাক্কা দেয়? বলেন, 'কই, কিছু শুনতে পাইনি তো? তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছো। বাতাসে কপাট নড়ছে।'

—আমি তোমার মতন কালা কি না? স্পষ্ট ডাকতে শুনেছি। যাও না, দেখোনা একবার। দেখতে তো ক্ষতি নেই।

হেমন্তবাবু স্বীকার করিলেন, সন্দেহ যখন হইয়াছে তখন একবার দরজা খুলিয়া দেখা উচিত।

লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া হেমন্তবাবু পাশের ঘরে গেলেন সদর দেখিতে।

দরজা খুলিয়া ধরিতে সত্যসত্যই এক ধূলি-ধূসরিত ঝড়ো মূর্তি ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সেই ঝড়ো মূর্তির দিকে তাকাইয়া হেমন্তবাবু অবাক।

দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া অমর হাঁপাইতেছে। কোথায় যেন ধাক্কা লাগিয়া তাহার কপালটা কাটিয়াছে। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটা যে বাঁচিয়া গিয়াছে ইহাতেই অমর খুশী। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ধূলা ভরতি মাথাটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অমর সংকোচ কাটানোর হাসি হাসে।

—কি [illegible] মশাই, চিনতে পারছেন না ?

প্রথমটায় চিনিয়া উঠিতে কষ্ট হইয়াছিল অবশ্য, কিন্তু এতোক্ষণে হেমন্তবাবু তাহাকে চিনিয়াছেন।

—অমরবাবু! এই ঝড় বাদলে কোথায় বেরিয়েছিলেন, মশাই ?

ধূলা ঢুকিয়া চোখটা করকর করিতেছে। অমর চোখ মেলিয়া তাকাইবার চেষ্টা করিল।

—আর বলেন কেন! শখ করতে গিয়ে প্রাণ-সংকট। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দু'চারটে ছবি তোলার ইচ্ছে ছিলো। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়ে পড়ি। তারপর ঝড়। দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করেছি। আপনার কোয়ার্টারটা না পেলে আজ অপঘাতে মরতে হতো।

হেমন্তবাবু বলেন, 'ভেতরে আসুন। কপালটা বেশ কেটেছে দেখছি।'

অমরকে লইয়া হেমন্তবাবু পাশের ঘরে আসেন।

পদ্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় অমরের দিকে তাকাইয়া পদ্মর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিল।

রান্নাঘরে আসিয়া পদ্ম তাড়াতাড়ি কেটলি করিয়া খানিকটা জল চাপাইয়া দেয়। হঠাৎ কেমন এক চঞ্চলতা আসিয়াছে। পদ্ম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে। বার বার খালি মনে হইতেছে মানুষটা আবার আসিয়াছে। আবার।

পদ্ম অমরের পায়ের কাটা জায়গাটা গরম জলে ধুইয়া টিন্‌চার আয়োডিন লাগাইয়া দেয়। শাড়ি ছেঁড়া কাপড় দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। মুখ তুলিয়া তাকাইতেই অমরের কপালের ক্ষতটুকুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। আয়োডিন ভিজানো তুলার প্রাচুর্যে ক্ষতস্থান যেন আরো ফুলিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অমর কিন্তু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাকায়। পদ্মও তাকাইয়া রহিয়াছে। ম্লান আলোয় পদ্মর সিঁথির সিঁদুর যতটুকু বা জ্বল জ্বল করে মুখটা কিন্তু তাহা অপেক্ষাও ম্লান দেখায়। পদ্ম হাসে; ম্লান হাসি।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে পদ্মর দিকে তাকাইয়া অমর বলে, 'আপনার তো অনেক গুণ!'

পদ্ম ওঠে। মুখ ফিরাইয়া বলে, 'তাই নাকি!' একটু থামিয়া আবার, 'যাক্ তবু আপনি বললেন; কেউ তো বলে না।'

হেমন্তবাবু তক্তপোশ হইতেই বলেন, অমরবাবু, এই দুর্যোগে আজ আর আপনি যেতে পারবেন না মশাই। আমাদেরও ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। খেয়ে-দেয়ে পাশের ঘরটাতে রাতটা কাটিয়ে দিন। কষ্ট অবশ্য হবে একটু, কিন্তু উপায় কি—!'

অসম্মত হইবার বা আপত্তি জানাইবার অর্থ হয় না। অমর একটু নীরব থাকিয়া সসঙ্কোচে বলে, আপনাদের খুব অসুবিধে করলুম্।'

—অসুবিধে কিসের! হেমন্তবাবু বলেন, 'আপনি বিপদে পড়ে আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। দু'মুঠো খাবেন আর একটা রাত শোবেন বই তো নয়! এতেই অসুবিধে! না মশাই, অতো অসুবিধে জ্ঞান আমাদের নেই।'

পদ্ম চলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'সুবিধে মত জায়গা এখানে আর কি আছে নাকি? তা হ'লে অবশ্য—'

পদ্মর কথায় কোথায় যেন একটা গূঢ় ইঙ্গিত ছিল আর ছিল চাপা হাসি, অমর তাহা বুঝিতে পারিল না।

কালবৈশাখীর সর্বনাশা ঝড়ের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সূর্যশংকরের মনটাও প্রভঞ্জনের দোলার মত দুলিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়-সমুদ্রের তটে তটে এক অপ্রতিরোধ্য জোয়ার আসিয়া বার বার আছড়াইয়া পড়ে। সেই জোয়ারের আশ্চর্য উন্মাদনা দেহময় ছড়াইয়া যায়; শিরায় শিরায় তাহারই আবেগ।

হরিণগতিতে সূর্যশংকর আগাইয়া চলে। গতির নেশায় মত্ত একটা অশ্ব যেন বল্গামুক্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নিঃশঙ্ক, নিঃসংগ, উদ্দাম।

অর্ধ-সভ্য জনপদটির টুঁটি চাপিয়া ধরা ঝড়বৃষ্টির মুখামুখি দাঁড়াইয়া সূর্যশংকর অবশেষে একসময় থামিল। জিপ্‌গাড়ির হেড্‌লাইট নিভাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিল।

মত্ত বিশ্বচরাচরের এ কী অপরূপ রূপ! আকাশ নক্ষত্রহীন; ঈষৎ তাম্রাভ। যেন রোষকষায়িত নয়নে একটা আদিম শ্বাপদ-সম্রাট নির্নিমেষ নয়নে এই সংসারটার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। উদরে তাহার অনাদি ক্ষুধা। লেলিহ-লোল-জিহ্ব পশুটা তাহার কৃতান্ত অনুচরগুলিকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া হিংস্র আনন্দে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। পৃথিবীর বুঝি আর মুক্তি নাই। বাতাস আর বাতাস নয়, লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ নাগিনীর বিদ্যুৎগতি রথ। দ্বিধা নাই,

শংকা নাই, করুণা নাই, ছোবলের পর ছোবল মারিয়া বসুন্ধরাকে তাহারা ক্ষত-বিক্ষত করিবে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে জগত সংসার লুপ্ত। মৃত্যুর মত একটা পারাপারহীন অন্ধকারের জোয়ার আসিয়া বনভূমিকেও গ্রাস করিয়াছে। রুদ্ধশ্বাস ভীতার্ত অরণ্যের প্রতি পত্রে পত্রে তাহারই মর্মান্তিক আর্তনাদ।

সূর্যশংকরও আকস্মিক একটা বেদনা অনুভব করে।

কে যেন গুমরিয়া কাঁদে। তাহার বড় জ্বালা, বেদনা। যে জ্বালার শেষ নাই। তুষের আগুনের মত বুকের কোথায় যে একটা আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলে, জীবনের সর্বরস শুষিয়া শুষিয়া ঊষর মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! সে অন্তর্জ্বালার বিরাম নাই, সে বেদনার উপশম নাই।...*Thou frail and baffled bird, thou weary thing, thou strong to suffer, of satanic pride, I take thee up into this height of pain*...অস্পষ্টভাবে আবৃত্তি করে সূর্যশংকর।

একটা সিগারেট ধরাইয়া মোহাচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকে; তাহার মনের মধ্যে কে যেন কথা কয়: মানুষের রক্তে এবং চেতনায় কোটি কোটি বৎসরের প্রাণ-পৃথিবীর একটা দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ আছে। একদিন তুমি এই প্রাণেই প্রাণ হইয়া এক হইয়া ছিলে। লুপ্ত ছিলে তাহার অণু-পরমাণুর বিচিত্র লীলায়। তারপর কেমন করিয়া যেন একদিন স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছ। যে তোমাকে স্বতন্ত্র করিল—হোক্ সে লীলাময় ঈশ্বর, প্রকৃতি—যাহা তোমার মনে হয় তাহাই; কিন্তু তোমার এক পূর্ণ প্রাণ হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইয়াছ। এ বেদনা বুঝি সেই অসহায় প্রাণ কণিকার।

একটা আকস্মিক আর্ত-চিৎকারে সূর্যশংকর চমকাইয়া ওঠে। মনের ঝড় মিলাইয়া যায়।

সামনেই একটা বাজ পড়িয়াছে। পাওয়ারহাউসের বাতিগুলা চোখের নিমিষে নিভিয়া গেল।

জলের ঝাপ্টায় সে ভাসিয়া গিয়াছে।

হেড্‌লাইট জ্বালাইয়া দিতেই চোখে পড়ে, সামনে পথের একপাশে একটা বড় পাথরের গায়ে ভীতি-বিহ্বল এক মূর্তি। বিশৃংখল বেশবাস জংলী একটা মেয়ে।

খুব সম্ভব কয়লা চুরি করিতে আসিয়া ঝড়ের মুখে পড়িয়াছে।

হেডলাইটের আলোয় এই মেয়েটাকে সূর্যশংকরের ভাল লাগে। গাড়ি হইতে নীচে নামিয়া যায়।

বাংলোর সামনে আসিয়া সূর্যশংকর জিপ্ থামাইয়া নামিয়া পড়িল। দোনলা বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া সুভদ্রাকে ডাকিল, 'আ-যা—'

জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সূর্যশংকর বারান্দায় উঠিয়া আসিল। সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ। মধ্যকার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দরজাব খড়খড়ির উপর যেন খানিকটা আলো।

সূর্যশংকর দরজায় ধাক্কা দেয়।

কোনো সাড়া শব্দ নাই। বারান্দা হইতে সূর্যশংকর দেখে প্রলয় তখনও থামে নাই। বরং আরো বুঝি বাড়িয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকাব আর অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে সামনের অরণ্যের পাগল করা মূর্তিটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কানে বাজিতেছে অবিশ্রান্ত জলধারার শব্দ আর ক্ষুব্ধ প্রকৃতির গর্জন।

সূর্যশংকর এবার বুটের ঠোক্করে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে।

ভিতরের লোক বুঝিতে পারে দরজায় কে যেন প্রবল জোরে ধাক্কা দিতেছে।

সার্শি খুলিয়া দরজাটা অর্ধেক মেলিয়া ধরিতেই সূর্যশংকর সুভদ্রার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। যে দরজা খুলিয়াছে তাহাকে একটা ধমক দিবার জন্য মুখ তুলিতেই সামনের একজোড়া চোখের উপর দৃষ্টি আটকাইয়া যায়। মুখের কথা মুখেই থাকে।

নিষ্পলক নয়নে নারী মূর্তিটির পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সূর্যশংকরের মুখে বিস্ময়ের ছায়া ভাসিয়া ওঠে। তাহার মনে হয়, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না তো!···অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারা যায়, স্বপ্ন নয়; সূর্যশংকর যাহাকে দেখিতেছে সে রক্ত-মাংসে গড়া বনলতা। বনলতাও বিস্মিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বিস্ময় বেদনার মধ্যে যেন চাপা পড়িয়াছে।

রুদ্ধবাক সূর্যশংকর নিজেকে ফিরিয়া পায়।

— বনলতা?

সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়া লইতে বনলতার বিলম্ব হয় নাই। হইবার কথাও

নয়। সূর্যশংকরের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি সংবাদ দীর্ঘদিন ধরিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে। এই ধরনের দৃষ্টিকটু দৃশ্য যে তাহাকে নিজের চোখে দেখিতে হইবে এতোটা হয়তো সে কল্পনা করে নাই।

বনলতা মুখে কিছু বলিল না, কেবলমাত্র প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলিয়া সূর্যশংকরের সঙ্গিনীর প্রতি তাকাইয়া রহিল।

সূর্যশংকর যাহাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে আনিয়া তুলিয়াছে তাহাকে এতোক্ষণে আলোয় স্পষ্টভাবে দেখা গেল। বনলতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেও সঙ্গিনীর পানে তাকায়। সিক্তবাস, অর্ধনগ্ন, জংলী মেয়েটার রূপ না থাক যৌবন আছে। আর সে-যৌবন অত্যন্ত প্রখর ভাবেই বনলতার চোখকে বিঁধিতেছিল। সুভদ্রা জংলী হইলেও জানোয়ার নহে। ঘরের মধ্যে আলোয় সে যেন কিছুই সহ্য করিতে পারে না; এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া খোলা দরজা দিয়া ছুটিয়া পালায়।

সূর্যশংকর শুধু একবার ফিরিয়া তাকায়।

হাতের বন্দুকটা চেয়ারেব গায়ে ঠেস দিয়া রাখিতে রাখিতে সূর্যশংকর বলে। '—হঠাৎ? কি মনে করে?'

বনলতা সে কথার উত্তর দেয় না। সব কিছু সহিয়া লইবার জন্য খানিকটা সময় দবকার।

ব্রিচেস খুলিয়া বাহাদুরকে হাঁক পাড়ে সূর্যশংকর। তারপর বনলতার দিকে তাকাইয়া বলে, '—কলকাতা থেকে একলা এলে নাকি?'

—না। অমরের সঙ্গে এসেছি।

—অমর? কোথায় সে?

—জানি না। বিকেলে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নি।

সূর্যশংকর চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরায়। '—কবে এসেছো?'

—আজ তিন দিন। এসে শুনলাম সেদিন সকালেই তুমি শিকার করতে বেরিয়েছো!

—হ্যাঁ। একটা বাঘের খবর পেয়েছিলাম।

বনলতা সোজাসুজি সূর্যশংকরের দিকে তাকাইয়া এবার বাঁকা সুরে বলে 'দেখলাম তো স্বচক্ষে।'

—কি?

—বাঘ নয় বাঘিনী।

সূর্যশংকর কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তারপর দরাজ গলায় হাসিয়া ওঠে। —'ঠিক বলেছো।'

বনলতাকে তাহার ছোট নকশা-পাড় সাদা শাড়িটায় বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটে। 'তারপর কি মনে করে হঠাৎ?' সূর্যশংকর আবার প্রশ্ন করে।

বনলতা আহত হয়। বলে 'তোমার কাছে এসেছি তারও কৈফিয়ত দিতে হবে!'

—কৈফিয়ত কেন, কারণটা জানতে চাইছি।

—কারণ! ধরো না কেন অকারণেই এসেছি।

সূর্যশংকর উঠিয়া দাঁড়ায়। খানিকটা পায়চারী করে। বলে, 'আসা উচিত হয়নি।'

বনলতা শুধু কানেই শোনে না, কথাটা যেন তাহাকে এক অন্ধকার গুহায় ছুঁড়িয়া দেয়।

সে কী যেন বলিতে চায় কিন্তু সূর্যশংকর তাহার সামনে নাই।

খাবার টেবিলে আবার মুখামুখি।

সূর্যশংকর নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত মনে মুরগীর মাংসটা শেষ করিয়া প্লেটটা সরাইয়া রাখে।

বনলতা সামনের মানুষটার রূঢ়তা এবং উপেক্ষা চুপচাপ সহ্য করে।

কিছু বলিবার নাই। যুক্তি দিয়া যাহাকে বোঝানো চলে সে-মানুষ সূর্যশংকর নয়। বুদ্ধির গিঁট বাঁধা সহজ সড়ক ধরিয়া সূর্যশংকর হাঁটে না—তাহার প্রকৃতিও যেমন বন্য, চলার পথটাও তেমনি মনের গরজে শৃংখল-শূন্য।

খাওয়া শেষ করিয়া সূর্যশংকর পাইপ ধরাইয়াছে। তীব্র কটু ধোঁয়ার বাঁকা রেখা উঠিয়া তাহার মুখের পাশে খেলা করিতেছে। বনলতা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহাই দেখে। সূর্যশংকরের তামাটে মুখটা বনলতার কাছে দূর আকাশের তারার মতই দূরান্তরের আলো বলিয়া মনে হয়।

সূর্যশংকর হঠাৎ কথা বলে—'শুতে যাবে না?'

—যাই। বনলতার যেন ঘোর কাটে।

বনলতা মুখে বলে 'যাই' কিন্তু যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবে সূর্যশংকরকে কি করিয়া নিজের মনের কথা বুঝাইবে। সূর্যশংকরও এ-ভাবে বনলতার দৃষ্টির সামনে বাসয়া থাকিতে থাকিতে সম্ভবত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। হাই তুলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। পাশের দেওয়ালে একটা সদ্য শুখনা ভল্লুকের চামড়া ঝোলানো ছিল সূর্যশংকর তাহাই পরখ করিয়া দেখিতে থাকে।

অবশেষে বনলতা উঠিয়া দাঁড়ায়।

—আমি ফিরে গেলে সত্যিই তুমি খুশী হবে।

প্রশ্নটা আচমকা। সূর্যশংকর তাকায়।

—খুশীটা তো ঘটা করে দেখাবার জিনিস নয়।

বনলতার বিস্ময় মাত্রা হারায়। কঠিন আঘাত পাইলে মানুষ যেমন জ্বালাধরা ক্ষেদোক্তি করিয়া থাকে বনলতা ঠিক তেমন স্বরেই বলে, 'না হ'লে বুঝি দেখাতে!'

ভাবাবেগে বনলতার গলা কাঁপিতে থাকে। তাহার সুশ্রী মুখের রেখাগুলি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

সূর্যশংকর শব্দ করিয়া হাসে না, কিন্তু তাহার পুরু ঠোঁটের পাশে আশ্চর্য একটা হাসি ফুটিয়া ওঠে।

—কিন্তু আমি তো তোমায় ডাকিনি, বনো!

সূর্যশংকর এই প্রথম বনলতাকে অতীত দিনের সেই একান্ত করিয়া ডাকা নাম ধরিয়া ডাকিল। বনলতার কানে এ-ডাক এড়াইয়া যাইবার নয়। ক্ষণেকের জন্য বনলতার অনুভূতি কী যেন একটার স্বাদ পাইয়া শিহরিয়া ওঠে।'

বনলতা চুপ করিয়া থাকে। বহুদিনের সঞ্চিত একটি বর্ণ-বহুল মুহূর্ত সুযোগ বুঝিয়া মনসমুদ্রে ডুবুরী হইয়াছে।

বনলতার আকস্মিক ভাবান্তর যে ভাবপ্রাণতার অলীক ঐশ্বর্য সূর্যশংকর অবশ্য তাহা বুঝিতে পারে। স্মৃতি-মন্থনের বিলাসিতায় যে গরবিনী তাহাকেও কিন্তু দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকিতে দিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

বনলতার করুণ মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সূর্যশংকরের মনে হয়— বেফাঁস সম্বোধনটা না করিলেই হইত। ইহাতে আর কিছু হোক্ আর [illegible] হোক্ বনলতা হয়তো সূর্যশংকরের এই দুর্বলতাটুকুর সুযোগ লইতে ছাড়িবে

না। সূর্যশংকর একান্ত ভাবেই তাহা চায় না। বরং বনলতাকে আরও রূঢ়, আরও নির্দয়ভাবে আঘাত করিতে পারিলেই ভালো হয়।

—কি হলো, চুপ করে থাকলে যে—? সূর্যশংকর অগত্যা কথা বলে।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বনলতা জবাব দেয়, 'কি বলবো।'

—বলার কিছু নেই। তা ভালো। এবার তা হলে তুমি শুতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।

আকাশের কোলে কোলে মেঘ করিয়া আসার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা হঠাৎ সূর্যালোকের তীব্রতায় নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট হইয়া গেলে যেমন একটা খাপছাড়া অবস্থার সৃষ্টি হয়, বনলতার মনের অবস্থাও তাহাই হইল। দীর্ঘ দাহন সহ্য করিবার পর হঠাৎ কোথা হইতে যেন বৃষ্টির সিক্ত গন্ধ আসিয়া তাহার মনটাকে সবে মাত্র মেদুর করিতেছিল অকস্মাৎ সমস্ত দৃশ্যটা একেবারে বদলাইয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বনলতা বলে, 'আমাকে শুতে পাঠানোর জন্যে তোমার এতো তাগিদ কেনো?'

তাগিদ? ও হ্যাঁ তাগিদই। আমার নিজের গরজে। আমি খুব টায়ার্ড। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

কথা শেষ করিয়া সূর্যশংকর বড় রকম একটা হাই তুলিয়া শেষে হাসে। হাসিটা অনেকটা বিনয় করিয়া বেত মারার মত। অন্তত বনলতার তাহাই মনে হয়। তাহার হঠাৎ আরও মনে হয়—সূর্যশংকরের ব্যবহারে কোথাও একটু সাধারণ ভদ্রতাও নাই। একটু আনন্দ, আশা, খুশী—; না কিছুই না। উপরন্তু বনলতা নিজের গরজে আসিয়াছে বলিয়া সূর্যশংকর অনাহূতকে চূড়ান্ত অবজ্ঞা উপেক্ষা করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে বনলতার মনটা ক্রমশই যেন সূর্যশংকরের উপর বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকে। বিশেষত এই যে অপমান, এ-অপমান বনলতার সহ্য হয় না। বলে, 'আমার কাছে দুদণ্ড বসে থাকতে তোমার ঘুম পায়—কিন্তু আর কোথাও দিনের পর দিন রাতের পর রাত জেগে থাকলেও তোমার ঘুম পেতো না।'

—কে বললে?

—বলবে আবার কে, আমি জানি। কিন্তু থাক্। দরকার নেই আমার ওসব কথা তুলে। বনলতা সূর্যশংকরের কথায় বাধা দেয়। একটু নীরব থাকিয়া উষ্ণকণ্ঠে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমার কথাটা আজই সেরে নিতে চাই। একটু অপেক্ষা করবে?'

—বেশ। বলো!

—আমি কেন এসেছি তা কি তুমি জানো না?

—না। আমি যখন তোমায় আসতে বলিনি তখন কেন তুমি এসেছো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

—তা হলে আমিই বলি! আমি এসেছি তোমার কাছে থাকতে।

বনলতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সোজাসুজি তাহার মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলে। সূর্যশংকর নীরবে কি যেন একটু ভাবিয়া লয়—শেষে বলে 'আমার সঙ্গে কোন্ সম্পর্কে তুমি থাকবে?'

—যে সম্পর্ক আছে আমাদের।

—অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী?

বনলতা নীরব থাকে।

—না, তা হয় না। সূর্যশংকর মাথা নাড়ে।

—হয় না। কেন?

—খুব সহজ কারণে। আমাদের সম্পর্ক অনেক আগেই ভেঙে গেছে।

কথাটা অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বনলতার কানে আসিয়া বিঁধিল। এতোটা সে স্বপ্নেও আশংকা করিতে পারে নাই। নিথর, নির্বাক বনলতা শুধু মাত্র তাকাইয়া তাকাইয়া সূর্যশংকরেব ভাবলেশহীন মুখখানা দেখিতে থাকে। মনে মনে কি ভাবে কে জানে—হয়তো কিছুই ভাবিবার মতন তাহার অবস্থাও নয়, তথাপি বনলতার ঠোঁটের আগায় অস্পষ্ট জড়িত একটা শব্দ বাহির হইয়া আসিয়াই আবার সেই মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়।

অল্প কয়েকটি মুহূর্ত। একটু পরে সূর্যশংকর বিনা বাক্যব্যয়ে, ঘরের বাহিরে বারান্দা দিয়া অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আর বনলতার সর্বাঙ্গ কেমন একটা রুদ্ধ আবেগে কাঁপিয়া উঠিতেই সে সামনের চেয়ারটায় বসিয়া পড়ে। সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো ভল্লুকের কালো চামড়াটা হঠাৎ যেন বনলতার চোখের পর্দাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কিছুই আর সে ভাবিতে পারে না, দেখিতেও পায় না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের উন্মত্ততায় হীরা ক্ষণে ক্ষণে শিহ[illegible]

পাশের অশ্বত্থ গাছের বিরাট একটা ডাল্ মড়্মড়্ করিয়া ভাঙ্গি[illegible]

ক্ষ্যাপা বাতাসের চাবুকে হীরার পুরানো টিনের চালা আর তেঁতুলকাঠের পল্কা কপাট আর্তনাদ করিতেছে। ঘরটা কি শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িবে নাকি? হীরার ভয় হয়। তাহার সাথী ছোট মেয়েটাও বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল। একা থাকিতে হীরা ভয় পায় না। একাই জীবনের বিপজ্জনক দিনগুলি সে কাটাইতেছে। কিন্তু এই দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বাধা দিবার শক্তি যে হীরার নাই।

—লছ্‌মি—এ লছ্‌মি? হীরা মেয়েটাকে ডাকে।

আশ্চর্য, লছমী কোন উত্তর দেয় না। শুইয়া শুইয়া লছমী ভাবিতেছিল গোরা সাহেবের আয়ার কথা। আয়াটা তাহাকে প্রায়ই বলে—লছমীকে সে ভালো চাকুরি জুটাইয়া দিবে। লছমী সেখানে কাজ করিলে ভালো ভালো জামা কাপড় পরিতে পাইবে। ভালো খাবার খাইবে। কাজ তেমন কিছু নয়, অর্জুন সিংয়ের কাঠগোলায় থাকিতে হইবে। রান্না করিয়া দিতে হইবে অর্জুন সিংকে। হীরার কাছে লছমী আর থাকিবে না। হীরা তাহাকে মারে। স্টেশনের নতুন একটা কুলি আসিয়াছে। অল্প বয়স; নাম শিবলাল। শিবলালের সহিত লছমী আজ অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছে; বিড়িও ফুঁকিয়াছে। হীরা তাহাকে বিড়ি খাইতে মানা করে না—কিন্তু শিবলালের সহিত গল্প করিতে দেখিলে চটিয়া ওঠে। আজ হীরা লছমীকে চুলের মুঠি ধরিয়া মারিয়াছে। যা তা গালাগালি করিয়াছে। লছমী হীরার কাছে আর থাকিবে না।

লছমীকে নিরুত্তর দেখিয়া হীরা ভাবে—ও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেনই বা না ঘুমাইবে! লছমীর ভয় নাই। ভয়ের বয়স এখনো ঠিক হয় নাই।

হীরাও একদিন এমন ভাবে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইত। তখন তাহার দিদি বাঁচিয়াছিল। বরং বলা ভালো, বুক দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। দিনের পর দিন নূতন নূতন পুরুষকে দিদি তাহার আমন্ত্রণ করিত; তাহাদের আদর, আব্দার, অত্যাচার সবই মুখ বুজিয়া সহ্য করিত। হীরা তখন ছোট; লছমীরই মতন; বছর তেরো বয়স। আজও মাঝে মাঝে সেই সব কথা মনে পড়ে।

ঝড়, না কেউ দরজায় ধাক্কা দিতেছে?

হীরা সচকিত হইয়া তাকায়। ভীষণ জোরে কে যেন দরজায় ধাক্কা মারিতেছে। এত রাত্রে কে ডাকে?

রেড়ির তেলের ডিবাটা উজ্জ্বল করিয়া হীরা হাঁকে—'কৌ—ন?'

উত্তর একটা আসে বৈকি। কিন্তু সে উত্তর শোনা যায় না। হীরা ওঠে। যেই হোক, মানুষ তো! মানুষকে হীরা ভয় পায় না।

দরজা খুলিয়া ধরিতে যে লোকটা ঘরে ঢুকিল হীরা তাহাকে চেনে। গার্ড সাহেব। নাম পিটার।

পিটার গায়ের কোটটি খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে হাঁপায়। বলে, 'হীরাবাঈ, পানিমে সব বরবাদ্ হো গ্যয়া।'

কোটটা একেবারেই ভিজিয়া গিয়াছে। জল ঝাড়িয়া পিটার দড়ির উপর তাহা টাঙ্গাইয়া দেয়। পায়ের জুতা খুলিতে থাকে। বলে,—'শালে পাইলট্ নেহি আয়া। লাইন্ সায়েদ টুটা হ্যায়। ব্রেকমে ম্যায় একেলা।'

পিটারের কথায় বাধা পড়ে! হীরা বলে,—গাড়ি?

—হোগা গাড্ডামে; মেরা ব্রেক্‌ভ্যান ভি লাইনসে উতার গ্যয়া।

পিটার হাসে। হাসিরই কথা বটে। লাইন ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে পড়ুক; এমন কি পাইলট্ ইঞ্জিনটা পর্যন্ত শান্টিং শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিল না ইহাতে পিটাব ছাড়া কে-ই বা হাসিবে? রেলে কাজ করিয়া করিয়া পিটার এমনই হইয়াছে। রেলের ক্ষতি তাহার ভালো লাগে।

—খানা তো কুছ্ খিলা দে হীরাবাঈ। ভূখ শালে দুষমন। পিটার বলে। ক্ষুধায় লোকটা ভীষণ কাতব।

হীরা নিজের ভাঁড়ার খোঁজে।

হীবার ভাঁড়ারে অতি প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যায়। খুব ছোট একটা মুদি, হোটেল আর পানের দোকান মিশাইয়া এক করিলে যাহা হয় হীরার ভাঁড়ার তাহাই। হীরার কাছে লোকে ছাতু কিনিতে আসে; আসে পান, বিড়ি এমন কি হাতীমার্কা সিগারেট কিনিতে। গার্ডসাহেবেরা যখন গাড়ি লইয়া আসেন তখন হীরার কাছ হইতে চা, পান আনান—দরকার পড়িলে 'আর্ডাব' দিয়া খাবারও তৈয়ার করাইয়া লন।

হীরা যেন এই মরুপ্রান্তরের পান্থপাদপ।

হীরার নিজের খাওয়া হয় নাই। ওবেলা রুটি সেঁকিয়াছিল। এখনো তাহা আছে। পিটার সাহেবকে খানিকটা ভাজি আর চা করিয়া দিলেই হইবে।

আগুন ছিল না। মাটির সরাইয়ের মত একটা পাত্রে খানিকটা আঁচ করিয়া ভাজি আর চা তৈয়ারী করে হীরা। নিজের রুটি তুলিয়া দেয়।

খাওয়া শেষ করিয়া পিটার কলাই-করা মগে চা খাইতে খাইতে হীরার আর একচোট তারিফ করিয়া লয়।

পিটার খাটিয়াটার উপরই শুইবার ভঙ্গিতে কাত হইয়া বসিয়াছে। আর মাত্র হাত চারেক দূরে কুলঙ্গীর সামনে হীরা বাঁকা ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসে।

—হীরাবাঈ, মালুম হ্যায় তোমারহি—ম্যায় ক্রিশ্চান!

হীরা মাথা নাড়ে। বলে, 'ঝুটা বানায়া গার্ড সাহাব—তামাম চীজ আপনে ঝুটা কর্ দিয়া।'

হীরা হাসিতেছে। সে হাসি সুন্দরী নারীর। হীরা রূপসী। শুধু রূপসী বলিলেও হীরাকে ঠিক বোঝানো যায় না। হীরার রূপের খ্যাতি আছে এই অঞ্চলে। অনেকেই আসে রূপসী হীরাবাঈকে বেহেস্তে লইয়া যাইবার আমন্ত্রণ জানাইতে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হীরা সকলকে হাঁকাইয়া দেয়। অথচ হীরার সহিত প্রয়োজন প্রায় সকলেরই। এটা সেটা কিনিতে হীরার কাছে পদ্মকেও কুলি পাঠাইতে হয়। হীরা দাম লইয়া সকলের প্রয়োজন মিটায়। পানওয়ালী হীরাকে তাই ভুল বুঝিয়া অনেকে দেহের দাম দিতে আসে। হীরা কিন্তু ওই একটি জিনিসে গররাজী। হাসি, ঠাট্টা, মস্করা যা চাও হীরা প্রাণ ভরিয়া করিয়া যাইবে কিন্তু তাহার পর আর নয়। বাড়াবাড়ি করিলে হীরার নাকি আর একটা রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

পিটার মগ নামাইয়া বলে, 'সিগারেট্ দো চার দে দেও, হীরা।'

হীরা কৌটা হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আগাইয়া দেয়। হাতী মার্কা সিগারেট।

সিগারেট বাড়াইয়া দিতে আসিলে পিটার হীরার হাত ধরে। হীরা হাত ছাড়াইয়া লয় না, কেবলমাত্র হাসিয়া ওঠে। সেই হাসি পিটারের হৃদপিণ্ডটাকে আরও দ্রুত করিয়া তোলে। পিটার হীরার হাত ধরিয়া কোলের কাছটিতে টানে।

—বেয়াদব্! কৃত্রিম একটা ঝট্কা মারিয়া হীরা নিজেকে টানিয়া লইবার ভঙ্গি করে কিন্তু সরিয়া আসে না। বাঁকা চোখের পাশ দিয়া কটাক্ষ হানিয়া বলে, 'গার্ড সাহাব, হাড্ডিমে আগ্ হ্যায় হামারি ছোড় দেও।'

হীরার সে আগুনের তাপ যে পিটারের বুকে লাগিয়াছে। অনেকদিন হইতেই লাগিয়াছে। আজ যেন সেই তাপ ক্রমশই প্রখর হইতেছিল। এখন পিটারের শিরায় শিরায় আগুন।

—বাঈ, মেরি দিল—। পিটার হীরাকে আকর্ষণ করিয়া কোলের কাছে টানে।

পিটারের কথা শেষ হয় না, হীরা নিজেকে মুক্ত করিয়া সরিয়া আসে।

পিটার তাকায়। হীরা নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়া তেমনি বাঁকা ভাবে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

পিটার তাকাইয়া থাকে। রেড়িরতেলের ডিবার আলোয় হীরা যে আরও মাতাল হইবার খোরাক যোগাইবে কে জানিত! পিটার দেখে—যুবতী নারী। হীরার রূপ। চুলে, চোখে, মুখে। শুধু রূপ নয় রূপের আগুন; সে আগুন হীরার বাঁকা চাউনিতে, হাসিতে। হীরার মদির দেহের থরে থরে আগুনের আভা। পিটার মুগ্ধ, অবশ।

পিটার মনে মনে কি যেন ভাবিয়া নিজেকে সম্বরণ করিল।

—রোটিকা দাম লে লোও হীরা। কেত্না লাগেগি বোল্? সিগারেট ধরাইয়া পিটার বলে।

—রোটিকা দাম নেহি লাগেগি গার্ড সাহাব। পান আউর সিগরিট্‌কো দাম দিজিয়ে।

—কাহে?

হীরা সে-কথার উত্তর দেয় না। রুটির দাম সে লয়। সব কিছুরই দাম। কিন্তু অন্য সময়ে হীরা ব্যবসা করে। আজ এই ঝড় বাদলের দিনে একটি পরিচিত লোক আসিয়াছিল। হীরা নিজের মুখের অন্ন তুলিয়া দিয়াছে। এ যেন স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার; ইহার জন্য দাম লইতে হীরার গরজ নাই, ইচ্ছাও নাই।

পিটার শেষ কথাটা শুনিতে পায় না। মন তখন তাহার অন্যচিন্তায় মগ্ন। দাম না লওয়ার কথায় পিটার রীতিমত বিস্মিত হয়। ভাবে, পানওয়ালী হীরার হঠাৎ এ খেয়াল কেন! তবে কি হীরাবাঈ আজ সদয় হইয়া উঠিল! অল্পক্ষণ পূর্বের ব্যাপারটা নেহাতই একটা ছলনা! পিটার মনে মনে কি যেন ভাবে। খাটিয়া হইতে নামিয়া আগাইয়া যায়। দড়ির উপর কোটটা ঝোলান রহিয়াছে। কোটের পকেটে পিটারের টাকা আছে।

পিটার কিন্তু ছল করিয়া হীরাকে ধরিতে গিয়াছিল।

দড়ির উপর মেলিয়া দেওয়া জলে-ভেজা কোটটা আনিতে আগাইয়া গিয়া পিটার আচমকা পাশ ফিরিয়া হীরাকে বাহুবদ্ধ করিয়া ফেলে।

হীরা·পিটারের ছল না বুঝিলেও তাহার নিবিড় আলিঙ্গনকে বিফল করিতে বিলম্ব করিল না।

হীরার দাঁতের ছোবল খাইয়া সামান্য একটু পিছু হটিতেই সমস্ত দৃশ্যপটটা একেবারে বদলাইয়া যায়।

কুলঙ্গি হইতে চোখের পলকে সাদা হাড়-বাঁধানো ছোট ভোজালিখানি তুলিয়া লইয়া হীরা তাহার নগ্ন নিটোল বাহু বঙ্কিম রেখায় মেলিয়া ধরে। পিটার বোঝে—তাহার বুকের সমান্তরালে যে ধারালো, বেঁকানো পদার্থটা সাপের ফণার মত হিংস্র ভঙ্গিতে স্থির হইয়া আছে তাহা বিপজ্জনক। হীরার দেহটাও যেন খোলা তলোয়ার।

ভয়ের একটা বিশ্রী তাড়নায় যেন পিটার পা পা করিয়া পিছু হটে। তাহার মুখের ওপর হীরার দরজা বন্ধ হইয়া যায় সশব্দে।

বৃষ্টির জলে পিটারের চমক ভাঙ্গে। শীত করিতেছে। দমকা হাওয়ায় নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। পিটার দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকে : হীরা, হীরাবাঈ।

ডাকিতে ডাকিতে একসময় পিটারের গলা ভাঙ্গে—শার্ট, প্যাণ্ট ভিজিয়া সপ সপ করিতে থাকে।

দরজার উপর করাঘাত থামে। ডাকও বহুক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। রাত বাড়ে। বাহিরে সমান দুর্যোগ।

হীরাবাঈয়ের মনেও জ্বালা ধরিয়াছে। ঝড়ের সহিত এই পুরুষমানুষগুলিব লালসারই বা তফাত কি। হীরা খাটিয়ার উপর শুইয়া শুইয়া ভাবে। একটা সর্বনাশ করিতে পারিলেই তো তাহারা খুশী। নিজের স্বার্থ লইয়াই তাহাদের সব। দিদির কাছে যাহারা প্রতিরাত্রে আসিত হীরা তাহাদের দেখিয়াছে। কুত্তাগুলা লালসায় কাতর হইয়া দিদির দরজায় ধর্না দিত। কয়েকটা টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া—বিনা বাক্যব্যয়ে দিদিকে ছোঁ মারিযা টানিয়া লইয়া যাইত পাশের কুঠরিটায়। তাহার পর সেই উন্মত্ত পশুগুলার পাশবিক পেষণে দিদির মিনতি, মানা, বাধা সব চাপা পড়িয়া যাইত।

দিদি যতদিন রঙ্ মাখিয়া পাশের কুঠরির দরজা খোলা রাখিয়াছিল ততদিন সকলেই আসিয়াছে। অথচ সেই দিদিই যখন দুরারোগ্য কুৎসিত ব্যাধিতে বিকৃত দর্শন, পঙ্গু, যন্ত্রণা-জর্জরিত হইয়া মরিতে বসিল তখন এক-

দিনের জন্যও কাহাকেও দেখা গেল না। মরিবার সময় একজন মাত্র আসিয়াছিল। হীরা তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে। প্রৌঢ় ইব্রাহিম মিয়া। ইব্রাহিম মিয়া ও-অঞ্চলের নামকরা ওস্তাদ। তারসানাই আর তবলায় তাহার জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ইব্রাহিম মিয়া হীরার দিদিকে দেখিয়া পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘক্ষণ বসিয়াছিল মাত্র। একটাও কথা বলে নাই। যাইবার সময় কে জানে কেন—হীরাকে আলাদা ভাবে ডাকিয়া লইয়া বলিয়াছিল —'বেটি, বিল্লি বোলে তো লাঠ্‌ঠা, আউর পিয়ার করো তো খাট্টা, সুরাৎ সমঝো আসলি ঝুট্টা—··· ' অর্থ: বেড়াল ডাকলে তাকে লাঠি দিয়ে মারবে—, আর ভালো যদি কাউকে বাসো তোমায় কঠিন হতে হবে। রূপ হচ্ছে পৃথিবীতে সবার বড় মিথ্যে· ·

ইব্রাহিম মিয়া ঠিকই বলিয়াছিল। হীরা আরও কঠিন হইবে। পুরুষমানুষদের সে যেটুকু বিশ্বাস করিত আজ হইতে তাহাও আর করিবে না। ঝড়জলের রাত্রে যাহাকে আশ্রয় দিয়া, নিজের অন্ন দিয়া হীরা অভুক্ত রহিল সেই মানুষটাই শয়তানি করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল ? বেইমান—!

রাগে ক্ষোভে দুঃখে হীরাবাঈয়ের চোখে জল আসে।

কালবৈশাখীর দুর্ধর্ষ ঝড়ও থামে।

আকস্মিক ভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসিয়া হানা দিয়াছিল, যতদূর পারিয়াছে নিজের ক্ষমতাটা জাহির করিয়া বিদায় লইয়াছে। ক্ষতি কিছু কম করে নাই। লাইন ভাঙ্গিয়া, তার ছিঁড়িয়া, টেলিগ্রাফ পোস্ট উল্টাইয়া একাকার করিয়াছে। শাল, দেবদারু, অশ্বত্থের গর্বহানি ঘটাইতেও তাহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু যাহা করিবার এক নিশ্বাসে সারিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে। নবতর ক্ষতিসাধনের হুমকি দিতে আসর জাঁকিয়া বসিয়া থাকে নাই।

ভোরের আলোয় একটি নূতন দিনের সূচনা হয়।

একটু বেশি বেলায় অমরের ঘুম ভাঙিল। পদ্ম ডাকাডাকি না করিলে আরও বেলা হইত। জানালা বন্ধ, দরজাও; অন্ধকারে বুঝিবার উপায় ছিল না, বাহিরে ঝড়ের তাণ্ডবটা কখন থামিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, সকাল হইয়া সূর্য উঠিয়াছে।

বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জানালাটা খুলিয়া দিতেই অমর অবাক। সামনে আলের মত উঁচু জমিটার পাশে মিটার গেজ লাইনের পাথর, স্লিপার, লাইন, মাঠ—দূরের জঙ্গলা গাছগাছালি উজ্জ্বল রোদে ভাসিয়া যাইতেছে। মনেই হয় না, দুর্যোগের একটা ঝাপ্‌টার পর এই নম্র, শান্ত, মধুর পরিবেশটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অমর উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরের একফালি বারান্দায় কল্যাণী খেলনা সাজাইয়া খেলিতে বসিয়াছে। ডালিম গাছের শাখা ক'টি ছোট পাঁচিলটার ঘাড় ডিঙাইয়া সকালের রোদ গায়ে মাখিতেছে। আকাশটা পরিষ্কার। কোথাও কালিমা নাই।

পদ্ম কাছেই ছিল। সামনে আসিয়া দাঁড়াইল না; কিন্তু তাহার গলা শোনা গেল, 'কলঘরটা ডান দিকে। মুখ হাত ধুয়ে নিন।'

অমর এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া পদ্মর অস্তিত্বটা প্রথমে ঠাওর করিয়া লইল। রান্নাঘরেব সামনে একটা শাড়ি তারের উপর মেলা। পদ্ম তাহার আড়ালে পড়িয়াছে।

মুখে চোখে কোনো রকমে একটু জল দিয়া অমর ফিরিয়া আসিল। রাত্রের সেই ঘর, সেই শয্যা। শার্টটা গায়ে চাপাইয়া, ক্যামেরাটা হাতে তুলিয়া লইল। এবার বিদায় লওয়ার পালা। মাস্টার মশাইয়ের তো কোনো সাড়াশব্দ নাই। খুব সম্ভব তিনি স্টেশনে। বেলা তো আর কম হয় নাই।

কপালে পদ্মর বাঁধা ব্যাণ্ডেজটায় আর একবার হাত বুলাইয়া অমর আবার আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যথাটা এখনও বেশ আছে। টনটন করিতেছে। পায়ের ক্ষতটাও টাটাইয়াছে। অনেকটা পথ এখন এই খোঁড়া পায়ে যাইতে হইবে। তা প্রায় মাইল দেড়েক তো বটেই। রাস্তাটাও বিশ্রী ; পায়ে চলা পাহাড়ী পথ ; উঁচু নীচু খানাখন্দ ভর্তি। আর দেরি করা যায় না। কিন্তু বিদায় না চাহিয়া যাওয়াও তো যায় না। কল্যাণী সামনেটায় খেলিতেছিল একটু আগেই, এখন আর দেখা যাইতেছে না। পদ্মই বা কই ?

বারান্দা দিয়া দু-এক পা আগাইয়া অমর হেমন্তবাবুর ঘরের দিকে আসিল।

পদ্ম কি কাজে বুঝি বাহিরে গিয়াছিল, খোলা সদর দিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় ঘোমটা নাই। হাসি মুখ।

—একি চললেন নাকি, একেবারে তৈরি ?

অমর পদ্মর সুশ্রী সুন্দর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকাইয়া চোখ ফেরায়। সলজ্জ, সসঙ্কোচ হাসি হাসিয়া বলে, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। রাস্তাও কম নয়।' একটু থামে অমর, ওদিকে বনোদিকে একা ফেলে এসেছি বাড়িতে। দুশ্চিন্তা—'

অমরের কথাটা পদ্ম শেষ করিতে দেয় না ; বলে, 'যে-রকম ঘুমটা দিলেন তাতে তো মনে হয় না দুশ্চিন্তা-টুশ্চিন্তা কিছু আছে। ও-ঘরে গিয়ে বসুন একটু। চা তৈরি। সেটা খেয়ে যেতে এমন কিছু আর দেরি হবে না।'

চায়ের তৃষ্ণাটা যে না-ছিল, বা একেবারেই কথাটা মনে আসে নাই তা নয়। তবু, রহস্যচ্ছলেও ফরমায়েশ করিবার লজ্জা ছিল। তেমনই আবার বনোদির জন্য ছিল দুশ্চিন্তা।

অমর হেমন্তবাবুর ঘরে গিয়া চেয়ারটিতে বসিল। এ-ঘরে কাল রাত্রেও অমর বসিয়াছিল। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় রেলকুঠরীর এই সংকীর্ণ পরিসরটুকু চোখ চাহিয়া দেখা হয় নাই। সেটা সম্ভব ছিল না ; আকর্ষণও না। সকালের আলোয় এখন কিন্তু ঘরটা অন্য রকম দেখাইতেছে। একটা সেগুন কাঠের এ-দেশী মিস্ত্রীর হাতে তৈরী পালঙ্ক, ফিটফাট বিছানা। ছোট একটি টেবিল

ও চেয়ার। এক কোণে ভারি ট্রাংক, স্যুটকেস। শাড়ির পাড় সমেত ঢাকনা। দেওয়ালে একটি কালীয়দমন মার্কা ক্যালেণ্ডার। মাছের আঁশের তৈরি সাজির কাজ ফ্রেমে বাঁধানো। একটি পিক্টোগ্রাফ। বাঁধানো একটি ফটো। পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না।

এই ঘরটার আবহাওয়াই যেন অন্য এক ধরনের। অমরের মনে কেমন এক নিবিড়তা জমিয়া উঠিতেছিল।

পদ্ম আসিল। হাতে চায়ের পেয়ালা। অন্য একটি প্লেটে সুজি।

অমর হাত বাড়াইয়া চায়ের পেয়ালাটা নেয়। বলে, 'এখন আর ওটা নয়। চা-ই যথেষ্ট।'

—কোনোটাই যথেষ্ট নয়, খেয়ে নিন। হাত পুড়িয়ে তৈরী করে আনছি। পদ্ম সুজির প্লেটটা নামাইয়া দিয়া সত্যসত্যই ডান হাতটা বাড়াইয়া দিল। 'ছেঁকা খেলাম—দেখছেন না—' হাতের পিঠটা দেখাইয়া পদ্ম শব্দ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

পদ্মর হাতের গড়নটি সত্যই সুন্দর। রঙ শুধু নয়, হাতটি নরম এবং নিটোল। ক'গাছা ফিনফিনে চুড়ির তলায় হাতটা দেখার মতন।

সুজিটা চামচ দিয়া মুখে তুলিতে তুলিতে অমর হাসিয়া বলে, 'আমাকে মনে মনে গাল দিন ; তাতে যদি জ্বালাটা কমে।' সামান্য ছেদ। 'সত্যিই আপনাদের খুব জ্বালিয়ে গেলাম। বিশেষ করে তো আপনাকে।' অমর ইঙ্গিতে কপালের আর পায়ের ক্ষতটা দেখায়।

পদ্ম চট করিয়া কোনো জবাব দেয় না। মনে মনে জুতসই একটা জবাব যেন ঠিক করিয়া লইতেছিল।

অমর শুধায়, 'মাস্টারমশাই দপ্তরে নিশ্চয়ই!'

পদ্ম মাথা নাড়ে। আগের কথার জবাবটা এবার মনে আসিয়াছে, কিন্তু অমর যে এখন অন্য কথায় চলিয়া গিয়াছে। জবাব আর দেওয়া গেল না।

'আপনার মেয়ে?' অমর আবার প্রশ্ন করে।

পদ্ম কেমন একটু অবাক এবং অন্যমনস্ক চোখে তাকায়। চোখ দুটি একটুক্ষণ অমরের দিকে, তারপর দরজার দিকে সরিয়া স্থির হইয়া থাকে। 'মেয়ে নয়, ভাগ্নি।'

পদ্মর বলার ধরনে কী একটা যেন ছিল। স্পষ্ট, সরল কিছু নয় কিন্তু তবু কানে লাগে। অমর পদ্মর দিকে কয়েক পলক তাকাইয়া থাকে।

চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া অমর বলে—'এবার যাই। অনেকটা রাস্তা।'

পদ্ম উঠিয়া দাঁড়ায়। 'আসবেন আবার।'

—আসবো, নিশ্চয় আসব।

—ওঁকেও একদিন নিয়ে আসবেন।

—কাকে ?

—আপনার বনোদিকে।

অমর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পা বাড়াইয়াছিল। হঠাৎ বলে, 'বনোদিকে আপনিও দেখেছেন নাকি ?'

পদ্ম ঘাড় নাড়ে। ঠোঁটের গোড়ায় সামান্য হাসি। জবাব দেয়, 'এখানে বসে বসেই সব আমি দেখতে পাই।'

—তা ঠিক্। এমন জায়গায় বাড়ি আপনাদের যেতে-আসতে নজর এড়ানো মুশকিল। অমর সরলভাবে কথাটা শেষ করে।

পদ্ম অমরের জবাবটা যেন কান পাতিয়া শোনে ; সেই রকম মনঃসংযোগের ভঙ্গি। বলে, 'বাড়িটাকে গাল দিচ্ছেন, না আমাকে ?

—আরে ছি ছি, গাল দেব কেন। আমাকে অতোটা অকৃতজ্ঞ মনে করবেন না! এ-বাড়ি না থাকলে কাল তো মাঠেঘাটে অপঘাতে মরতে হত।

অমরের দিকে এক পলক হাসির দৃষ্টি মেলিয়া পদ্ম শুধায়, 'আপনার কপাল ও পায়ের ব্যথাটা কেমন আছে ?'

—মন্দ নয়। জবাবটা খুব সংক্ষিপ্তভাবে সকৌতুকে সারিয়া অমর হাসে। পদ্মও।

অমর চলিয়া যায়। পদ্ম বারান্দার ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকে।

স্টেশনে হেমন্তবাবুর দেখা পাওয়া যায় না। ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে কোথায় একটা মালগাড়ি লাইন হইতে নামিয়া গিয়াছে, হেমন্তবাবু তাহাই দেখিতে গিয়াছেন।

অমর আর বিলম্ব না করিয়া তাহার বাড়ির পথ ধরে।

স্টেশনের দক্ষিণ দিকে একটা ঢালু পায়ে চলা পথ অনেকটা নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরই চড়াই। পার্বত্য বন্ধুর ভূমি। কণ্টকাকীর্ণ, পাথর আর আগাছায় ভরা। তাড়াতাড়ি চলা যায় না। সাপখোপের ভয়ও যে না আছে তাহা নয়।

অন্যদিন হইলে পথটা অমর দ্রুতই অতিক্রম করিতে পারিত। সে-অভ্যাস তাহার আছে। আজ কিন্তু পায়ের ব্যথা লইয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিবার উপায় ছিল না। তাহার উপর জলে ঝড়ে পথটা আরও বিশ্রী হইয়া গিয়াছে।

অনেকটা বেলা হইয়াছে। মাথার উপরকার তাতটা একটু যেন লাগে।

পথ হাঁটিতে হাঁটিতে বনলতার কথাই সে ভাবিতেছিল। কাল বহুরাত্রি পর্যন্ত বনলতার কথা ভাবিয়া তাহার বড় অস্বস্তি এবং দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে। অমন দুর্যোগের রাত্রিতে জঙ্গল ঘেরা তেপান্তরের জন-মানবহীন বাড়িটায় বনোদি একা। অবশ্য সূর্যশংকরের বিশ্বাসী এবং বলবান নেপালী চাকর বাহাদুর ছিল। তাহার উপর আস্থা রাখা যায়। অমর সেই আশ্বাসে রাতটা কাটাইয়াছে। নয়ত যেমন করিয়াই হউক ওই দুর্যোগেই তাহাকে ফিরিতে হইত। ফেরার অবস্থা অবশ্য কাল আর ছিল না।

বনলতার কথা ভাবিতে ভাবিতে বহু রাত্রি পর্যন্ত অমর ঘুমাইতে পারে নাই। ঘুমটা বোধ হয় মাঝরাতের পর আসিয়াছিল। নয়ত আরও সকালে সে উঠিতে পারিত।

পথ হাঁটিতে হাঁটিতে অন্যমনস্কভাবেই অমর পকেটে হাত দেয়। না, সিগারেট নাই। কাল রাত্রেই ফুরাইয়াছে। সিগারেটের অভাবটা চা-খাওয়ার পর হইতে যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন জায়গা, একটা পানবিড়ির দোকান পর্যন্ত আশেপাশে নাই। স্টেশনে অবশ্য সেই পানওয়ালীটার দোকান আছে। অমরের তখন একবার মনেও হইয়াছিল। যেমন তেমন কয়েকটা সিগারেট পাইলেও চলিত। কিন্তু কী কারণে যেন, অমর সে-ইচ্ছা দমন করিয়াছে।

ঢালু পথটা শেষ করিয়া অমর এবার চড়াইয়ের পথ ধরিয়াছে।

পদ্মর মুখখানা মনের মধ্যে প্রায়ই আসা-যাওয়া করিতেছে। হেমন্তবাবুর কপাল ভাল। প্রৌঢ় বয়সে এমন সুশ্রী একটি স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। শুধু সুশ্রী নয়, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারেও চমৎকার। হেমন্তবাবুর এটি নিশ্চয় দ্বিতীয় পক্ষ। বয়সের ব্যবধানটা এত বেশি যে অনুমানটা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু পদ্মর মুখে কিসের যেন একটা চাপা বিরক্তি আছে। অমরের অন্তত তাই মনে হয়। বিরক্তি না বেদনা? অমর ভাবিবার চেষ্টা করে।

এক সময় পথ ফুরায়। সূর্যশংকরের বাংলোটার গেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেই বনলতাকে দেখা গেল। লম্বা টানা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া আছে। বে-খেয়ালে। দৃষ্টিটা বোধ হয় নিমগাছের দিকে। বসিবার ভঙ্গিতে একটা অবসাদ আর বিষণ্ণতা।

অমরের মনে যে-দুশ্চিন্তাটা ছটফট করিতেছিল, এতোক্ষণে সেটা যেন কোথায় মিলাইয়া যায়। অনুভূতিটা প্রায় ভার লাঘবের মতন।

বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া অমর ডাকে, 'বনোদি—'

বনলতা মুখ ফেরায়। ডাকটা কানে গেলেও অন্যমনস্ক অবস্থায় মানুষটাকে ঠাওর করিতে যেন তাহার একটু সময় লাগে।—'অমর! ওকি, মাথা ফাটালে কি করে?'

—তুমি তাহলে বেঁচে আছ! আমার তো রীতিমত ভয় ছিল, ফিরে এসে তোমায় দেখতে পাব কি না। অমর হাসে। একটা ডেক্-চেয়ার টানিয়া বনলতার পাশে বসিতে বসিতে আবার বলে, 'কি রকম ঝড়টা দেখলে? একেবারে খাঁটি সি-পি-র কালবৈশাখী। কলকাতায় দেখা যায় না।

—কোথায় ছিলে এই দুর্যোগে? মাথাটাই বা ফাটালে কি করে?

—বলছি। আগে বাহাদুরকে কয়েক পেয়ালা চা তৈরি করে আনতে বল তো। আর তার সাহেবের স্টক্ থেকে গোটা কয়েক সিগারেট।

বনলতা উঠিয়া যায়। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসে।

—কাল খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না? অমর শুধায়।

—ভয় না হোক, তোমার জন্যে ভাবনায় পড়েছিলাম।

—আমার জন্যে আবার ভাবনা। হাত-পা-ওয়ালা পুরুষমানুষ, আশ্রয় যে একটা জুটিয়ে নেব, এ তো জানতেই। এখানের স্টেশন মাস্টার, সেই যে বুড়ো মতন ভদ্রলোক—ট্রেন থেকে নামতেই যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর কোয়ার্টারে রাতটা দিব্যি কাটিয়ে দিলুম। অমর একটু থামে, আবার বলে, 'ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য ভাল। ওঁর সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল আমার, এবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। চমৎকার মহিলা।'

বনলতা পরিহাস করে, 'তা হঠাৎ ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য সম্পর্কে তোমার হিংসেটা কেন?'

—হিংসে! আরে না, হিংসে হবে কেন! অবশ্য বুঝলে বনোদি, হিংসে হওয়াও আশ্চর্য নয়। ভদ্রলোক বোধ হয় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছেন—কিন্তু স্ত্রী

তার অর্ধেকও এখন পৌঁছুতে পারেন নি। নির্ঘাত দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পক্ষ।

কথার মধ্যে বাহাদুর চায়ের পাত্র আনে। সিগারেটের টিনও। বনলতা চা ঢালে। অমর রহস্য করিয়া বাহাদুরকে শুধায়, 'কিয়া বাহাদুর, তোমারা সাহাবকো পাত্‌তা মিলা?'

বাহাদুর জবাব দেয় না। ঈষৎ মাথা নাড়িয়া প্রস্থান করে।

বনলতা চায়ের পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া বলে, 'সাহেব তো কাল ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে ফিরেছেন।'

সংবাদটায় অমর একটু যেন বিস্মিত হয়। বনলতার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকে। অর্থ-উদ্ধারের একটা চেষ্টাও যেন সে-দৃষ্টিতে ছিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া খানিক পরে অমর শুধায়, 'সাহেব খুব অবাক নিশ্চয়?'

—বিরক্তই বেশি।

—কার ওপর, তোমার না আমার?

—আমার।

সামান্য নীরবতা। অমর সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়িয়া বলে, 'কি বললে?'

বনলতা জবাব দেয় না।

অমরও তাগাদা দেয় না। এক পেয়ালা চা আস্তে আস্তে শেষ করে। সিগারেটটাও। নতুন আর এক পেয়ালা চায়ে মুখ দিয়া দ্বিতীয়বার সিগারেট ধরায়। সামনের জঙ্গলা বাগানটার দিকে চুপচাপ তাকাইয়া তাকাইয়া কি যেন ভাবে।

বনলতাই শেষে কথা বলে। মৃদু, বিষণ্ণ স্বরে। সূর্যশংকরের মনোভাবটা অমরকে বুঝাইয়া দেয়।

মনোযোগ দিয়াই অমর সব শোনে। কোনো কথা বলে না।

আবার চুপচাপ। বনলতা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। ধূসর মেঘগুলির পানে চাহিয়া নিজের কথাই বুঝি ভাবে।

চেয়ারটায় গা এলাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া অমরও চুপচাপ শুইয়া থাকে।

এক সময় কি ভাবিয়া আপন মনেই অমর হাসিয়া ওঠে।

অমরের হাসির শব্দে বনলতার তন্ময়তা ভাঙে। '—কি হলো?'

—কিছু না, হাসি পেলো।

—হঠাৎ!

—হঠাতই। আমাদের সবই তো হঠাৎ। ঠিকঠাক করা, আঁকজোঁক কষা কটা জিনিসই বা জীবনে ঘটে। অমর নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসে। বলে, 'একটা কথা কি জানো বনোদি, আমরা মনের মতন ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করি, কিন্তু শতকরা একটা ঘটনাও ঘটাতে পারি না। যদি পারতাম পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু থাকতো না।'

অমরের দার্শনিকতায় বনলতা বিস্মিত হয় না। ছেলেটা ওই ধরনের। কাব্য-কাব্য কথা বলিয়া, ফটো তুলিয়া, গান গাহিয়া দিন কাটায়। এর তার ফাইফরমাশ খাটে। সাধ্যমত পরোপকার করে। প্রয়োজন হইলে হাত পাতিয়া টাকা ধার করে। আবার পকেটে টাকা থাকিলে অক্লেশে দান করিয়া বসে। অমরের জীবনটা নোঙরবিহীন নৌকার মত হাওয়ায় ভাসিয়া চলিয়াছে, নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নাই। অমর বলে, জীবনে যাহারা উদ্দেশ্যের পিছুপিছু ধাওয়া করে তাহারা আর যাহাই হউক, ভদ্র-মানুষ নহে। অবশ্য এখানে ভদ্র-মানুষ বলিতে অমর বোঝে নির্ঝঞ্ঝাট ভালো মানুষ। অমরের কথাবার্তায় বনলতা কৌতুক বোধ করে, অযথা তর্ক করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া দেয়।

অমরের কথায় আজ কিন্তু বনলতা কৌতুক বোধ করিতে পারে না। বরং তাহার কথায় কোথায় যেন একটা সত্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

—হঠাৎ এ-সব বড় বড় কথা কেন? বনলতা মৃদু হাসিয়া কথাটা যেন অন্য খাতে বহাইবার চেষ্টা করে।

—দেখছি কি না তাই।

—আমায় দেখছো! আমি আবার কি ঘটাবার চেষ্টা করলাম?

—করলে না! কতোই তো করলে! আজীবন সে চেষ্টাই করছো। সূর্যদা'কে নিয়ে সুখের ঘর গড়তে চেয়েছিলে, কিন্তু যেদিন সন্দেহ হলো সূর্যদা চোরাবালি, তাকে বাতিল করলে। তাঁর সংসারে প্রবেশ করলেও প্রতিষ্ঠা পেলে না। উদ্দেশ্যটাই তোমার বিফলে গেলো। কতকগুলো নীতির নাগাল আঁকড়ে ধরে তুমি স্বর্গলাভ করতে চাও। অথচ মজা এই, তোমায় আবার এখানেই ফিরে আসতে হয়। এখানে এসে কি দেখলে, কি পেলে, বনোদি—? অমর প্রশ্নসূচক টান দিয়া কথার মাঝখানেই থামিয়া যায়। একটু পরে

দেহটাকে পিছন দিকে এলাইয়া দিয়া আপন মনেই বলে, 'সুখের আশায় কতো কি তো ঘটাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে কই!' অমরের গলার স্বরে সহানুভূতির বেদনা।

বনলতা সহজে অমরের কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না। কি উত্তরই বা দিবে। তাহার জীবনের চরম কথাটা অমর যতোটা বুঝিয়াছে এতোটা আর কেহ বোঝে নাই, বুঝিতে পারে নাই। অমর ঠিকই বলিয়াছে। নিজের জীবন লইয়া বনলতা জুয়া খেলিতে বসে নাই। আঁকজোক করিয়া মনোমত ইমারত গড়িতে গিয়াছে; পারে নাই। ব্যর্থতায় তাহার দুঃখের বোঝাটাই কেবল দিন দিন ভারি হইয়া উঠিতেছে।

—এখন কি করবে? অমর আচমকা প্রশ্ন করে।

—কিছু বললে আমায়? আত্মস্থ বনলতা অমরের কথা শুনিতে পায় নাই।

—বলছিলাম, এবার কি করবে?

—তাই ভাবছি, কি করবো বলতে পারো—?

—ইচ্ছে করলে অবশ্য তুমি এখানে আরো কিছুদিন থেকে আকাশ পাতাল ভাবতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। সূর্যদা তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু এভাবে থাকা কি ভালো, বনোদি? অহোরাত্র নিজেকে পীড়ন করে লাভ নেই। বরং চলো, আমরা ফিরে যাই—

—ফিরে যাবার কথা আমি ভাবতে পারি না।

—কেন?

—কোথায় ফিরে যাবো? সেই ভাইয়ের বাড়িতে ফিরে যেতে বলো?

—গেলেই বা। ভাই তোমায় তাড়িয়ে দেবে না নিশ্চয়।

—আদর করে ঘরে তুলেও নেবে না।

—ও সব কথা আমি জানি, বনোদি। নতুন করে শোনার কিছু নেই। তুমি যদি ফিরে যাও কমল তোমায় কখনোই বিমুখ করবে না।

—হয়তো বিমুখ করবে না, কিন্তু সকলেই তো কমল নয়, অমর। আমাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আছে। তারা আগেও টিটকিরি দিয়েছে, এবার নতুন করে দেবে।

—আত্মীয়স্বজন বলতে তো তোমার সেই স্তাবকটি।

—আর কেউ নেই বুঝি?

—আবার কে—?

—সম্পর্কীয় আত্মীয়রা।

—তাদের কথা ভেবো না।

—তাদের কথারই ধার বেশি কি না, তাই ভাবনাও বেশি।

বনলতার কথায় অমরের আবার আগের মতই হঠাৎ হাসি পায়। সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া অমর বলে, 'আশ্চর্য, বনোদি! সমাজ বোঝো, মান-অপমানের জ্ঞানও তোমার টনটনে দেখছি; তবু নীতি আর রুচির তাগিদে মূর্খের মতন কেন যে স্বামী ত্যাগ করেছিলে? কেনই বা আবার তার কাছে ছুটে এলে?'

—তাই তো ভাবছি কেন এসেছিলাম। বনলতার দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। 'মনে মনে বিশ্বাস ছিল হয়তো আমার কিছু সম্বল এখনও আছে, তাই এসেছিলাম।'

একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া অমর বলে, এবার তো বুঝলে তুমি নিঃসম্বল। এখন অন্তত ফিরে চলো।

—না।

—না?—অমর বনলতারই কথার প্রতিধ্বনি করে।

—না, যেখান থেকে চলে এসেছি সেখানে আবার ফিরে যেতে পারবো না। বনলতার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ফিরে যাবে না, করবে কি? থাকবে কোথায়?

—এখানে নয়। অন্য কোথাও। ব্যবস্থা একটা করতে হবে।

—আমি কিন্তু বেশিদিন এখানে এবার থাকতে পারবো না।

—কেন?

—ইচ্ছে নেই।

—ইচ্ছে নেই? বনলতা অতো দুঃখেও হাসিয়া ফেলে। সূর্যশংকরের সহিত অমরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটা তার ভালো করিয়াই জানা আছে। সূর্যশংকর এই জায়গাটায় আসিবার পর হইতে বছরের মধ্যে কমপক্ষে বার দুই অমর এখানে আসিয়াছে। এখানে একবার আসিলে আর ফিরিবার নাম করে না। তাই হঠাৎ অমরের মুখে বিপরীত সংকল্প শুনিয়া বনলতা না হাসিয়া পারে না। বলে, 'ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি—!'

—তা ঠিক। আমার কিন্তু সত্যি সত্যি এবার বেশিদিন থাকার ইচ্ছে নেই।

বনলতার মুখের হাসি মিলাইয়াও মিলায় না। গোধূলির শেষ আলো-টুকুর মতই তাহা ম্লান একটা মাধুর্য লইয়া ফুটিয়া থাকে।

অমর ভাবপ্রবণ, স্নেহধন্য। বনলতাকে সে যতোটা ভালবাসে সূর্যশংকরকে তাহা অপেক্ষা কম নয়। বরং, আরো বেশি। সূর্যশংকর ও বনলতাকে কেন্দ্র করিয়া অমর একসময়ে মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকিয়াছিল। সে-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন বনলতার সর্বস্বান্ত রূপটা অমরকে অহোরাত্র পীড়া দিবে তাহা আর বেশি কি! বনলতা সবই বোঝে।

নিজের দুঃখ অপরের মনে সংক্রামিত করার দুর্বলতা সব মানুষেরই আছে। বনলতারও যে ছিল না, এমন নয়। তথাপি অমরকে একটু সান্ত্বনা দিবারও প্রয়োজন রহিয়াছে। সোজাসুজি সান্ত্বনার কথা বনলতার মুখে যোগায় না। অমরের মুখের কথায় জোড়া দিয়া রহস্য করিয়া বনলতা বলে, 'আমার জন্যে থাকার ইচ্ছে নেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সবটাই তো আর আমার জন্যে নয়, খানিকটা। বাকিটা কার জন্যে?'

বনলতার প্রশ্ন প্রশ্নই। তাহার কোনো অর্থ হয় না। অথচ ইহাই অমরের মনোকক্ষের ভেজানো দরজাটা হঠাৎ যেন একটা ধাক্কায় খানিকটা খুলিয়া ধরে। অনুজ্জ্বল, কিন্তু যাহার রেখাচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—সে পদ্ম।

মনে মনে অমর কম বিস্মিত হয় না। তাহার পর এই অর্থহীন অকারণ রেখাচিত্রটা হাসির দমকে উড়াইয়া দেয়।

*

হীরা নিশাচরী হইয়াছে।

কয়লার গুঁড়াভর্তি আঁকাবাঁকা পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কালা পুদিনার গাছ খুঁজিয়া পাওয়া যে এত কঠিন হইবে কে জানিত। মিশিরজী বলিয়াছেন, কালা-পুদিনা বাটিয়া গাওয়া ঘি আর মধুর সহিত গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে বুকের সর্দি নামিয়া যাইবে।

শিবলালের নিকট হইতে তাহার লাল-নীল রেললণ্ঠনটা হীরা চাহিয়া লইয়াছে। লছমীকে সঙ্গী করিয়া বাহির হইয়াছে কালা-পুদিনার খোঁজে।

লছমী ছেলেমানুষ। রাতের গোড়াতেই তাহার ঘুম পায়। সে আর পারে না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমের ঘোরে টলিতে থাকে।

বন-তুলসীর ঝোপের কাছে বসিয়া হীরা অনেকক্ষণ কালা-পুদিনার গাছ খোঁজে। কোথায় কালা-পুদিনা? আগাছার জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। মানিকরাম কিন্তু এই জায়গাটার কথাই আজ বিকালে

বলিয়াছিল। হীরা শেষবারের মত আলো ফেলিয়া সারা জায়গাটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখিয়া লয়।

—লছমি, এ লছমি—। হীরা ডাকে।

কোনো সাড়াশব্দ নাই। পিছন ফিরিয়া হীরা দেখে মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া লছমী ঘুমাইতেছে। ঠেলা দিয়া হীরা তাহাকে জাগায়।

—হুঁশ রাখ ছোঁড়ি। সাপ কাটেগি তো ব্যাস্—নিদ টুট্ যায়গি তুমারী।

—মিলি পোদিনা? চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে লছমী প্রশ্ন করে।

—না—! হীরা মাথা নাড়ে।

—দেখি হ্যায় কভি তু?

—কিয়া?

—কালা-পোদিনা?

—নেহি। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে হীরার। বলে,—'চল্—লৌট্ যায়।'

হাতের বাতিটা নীচু করিয়া হীরা আগাইয়া যায়। লছমী তাহার অনুসরণ করে।

ফিরিবার পথে হীরা কি ভাবে কে জানে। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় দাঁড়াইয়া পড়ে। নাম-না-জানা একটা বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। বুক ভরিয়া নিশ্বাস লয় হীরা। চোখের পাতা আপনা হইতেই বুজিয়া আসে।

চোখের পাতায় নিঃশব্দে-পা ফেলিয়া যে আগাইয়া আসে হীরা তাহারই জন্য কালা-পুদিনার খোঁজে গিয়াছিল। লোকটা আর কেহ নয়—পিটার। হীরার খাটিয়ায় শুইয়া এখনো বুঝি সে জ্বরের ঘোরে ছট্ফট্ করিতেছে। বুকের বেদনায় অমন জোয়ান পুরুষটাও মাঝে মাঝে ছোট ছেলের মত কাঁদে। কে জানে বুকের ব্যথায় কাতর হইয়া পিটার এতক্ষণে চিৎকার করিতেছে কি না!

হীরার গতি হঠাৎ দ্রুত হইয়া ওঠে।

শিবলালের সহিত স্টেশনেই দেখা হইয়া যায়। হীরা কিছু প্রশ্ন করিবার আগেই শিবলাল বলে, পিটার সাহেবকে কালই শহরের রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। লাইন ঠিক হইয়া গিয়াছে। গাড়ি যাতায়াতের

আর যখন কোনো অসুবিধা নাই তখন গার্ড সাহেবকে হাসপাতালে রাখিয়া আসার জন্য মাস্টারবাবু আদেশ দিয়াছেন।

শিবলালকে তাহার রেলকোম্পানীর বাতি ফেরত দিয়া হীরা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরটিতে ফিরিয়া আসে।

পিটার ঘুমায় নাই। চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়াছিল।

হীরার পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়া তাকায়।

—হীরা?

হীরা পিটারের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘোলাটে দৃষ্টিতে পিটার তাকাইয়া থাকে।

—কাল আপ্ শহর যাইয়েগা গার্ড সাহাব?

—হাঁ। পিটার মাথা নাড়ে।

—কাহে?

—দাওয়াইখানামে রহেনা পড়েগা। অবসন্ন কণ্ঠে কেমন একটা আবছা ঘোরের মধ্যে পিটার বলে, থোড়া পানি তো পিলা দে, হীরা।

হীরা জল আনিয়া পিটারকে খাওয়ায়। জল খাইতে গিয়া বিষম লাগে পিটারের। কাশির বেগ বাড়িয়া ওঠে। বুকে হাত দিয়া বিশ্রীভাবে পিটার কাশিতে থাকে। গলার শিরাগুলি তাহার নীল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখে জল। কাশিতে কাশিতে পিটারের মুখ বীভৎস—বিকৃত হইয়া ওঠে। হাঁপ ধরিয়া বেচারী বুঝি মারা পড়ে।

হীরা যতটা পারে পিটারের কাশি থামাইবার চেষ্টা করে। কালা-পুদিনার কথাটা তাহার বারবার মনে পড়িতেছে।

অনেক কষ্টে পিটারের কাশি একটু থামে—যন্ত্রণা থামে না। বরং, আরো বাড়িয়া যায়।

সরিষার তেল গরম করিয়া হীরা পিটারের বুকে মালিশ করিতে বসে।

জ্বরের ঘোরে, বুকের যন্ত্রণায় পিটার ছট্‌ফট্ করিতে করিতে একসময় কখন যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

তখন অনেক রাত। হীরা পিটারের পাশ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

দাওয়ায় আসিয়া মাটির উপর চুপচাপ বসিয়া থাকে হীরা। কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি রুগ্ন চাঁদ উঠিয়াছে আকাশে। সেই আলোয় দূরের সিগন্যালটা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় তাহার লাল চোখ।

আগামী কাল ওই সিগন্যালের আলোটা নীল হইবে। পিটার সাহেব চলিয়া যাইবে।

হীরার বুকের মধ্যে আশ্চর্য একটা ব্যথা অনেকক্ষণ হইতেই পাক দিয়া উঠিতেছিল। এ-ধরনের অদ্ভুত বেদনার সহিত জীবনে একবার মাত্র তাহার পরিচয় হইয়াছে—দিদি যখন মারা যায় তখন।

হীরাবাঈ পানওয়ালী। অন্তত সেই নামেই তাহার পরিচয়। চুন খয়েরের রঙে তাহার হাতের আঙুল রাঙা হইয়াছে—হীরা তাহা জানে, দেখে, বোঝে। মাত্র দু'দিনের ব্যতিক্রমে শয়তান পিটারটা তাহার বুকের কঠিন সাদা হাড়গুলাকে যে করুণরঙীন কেমন এক বিচিত্র রঙে রাঙা করিয়া দিবে তাহা হীরা জানিত না। আজো বুঝি জানে না।

পিটার সাহেব শহরের হাসপাতালে চলিয়া যাইবে—এই কথাটাই তখন হইতে হীরা ভাবিতেছে। আর সেই ভাবনায় ভর করিয়া বোবা একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছে; তাহার বুকে পাক খাইতেছে। কেমন যেন ফাঁকা লাগে।

হীরা ভাবিয়া কূল পায় না—মেজাজটা তাহার বিগড়াইয়া গেল কেন! শয়তান পিটার সাহেবই সেদিন তাহাকে ছল করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্যে সেদিন হীরা ধারাল ভোজালিটা তুলিয়া লইয়াছে। পিটার ভয়ে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের উপর হীরা তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

পরের দিন অনেক বেলায় জ্বরের ঘোরে টলিতে টলিতে পিটার আবার হীরার ঘরে আসিয়া ঢোকে। খাটিয়ার উপর কোনোরকমে প্রায়-অচৈতন্য দেহটাকে বিছাইয়া দিয়া পিটার ভুল বকিতে থাকে। হীরা সব কথা বুঝিতে পারে না। যেটুকু বোঝে, তাহা হইতে অনুমান করে—সারা রাত বৃষ্টির জলে ভিজিয়া, ঝোড়ো হাওয়া খাইয়া পিটারের জোর জ্বর আসিয়াছে। পিটারের কোটটা আল্নায় আগের মতই টাঙানো ছিল। হীরা সেদিকে তাকাইয়া বোকার মত বসিয়া থাকে। পিটার বকিয়া যায়—হীরা তাহাকে ঘরের বাহিরে তাড়াইয়া দিবার পর কতক্ষণ সে ডাকাডাকি করিয়াছে, কতবার আবেদন জানাইয়াছে, অন্তত কোটটাও যাহাতে ফেরত পাওয়া যায়। কিন্তু হীরা দরজা খোলে নাই।

অগত্যা পিটারকে সেই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া ফিরিতে হয়। ঝড়ে, জলে সারা রাত পিটার লাইন হইতে গড়াইয়া পড়া ব্রেকের মধ্যে কোমর পর্যন্ত

জলে ডুবিয়া রাত কাটায়। হাওয়ার চাবুক তাহার গায়ের রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে।

পিটারের গায়ে হাত দিয়া হীরা দেখে সত্যই লোকটার গায়ে আগুন ছুটিতেছে।

হীরা এবারও বোকার মত নিজের কাঁথা আর কম্বল দিয়া পিটারের সারা গা ঢাকিয়া দেয়। মনে মনে কি জানি কেন হঠাৎ নিজেকে বড় অপরাধী বলিয়াই তাহার মনে হয়।

পিটারের জ্বর যতোই বাড়ে, যতোই সে যন্ত্রণায় ছটফট করে, সময় যায়—ততোই হীরার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়—পিটারের অসুখের জন্য সে দায়ী। একটা নিরাশ্রয় মানুষকে অমনভাবে বাহির করিয়া দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। হীরা যদি তাড়াইয়া না দিত পিটারের অসুখ করিত না।

এবার আর হীরা পিটারকে তাড়ায় না। যেন অপরাধের বোঝাটা হালকা করিবার জন্যই পিটারকে নিজের খাটিয়াটা ছাড়িয়া দেয়। মিশিরজীর কাছ হইতে ওষুধ চাহিয়া আনিয়া পিটারকে খাওয়ায়। পাশে বসিয়া রাত জাগে; বুকে তেল মালিশ করে।

পিটার কাল চলিয়া যাইবে। শহরের বড় হাসপাতালে তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালো বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখা হইবে। সাদা পোশাক পরা মেমসাহেবরা জুতার মৃদু আওয়াজ তুলিয়া বার বার পিটারের কাছে যাওয়া-আসা করিবে। সেখানে বড় বড় ডাক্তার। প্রশ্ন করা দূরে থাক, তাহাদের গম্ভীর মুখের পানে তাকাইতেই ভয় হয়। পিটার যে কেমন থাকে তাহা জানা মুশকিল।

শহরের বড় হাসপাতাল হীরা দেখিয়াছে। হাসপাতালের ভিতরও ঢুকিয়াছে। বছর চারেক আগের কথা। এখানে আগে যে মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টার ছিল তাহার বউ দেবকীর সঙ্গে হীরার গলায়-গলায় ভাব। দেবকীর একবার খুব অসুখ করে। তাহাকেও শহরের বড় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেনে চাপিয়া কয়েকবারই হীরা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। হাস-পাতালের রকমসকম দেখিয়া কাহাকেও সে একটা প্রশ্ন করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেবকীও বেহুঁশ হইয়াই পড়িয়া থাকিত; তাহার সহিত কথা বলিলে মেমসাহেবরা ধমক দিয়া হীরাকে চুপ করাইয়া দিত।

দেবকী মারা গেল। কাণাঘুষায় হীরা শুনিয়াছে দেবকীর বুকে দিয়া রক্ত উঠিত। রক্ত উঠিয়াই সে মারা গেল।

পিটার যদি মারা যায় ?

ঝোড়ো হাওয়ায় হঠাৎ-উড়িয়া-আসা ধূলার মতই কথাটা হীরার মনে আসে। বুকটা তাহার কাঁপিয়া উঠে, চোখ দু'টাও করকর করিতে থাকে।

কৃষ্ণপক্ষের রুগ্ন চাঁদ ডুবিয়াছে—। সিগন্যালের লাল আলোটা কেমন যেন দুঃসহ। পিটারের চোখের দৃষ্টি ওইরকম রক্তাক্ত ঘোলাটে।

হীরার বুক বহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। একটা কথাই শুধু তাহার মনে পড়ে, অমনভাবে ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে পিটারকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই।

ঝড়-জলের বিশ্রী রাতটা কাটাইয়া অমর সেই যে পরের দিন সকালে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর স্টেশনের দিকে আসে নাই। পদ্ম হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, প্রায় সপ্তাহখানেক হইতে চলিল ভদ্রলোকের আর পাত্তা নাই। কে জানে, পা আর কপালের ক্ষতগুলি কেমন আছে! হয়ত পাকিয়াছে। জ্বর-জ্বালা হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে সম্ভবত।

ছোটকিমাতলার খাদের ম্যানেজারের বাড়িটা বেশ দূর। রাস্তাটাও ভাল নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাওয়া আসা মুশকিল। নয়ত পদ্ম একদিন গিয়া খোঁজ লইয়া আসিতে পারিত। হেমন্তবাবুকে অবশ্য পদ্ম কাল বলিয়াছে, স্টেশনের একটা পোর্টার পাঠাইয়া সংবাদটা যদি আনানো যায়! হেমন্তবাবু মাথা নাড়িয়াছেন। সুবিধা হইলেই পোর্টার পাঠাইবেন আর কি।

সেদিন দুপুরের তেজটুকু তখনও মরে নাই। বেশ গরম। হেমন্তবাবু দুপুরের বিশ্রাম সারিয়া স্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। পদ্ম ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়াছিল। বাহিরের রোদ আর অসহ্য ঝাঁঝটা এড়াইবার জন্য ঘরের জানালাগুলি সব বন্ধ। দরজার কপাট পর্যন্ত ভেজান। ঘরটা ছায়া আর অন্ধকারে ভরা। এই দুঃসহ গরমটা হাত পাখার হাওয়ায় দূর করা যায় না। জামার বোতামগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, পদ্ম আলস্যের ঘোরে হাওয়া খায়। আর মাঝে মাঝে কল্যাণীর কথা শোনে। কল্যাণী ঘরের এক স্বল্পালোক কোণ বাছিয়া তাহার পুতুল লইয়া খেলিতে বসিয়াছে। আপন মনেই বিচিত্র সব কথা বলিয়া চলিয়াছে। তাহার বকবকানির শেষ নাই। কল্যাণী তাহার পুতুল-কন্যাকে বুঝাইতেছিল, কান্নার কি আছে—কি সুন্দর ছেলে যোগাড় করিয়া আনিয়াছে, কন্যার সহিত সেই রাজপুত্রের বিবাহ দিবে। কত শাড়ি আর গহনা। পদ্ম কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। হঠাৎ বাহির হইতে ডাকটা কানে গেল।

পদ্ম ·এ-রকম একটা ডাকের প্রত্যাশা কয়েকদিন হইতেই করিয়া আসিতেছে। ডাকটা থামিয়া গেলেও কয়েক মুহূর্ত যেন মনে মনে স্বরটা শুনিয়া পদ্ম তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। ঘরের মধ্যে বেশ ছায়া। কল্যাণীকেও অস্পষ্ট দেখায়। পদ্ম গায়ের জামা কাপড় ঠিক করিয়া সামনের জানালা দুটি খুলিয়া দেয়। ঘরের ছায়াটা ফিকা হইয়া আসে।

ভেজান দরজা খুলিয়া পদ্ম বারান্দায় আসিতেই অমরের সঙ্গে চোখাচুখি হইয়া যায়। হেমন্তবাবু বাহির হইয়া যাওয়ার পর হইতে সদরটা ভেজানো পড়িয়াছিল। অমর সদরের ফাঁকে মাথা গলাইয়া ডাক দিয়াছে।

—ওমা আপনি! আসুন। পদ্ম আলগোছে পিঠের আঁচলটা মাথায় টানিবার চেষ্টা করে।

উঠান দিয়া অমর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। কপাল গালগলা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। মুখচোখও রোদের ঝাঁঝে লালচে। পদ্মর দিকে তাকাইয়া অমর হাসিমুখে শুধায়, 'মাস্টার মশাই নেই?'

—স্টেশনে। এই তো খানিক আগে গেলেন। পদ্মর মুখেও বেশ সহজ একটা হাসি। 'সেই যে গেলেন তারপর আজ বুঝি আমাদের কথা মনে পড়ল?'

—কি যে বলেন! অমর একটু বুঝি লজ্জিত হয়। 'পরশু থেকেই ভাবছি আসবো, হয়ে উঠছিল না। গোড়ালির ব্যথাটা আবার যদি বেড়ে যায় তাই ওটাকে বিশ্রাম দিচ্ছিলাম।

—এখন কেমন আছে?

—ভাল।

—কপালটা? পদ্ম অমরের কপালের লিউকোপ্লাস্টের দিকে তাকায়।

—সবটা শুকোতে হয়ত আরও দিন কয়েক লাগবে।

সাড়া পাইয়া কল্যাণীও ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন চেনা লোকটাকে আরও একটু ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবার জন্য একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। অমরও কল্যাণীর দিকে হাসিমুখে চাহিয়া একটা সস্নেহ মজাদার মুখভঙ্গি করিল।

পদ্ম মুখের আলগা ইশারা করিয়া বলে, বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন।

—মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আগে একবার দেখা করে আসা উচিত বোধ হয়। অমর কল্যাণীর দিকে হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলে, 'সে-দিনও ওঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে পারিনি। কি ভাবছেন কে জানে!'

—কিছুই ভাবছেন না। অত ভাবাভাবির লোক উনি নন। বরং এই যে ডুব দিয়েছিলেন এতেই আমরা ভাবছিলুম। পদ্ম বেশ সহজ গলায়, হাসিখুশীভাবে কথা বলিতে থাকে।

অমরও বেশ পরিতৃপ্তভাবে কথাগুলি শোনে। পরিহাসের সুরে বলে, 'একেই বলে প্রবাসের আত্মীয়তা। ভাগ্যিস বাঙালী হয়ে জন্মেছিলুম! সঞ্জীব চাটুজ্যে ঠিকই বলেছিলেন।

—বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলেই কি বিদেয় নেবেন না ঘরে গিয়ে বসবেন? পদ্ম আবার তাগাদা দেয়।

জুতাজোড়া খুলিয়া অমর ঘরে ঢুকিবার আগে বলে, 'একগ্লাস জল খাওয়ান, বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

কল্যাণীর হাত ধরিয়া অমর ঘরের মধ্যে যায়।

পদ্ম কলঘরের ছায়ায় রাখা ড্রামের ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ভাল করিয়া ধোয়। পায়ে অনেকটা জল ঢালে। কেমন একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। কপালের একপাশে টিপটিপ ব্যথা। অমরের কয়েকটা কথা মনে পড়ে। প্রবাসের আত্মীয়তা। তা হ্যাঁ, আত্মীয়তা বৈ কি।

বারান্দায় আসিয়া গামছাটা টানিয়া মুখটা মোছে পদ্ম। মনে তখনও ভাবনাটা নানাভাবে পাক খাইতেছে। আচ্ছা, আত্মীয়তা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না—? অন্য কিছু? আত্মীয়তা কথাটা বড় তরল।

রান্নাঘরের কুঁজা হইতে জল গড়াইতে গিয়া, কথাটা আবার মনে পড়ে পদ্মর। অমরের কথা আজ দুপুরেও, খানিক আগেও যে পদ্ম ভাবিতেছিল। কেন? কেন এই মানুষটাকে দেখিলেই তাহার দু-দশটা কথা বলার ইচ্ছা হয়। পদ্ম নিঃসঙ্গ, কথা বলার লোক নাই, অন্তত গল্পগাছা করিতে পারে এমন কোনোও মানুষ নাই বলিয়াই কি! তাহাই বা কেন হইবে? এখানে হেমন্তবাবু আছেন, পানওয়ালী হারাবাঈ-ও মাঝে মাঝে পদ্মর কাছে আসে। পাওয়ার হাউসের কাছে গোঁসাইজী আছেন, কুসুম আছে।

কথা বলার লোক আছে—কিন্তু দিনের পর দিন মাত্র এই ক'টা মানুষের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে পদ্ম ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া এক হেমন্তবাবু ছাড়া আর কেহই পদ্মর নিয়মিত সঙ্গী নয়। তাহাদের সঙ্গে ক'টা কথাই বা বলা চলে। পদ্মর ভাল লাগে এমন কথা কেই বা বলে, কেই বা বলিতে পারে।

জলের গ্লাসটা উপচাইয়া খানিকটা জল পদ্মর হাতে পড়ে। হঠাৎ সে অনুভব করে, তাহারও খুব তৃষ্ণা। আকণ্ঠ শুষ্ক।

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া অমরের জন্য গড়ানো জলের গ্লাসটা পাশে রাখিয়া

পদ্ম আর-এক গ্লাস জল গড়ায়। এক নিশ্বাসে জলটা শেষ করিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

অমর কল্যাণীর সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে। কল্যাণীকে তাহার নাক ভাঙা, পায়ে চোট খাওয়া পুতুল-কন্যাটার রূপ-প্রশস্তি শুনাইতেছে।

—এই দুপুর রোদে যখন বেরুলেন একটা ছাতা নিয়ে বেরুলেই পারতেন। পদ্ম জলের গ্লাসটা আগাইয়া দেয়।

জলটা প্রথমে নিঃশেষে পান করে অমর। গ্লাসটা মাটিতে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে বলে, 'ছত্ররাজ হতে বলছেন ? না, ওটা আমার ধাতে সয় না।'

—একবার লু কিম্বা তাত লেগে সর্দিগর্মি হলেই তখন ধাতে সইবে। পদ্ম সরাসরি অমরের চোখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

অমরও সে-হাসিব পরিহাসটুকু উপভোগ করিয়া হাসে। 'রাস্তাটা কিন্তু ভাল , বেশ ছায়া ছায়া। আপনি বোধ হয় যান নি ওদিকে। চলুন না একদিন। যাবেন —'

পদ্ম বাস্তবিকই ও-পথে কোনোদিন পা দেয় নাই। বড়জোর ঢালুটুকু পর্যন্ত বেড়াইতে গিয়াছে—তাহার বেশি আর নয়। পথের ছবিটা মনে ভাসিয়া আসিতেছিল। 'আপনার বনোদিকে দেখাতে নিয়ে যেতে চাইছেন ?' কেমন যেন হেঁয়ালির মতন বলে পদ্ম।

অমর কথাটা স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। জবাবে বলে, 'আমার বনোদি দেখার মতন কিছু নয়। এমনি আপনি যাবেন।'

—কথাটা আপনি উল্টো বুঝলেন। আমি বলছিলাম, আমাকে হয়তো নিয়ে গিয়ে বনোদিকে দেখাবেন। পদ্ম খাটের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল এতক্ষণ, এবার একটু বাঁকা ভাবে আধ-বসা ভাবে দাঁড়ায়।

—তা আপনাকে অবশ্য নিয়ে গিয়ে দেখান যায়। অমর সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকায়। 'আপনি দেখার মতই।'

—কেমন বুনো আর অসভ্য একটা জন্তু, না কি ?

অমর তাড়াতাড়ি জিভ কাটে, মাথা নাড়ে। 'আরে ছি ছি, কি যে বলছেন যা তা।'

মামি যে নতুন লোকটির সঙ্গে গল্পগুজবে বেশ মগ্ন, কল্যাণী সেটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারে। এবং সেই সুযোগে পা পা করিয়া পিছু হটিতে হটিতে এক সময় অদৃশ্য হইয়া যায়।

ব্যাপারটা অমরের চোখে পড়িয়াছিল। 'আপনার ভাগ্যি যে পালাল।'

—পালাক, অনেকক্ষণ আটকা ছিল তো। ওর দৌড় স্টেশন পর্যন্ত।

স্টেশনটা কোয়ার্টার হইতে ত্রিশ চল্লিশ গজের মধ্যে। মেয়েটা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়া মামার কাছে নতুন লোক আসার কথাটা জানাইতেছে। পদ্ম মানসদৃশ্যে যেন কল্যাণী আর হেমন্তবাবুর বাক্যালাপগুলি শুনিতে শুনিতে, অন্যমনস্ক ভাবে শুধায়, 'বনোদি কি আপনার নিজের বোন ?

—না।

—আত্মীয় ?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে অমর। 'রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই। তবু বনোদি আমার আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।'

অমরের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পদ্মর কষ্ট হয় না। মনে মনে প্রচণ্ড একটা কৌতূহল অনুভব করে। মুখের ভাবে কৌতূহল এবং নানা প্রশ্ন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিলেও পদ্ম চুপ করিয়া থাকে।

অমর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে-অন্যমনস্কতা কাটিল। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া হাসিয়া বলে, 'আমি একটু নেশা করে নি, আপনার অসুবিধে হবে না তো।'

পদ্ম মাথা নাড়ে। না, তাহার আর অসুবিধা কি।

—আপনার বনোদিকে একদিন নিয়ে আসুন না বেড়াতে। সে-দিনও কিন্তু বলেছি। পদ্মর মাথায় বনোদির চিন্তাটা এখনও অ,ট আছে।

—বলবো বনোদিকে। আসতে চাইলেই আনবো।

পদ্মর অসংখ্য প্রশ্ন ছিল ; কিন্তু এখন আর কোনো প্রশ্নই করা চলে না।

—বসুন। বিকেল হয়ে এল ; একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।

—আপনি যাবেন চা করতে আর আমি একা একা বসে থাকব মুখ বুজে। আমি বরং মাস্টারমশাইকে ধরে নিয়ে আসি গে। তিনিও নিশ্চয় চা খাবেন।

—মাস্টরমশাই মাস্টারমশাই করে একেবারে হন্যে হয়ে গেলেন যে আপনি। যান আপনার মাস্টারমশাইয়ের আড়তে গিয়ে বসুন গে যান তবে।

পদ্মর বলার ভঙ্গিতে অমর শব্দ করিয়া হাসিয়া ওঠে। 'আড়ত কি, ওটা যে অফিস। শুনলে মাস্টারমশাই মানহানির অভিযোগ করবেন। তা ছাড়া এ যে একরকম পতিনিন্দা।' একটা হাসির ঢেউ এই ছোট রেলের কুঠরিটার বাতাসে ভাঙিয়া পড়ে।

পদ্ম কিন্তু হাসে না। কোন্ কথায়, কেন যে তাহার মুখটা গম্ভীর, একটু কঠিন হইয়া গিয়াছে বোঝা যায় না। পদ্ম একদৃষ্টে, কেমন যেন বিরক্ত মুখে অমরের হাসিটা দেখিতেছিল। হাসি থামিলে ঘরটা অল্পক্ষণ নিঃশব্দ থাকে।

অমরের যেন খেয়াল হয়, পরিহাসটা পদ্মর পছন্দ হয় নাই। 'বেফাঁস কিছু বলে ফেললুম নাকি? রাগ করলেন?'

—না। পদ্ম আস্তে গলায় জবাব দেয়, 'আপনার মাস্টারমশাইয়ের অভিযোগটা মান নিয়ে; অন্য কেউ যদি—' কথাটা পদ্মর ঠোঁটে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া যায়। অমরেব মুখেব উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া মনে মনে কথাটা শেষ করে পদ্ম: অন্য কেউ যদি প্রাণহানির অভিযোগ করে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে?

'শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু······ '

দাওয়ায় তুলসী তলায় বসিয়া গোঁসাইজী আপন মনে গাহিতেছিলেন। মৃৎ-প্রদীপের অনুজ্জ্বল শিখাটি বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছে। আলোঅন্ধকারের ভগ্নাংশ তুলসীমঞ্চের খানিকটা জায়গা জুড়িয়া কাঁপে। যেন গোঁসাইজীর গানের পদটির সহিত তাল রাখিয়া মাথা নাড়ে।

কুসুম দাওয়ার এককোণে গালে হাত দিয়া চুপচাপ বসিয়াছিল। জায়গাটা অন্ধকার। তাহার পায়ের কাছে কয়েকটি বেলফুলের গাছ। ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। কীর্তনের সুরে মনের সুপ্ত ব্যথাটা জটখোলা সুতার মত আঁকাবাঁকা ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। 'শীতল বলিয়া······'। সত্যই তো; শীতল বলিয়াই কুসুম চাঁদের সেবা করিয়াছিল। অথচ চাঁদের স্পর্শে কুসুমের মন, কেন যে শান্ত শীতল হয় না. কে জানে! দিন দিন কুসুমের যেন কি হইতেছে। সবসময় ভাসা ভাসা একটা চিন্তায় তাহার মন ভরিয়া থাকে। ক্ষণে ক্ষণে ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। কুয়ায় জল তুলিতে গিয়া দড়ি হাতে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকে। কখনও বা বুক পর্যন্ত ঝুঁকিয়া কুয়ার জল দেখে; ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করিবার সময় ভিজা মেঝেটায় মাথা রাখিয়া দীর্ঘ সময় পড়িয়া থাকে। মনে মনে বলে, ঠাকুর, আর আমি পারি না। বড্ড কষ্ট হয় বুকে। বাঁচাও, আমায় তুমি বাঁচাও।

বুঝি দমকা হাওয়ায় কুসুমের চোখের পাতা বুজিয়াছিল। চোখ খুলিয়া দেখে তুলসীমঞ্চের প্রদীপ নিভিয়াছে। শোনে, গোঁসাইজী গাহিতেছেন—:
'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

তাই তো সে যাহা চাহিয়াছে তাহা পায় নাই। অমৃত সাগরে ডুব দিয়াছে, সুধা জোটে নাই, সুধাকর জুটিয়াছে। সুধাকর কি আর ফিরিবে না?

সেই যে ঝড়জলের পরের দিন সকাল হইতেই সুধাকর উধাও হইয়াছে, আজ পর্যন্ত আর সে ফিরিল না। খবর লইতে গোঁসাই বাকি রাখেন নাই। পাওয়ার হাউসের লোকে বলে, সুধাকর কয়দিন হইতেই ডিউটিতে আসে না। সুধাকরের আড্ডা মতিলালের বাড়িতে গোঁসাইজী নিজে গিয়াছেন। মতিলাল বলিয়াছে, সুধাকর আর তাস খেলিতে আসে না। সুধাকর সেদিন সকালে পাঁচটি টাকা ধার করিতে অসিয়াছিল। তাহার পর সুধাকরের চুলের টিকিটি পর্যন্ত আর সে দেখে নাই। কুসুম ভাবে, তাইতো মানুষটা গেল কোথায়? প্রথম প্রথম ক'দিনই ভাত বাড়িয়া কুসুম বসিয়া থাকিয়াছে, ভাবিয়াছে, সুধাকর আসিবে। সবটুকু ভাত চোখের পলকে নিঃশেষ করিয়া বলিবে, আর দুটো দিবি নাকি রে, কুসুম?

বাড়া ভাত নষ্ট হইয়াছে—সুধাকর ফেরে নাই।

গোঁসাইজী কুসুমকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—। কুসুম কোনো উত্তর দেয় নাই। নীরবে শুধু কাঁদিয়াছিল। কি ভাবিয়া গোঁসাইজী বলিয়াছিলেন, 'কাঁদিস নে, মা। যাবে কোথায় লক্ষ্মীছাড়া। ঠিক ফিরে আসবে।'

কুসুম বুঝিয়া পায় না, সুধাকরের এতো রাগ হইবার কারণ কি? না হয় জিদ চড়িয়া গিয়াছিল তাহার, হয়তো সে চাতুরী করিয়া চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। তাই বলিয়া গৃহত্যাগ করিবে।

পুরুষমানুষগুলো বড় অবুঝ। কুসুম যে কেন চাঁদের সেবা করে, অমিয় সাগরে সিনান করিবার জন্য ডুব দেয়—সুধাকর তাহা বোঝে না। জোর করিয়া তাহার দাবীটুকু মিটাইয়া লইতে চায়। সুধাকরের দাবী কুসুম অস্বীকার করিতে পারে না। জগতে ইহাই তো নিয়ম। কিন্তু কুসুম নিয়মের ব্যতিক্রম। তাহার মন যে তাহার নিজস্ব নয়, এই দেহটাও বনমালীর পায়ে সঁপিয়া দেওয়া।

'তিল তুলসী দিয়া এ দেহ সমর্পিলুঁ···।' সুধাকর কেন বোঝে না, কুসুম

তাহার মা রাধারাণীর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া শপথ করিয়াছে, জীবন ভরিয়া সে গোবিন্দের নৈবেদ্য সাজাইবে। কৃষ্ণ তাহার স্বামী। তিনিই তাহার দেহ-মনের প্রভু। তাঁহার পায়ে উৎসর্গ করা এ ফুল তো আর কাহাকেও দেওয়া যায় না। সে যে বড় পাপের কথা। ছি ছি তাই কি হয়।

তবে সুধাকর কে—?

অনেক ভাবিয়াও কুসুম এ সবের কোনও উত্তর পায় নাই। গোঁসাইজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও তাহার সাহসে কুলায় না।

—কুসুম ? অন্ধকার হইতে গোঁসাই ডাকেন।

ধড়মড় করিয়া কুসুম উঠিয়া বসে।

কাছে আসিলে গোঁসাই কুসুমকে বলেন, 'বোস্; এখানে বোস্। আমার কাছে।'

কুসুম গোঁসাইজীর পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

—কি ভাবছিলি ?

কুসুম এবারও নিরুত্তর থাকে। জবাব দেয় না।

গোঁসাই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলেন, 'শাস্ত্রে আছে মনশ্চিন্তা মৃত্যুসম। কার জন্যে তুই এতো ভাবিস ? সুধাকর জ্ঞানহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত। সংসারের মধ্যে তাকে ফিরে আসতেই হবে। তার শান্তি সংসারে, গৃহে। বাইরে কতোদিন থাকবে—?'

—এ সংসারে সে সুখ পায় না—। বলিবার ইচ্ছা ছিল না তবু অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা কুসুমের মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়।

—সুখ কি হাট-বাজারে বেচাকেনা হয়, মা। সুখ অন্তরের জিনিস। কেউ কৃষ্ণ নামে সুখী, কেউ অর্থলোভে সুখী যার যেমন মন, সে তেমনি জিনিসেই সুখী হয়।

কুসুম কোনো কথা বলে না। মনে মনে ভাবে, সুধাকরকে সুখী করিতে হইলে কুসুমকে তাহার ধর্ম নষ্ট করিতে হইবে। দেহ, মন—সবই অশুচি, অপবিত্র করিয়া—এতোদিনের একনিষ্ঠ বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়া তবেই না তাহা সম্ভব।

কথাটা মনে পড়িতে কুসুমের গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। ভয়ে নয়।

কুসুম ভালো করিয়াই জানে সুধাকর তাহার স্বামী। তথাপি এ-স্বামীর সহিত তাহার মনের প্রার্থিত পুরুষটির মিল নাই। গোঁসাই বলেন—

কুসুমের মনের মধ্যে যে পুরুষটি ঘর বাঁধিয়াছেন তিনি চিরকালের পুরুষ —কৃষ্ণ।

কুসুম প্রায়ই ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে শ্যাম আসেন। তিনি যে মেঘবরণ এ কথা লক্ষ লক্ষ বার কুসুম শুনিয়াছে কিন্তু স্বপ্নের শ্যামকে গৌরবরণ বলিয়াই কুসুমের মনে হয়। আর সেই গৌরবরণ শ্যামের হাতে বাঁশি নাই। বদনে, অঙ্গে কোথাও চন্দনের তিলক স্পর্শ করে নাই। তাঁহার কণ্ঠে মালা আছে—তবে সে মালা ফুলের নয়—সাপের। নীলকণ্ঠ মহাদেব ছবি কুসুম দেখিয়াছে। ঠিক তেমনি। কুসুমের শ্যামের গলায় বেড দিয়া একটা সাপ নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

কুসুম ভয় পায় না। কিন্তু কাঁদে। তাহার ভীষণ অভিমান হয়। মনে মনে বলে : ঠাকুর, তোমার এ-রূপ কেন ?

গোঁসাইজী এই অদ্ভুত কৃষ্ণরূপের মর্ম বুঝাইয়া দেন। শেষে কুসুমের অভিমান দেখিয়া মৃদু হাসেন।

—অভিমান করিস নি, কুসুম। অভিমান পাপ। গোবিন্দ দয়া করেছেন তোকে। তাঁর ধর্ম তিনি পালন করেছেন আর তুই করবি অভিমান! পাগল মেয়ে, শোন, একটা তুলসীদাসের দোঁহা শোন্—

দয়া ধরম্‌কি মূল হৈঁয়,
নরক মূল্‌ অভিমান্‌।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া,
যঁও কণ্ঠাগত জান॥

গোঁসাই তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বরে দোঁহা গেয়ে ওঠেন। তারপর কুসুমকে বোঝান দোঁহার ভাবার্থ· ধর্মের মূল দয়া আর নরকের মূল অভিমান। রামভক্ত তুলসিদাস তাই নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে তুলসি, তোমার দেহে যতদিন প্রাণ আছে তুমি দয়া করতে দ্বিধা করবে না।

গোঁসাইয়ের কথায় কুসুমের চোখের জল আরও বাড়ে। মনে মনে বলে, গোঁসাই, আমার কথা বলো না, সকলকে কি দয়া করা যায়, না করতে আছে!

অথচ সুধাকরও স্থির করিয়াছে—সে আর হাত পাতিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে না। বয়লারের মত তাহার কামনার বিরাট চুল্লিটা এবার খুলিয়া ধরিবে। সে জ্বলন্ত তাপে কুসুম যদি পুড়িয়াও যায় ক্ষতি নাই। সুধাকর ওসব

ধর্ম-টর্ম বোঝে না—তাহার স্বামীত্ব যদি কুসুম সরাসরি স্বীকার করিয়া না লয়—সুধাকর এবার শক্তি প্রয়োগ করিবে।

সুধাকরের গৃহত্যাগের আগের দিন সেই ঝড়জলের রাতটির কথা কুসুমের মনে পড়ে।

সে-দিন কুসুম ঘুমাইতেছিল। কুসুম কালো। কিন্তু কালো হইলে কি হইবে কুসুমের ঢলঢলে কচি মুখটায় কিসের যেন স্বাদ লাগিয়া থাকে। ডাগর, টানা চোখ। পুরু ওষ্ঠে স্নিগ্ধ একটা হাসি। ঘুমন্ত কুসুমের বুকের বাস সরিয়াছিল, শাড়ির আঁচলটা পায়ের উপর অনেকটা গুটাইয়া গিয়াছিল।

কুসুম স্বপ্ন দেখিতেছিল: ঝড়জলের রাত, ত্রস্ত পদক্ষেপে সে যেন কোথায় চলিয়াছে। পথ অন্ধকার, বিদ্যুৎ-সচকিত প্রান্তর; কাঁটায় বস্ত্রাঞ্চল আটকাইয়া যায়—চরণ ক্ষত-বিক্ষত। এতো বাধা, এতো বেদনা—তবু কী যে আনন্দ!

কুসুমের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া কে যেন আকর্ষণ করে! কে—? শ্যাম? কুসুম শিহরিয়া ওঠে। সলাজ-শংকায় সর্বাংগ অসাড়। ঘুম ভাঙিয়াও ভাঙে না। নিসাড়া হইয়া তাঁহার স্পর্শ লইতে কুসুমের বাধে না।

সে-স্পর্শ ঘন ও উত্তপ্ত হইলে কুসুম চোখ মেলিয়া তাকায়। আলোয় আসিয়া কুসুমের চেতনাটা হঠাৎ বুঝি জাগিয়া ওঠে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই সুধাকর খাট হইতে নিচে গড়াইয়া পড়ে।

কুসুম বিছানায় বসিয়া বিশৃঙ্খল বেশবাস দুই হাতে আঁকড়াইয়া হাঁপাইতে থাকে। বিহ্বল, রুদ্ধবাক্ সে-মূর্তির দৃষ্টিতে স্বপ্নভঙ্গের অগাধ বিস্ময়। অসহ আঁচে তাহার দেহটাও যেন ঝলসাইয়া গিয়াছে। সর্বাংগে অসহ্য দহন-জ্বালা।

পরের দিন হইতেই সুধাকর পলাতক।

সুধাকর সত্যই যে কেমন স্বামী কুসুম তাহা ভালো করিয়া জানে না। মা মারা যাইবার পর গোঁসাইজী কুসুমকে লইয়া তাঁহার নিজস্ব গ্রামে চলিয়া আসেন। সেখানে আসিয়াই কুসুম জানিতে পারে সুধাকর তাহার স্বামী। গোঁসাইজীই তাহাকে কথাটা বলিয়াছিলেন। গোঁসাইজীর কথা কুসুম অবিশ্বাস করিতে পারে না। তাহার মাও গোঁসাইকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। কখনো কখনো গোঁসাইজী যখন তাহাদের বাড়িতে আসিতেন তখন রাধারাণী প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিত—তবু যেন তাহার আশা মিটিত না।

গোঁসাইজীর মুখে কুসুম যেদিন শুনিল সুধাকর তাহার স্বামী—সেদিন সে কম বিস্মিত হয় নাই। জিবের ডগায় একটা প্রশ্ন আসিয়াছিল।

—মা তো আমায় কিছু বলেনি, ঠাকুর।

—আমার নিষেধ ছিলো। খুব ছেলেবেলায় তোদের কণ্ঠি বদল হয়েছিলো, কুসুম। তুই তখন সাত বছরের।

কুসুম আকাশ হইতে পড়িয়াছে। তাহার কণ্ঠি বদল হইয়াছে অথচ মা কিছুই বলেন নাই। কেন? না হয় নাই বলিলেন কিন্তু মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া কুসুম যখন ভগবানকে তাহার দেহমন সর্বস্ব দান কবিল—তাহার পর, আর তো সে সুধাকরের স্ত্রী হইতে পারে না—এ-কথাটাও কি মার একবারও মনে হয় নাই। না কি মা জানিতেন না, একদিন কুসুম তাহার কণ্ঠি-বদল করা স্বামীর কথা জানিতে পারিবে। অনেক ভাবিয়াও কুসুম এ সবের কোন উত্তর পায নাই। গোঁসাইজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও তাহার সাহসে কুলায় নাই।

—কুসুম? অন্ধকার হইতে গোঁসাইজী আবাব ডাকেন।

কুসুম কোনো কথা বলে না। মনে মনে পুরান কথাটি আবার ভাবে, সুধাকরকে সুখী করিতে হইলে কুসুমকে তাহাব ধর্ম নষ্ট কবিতে হইবে। দেহ, মন—সবই অশুচি, অপবিত্র করিয়া।

কথাটা মনে পডিতে কুসুমেয় গায়ে কাঁটা দিযা ওঠে। ভয়ে নয় ঘৃণায়। একটা মাছি যেন আবর্জনার স্তূপ হইতে উড়িয়া তাহার মুখে আসিয়া বসিয়াছে। বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া কুসুম চুপচাপ বসিয়া থাকে।

অন্ধকারে গোঁসাইজী কুসুমকে দেখিতে পান না। আপন মনেই বলেন, 'এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, মা। এখানে পদে পদে বাধা, বিঘ্ন, লোভ প্রবঞ্চনা। আমাদের নিত্যকার জীবনে রিপুর দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তির বাঁধন। এদের দু'হাতে ঠেলে, সরিয়ে, এগিয়ে যাবার মত মন চাই। মনই সব; মনের জমিতেই ফসল ফলে। তেমন মন থাকলে সোনাও ফলবে, মা। এ মনই মায়া, এ মনই জ্ঞান, এ মনই সুখ।'

—মন যা চায়, তাই কি ভালো ঠাকুর? মন্দও যে মন চায়—

—চায় বৈকি মা, অবশ্যই চায়। যে-মন কৃষ্ণ চায়, সেই মনই কামিনী চায়। কিন্তু কায়মনোবাক্যে যে চাওয়া, সেই চাওয়াই কামনা—মন-মন্থন করে চাওয়া। এ জগতে সেই চাওয়াই শ্রেষ্ঠ চাওয়া। মন শুধু হাতই পাতে

না মা, মনের মধ্যে বিচারও যে আছে। যার মনের যেমন বিচার তার কামনা তাই। আমি মনে করি, প্রত্যেকের বিচার-সিদ্ধ মনের কামনাই তাকে সুখী করতে পারে। সংসারের মায়ায় যে মুগ্ধ—যে এই মায়াকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তার সুখ সংসারে। সে সংসারী হোক। স্বামী যদি স্ত্রীর কামনার বস্তু হয়—তাকে স্বামী-গরবিণী হতে দাও। আসলে যা চাও—মন বুঝে চাও—আর যা পাও, মন-প্রাণ দিয়ে নাও।

গোঁসাইজী কথা বলিতে বলিতে থামিয়া যান। যেন তাঁহার কথার মালাটা হঠাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

*

তার হঠাত-ই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। প্রায়ই যায়।

খাদের ভিতর হইতে কাটা কয়লা বহিয়া আনার জন্য ট্রলি থাকে, অর্থাৎ ছোট ছোট লোহার গাড়ি। চেহারাটা চৌব্বাচ্চার মতন। এই ধরনের কয়েকটা ট্রলি মোটা একটি তারের সহিত বাঁধা থাকে। চড়াইয়ে উঠিবার বা ঢালে নামিবার সময় খাদের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ট্রলির তার ছিঁড়িয়া গেলে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে তাহা অবর্ণনীয়। কালো ঝুলের মত অন্ধকারের হাজারটা পুরু পর্দা ভূগর্ভকে আলোকহীন এক বিপদ-সংকুল সুড়ঙ্গ করিয়া রাখে। সে-সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য কিছু কম নয়। কিন্তু তাহার প্রস্থ এবং উচ্চতা বিপজ্জনক। এমনি সুড়ঙ্গ-পথে কয়েকটি কয়লা-বোঝাই ট্রলি উঠিতেছে—কিংবা খালি ট্রলি নামিতেছে, এমন সময় হঠাৎ যদি তার ছিঁড়িয়া যায়? এই হঠাতের পরবর্তী দৃশ্যটা কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। তার-ছেঁড়া লোহার ভারি ট্রলিগুলি খাদের ঢালু পথে উল্কার মত বেগে, সশব্দে নীচে নামিয়া আসিতে থাকে। কোথাও সামান্য বাধা পাইলে—অথবা একটা ট্রলি যদি লাইন হইতে নামিয়া যায় তাহা হইলেই হইল—ওই ভারি ভারি লোহার ট্রলিগুলি সবেগে এ ওর গায়ে ধাক্কা খাইয়া মুহূর্তে এক প্রলয় বাঁধাইয়া তুলিবে। এমনি প্রলয় মাঝে মাঝে বাঁধে। পথ চলতি মালকাট্টা ও বাবুর দল দুর্ঘটনার স্থানে থাকিলে কেহ প্রাণ হারায়—কেহ বা হাত-পা কাটা অবস্থায় বাকি জীবনটা কাটাইয়া দেয়।

তার ছিঁড়িয়া এই রকম একটা 'হলেজ অ্যাক্সিডেন্ট' ঘটিয়াছিল। আর

সেই দুর্ঘটনায় একটা কুলি নিমেষেই রক্ত-মাংসের একটা পিণ্ডতে পরিণত হইল। সারভেয়ার মাথুরের মাথা ফাটিল; ডান হাতের হাড়টা বাহুবন্ধের কাছে টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সূর্যশংকর একটুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। চোট লাগিলেও তেমন মারাত্মক জখম সে হয় নাই।

অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিয়াছিল বেলা নটা দশটা নাগাদ। খাদের উপরে হতাহতদের যখন একে একে তোলা হইল তখন বেলা প্রায় একটা বাজে। খাদের মুখে ভিড়। কুলি, মালকাট্টা, মিস্ত্রী, মজুর, বাবুর দল, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ইঞ্জিনিয়ার সকলেই জড় হইয়াছে। কোলিয়ারীর নতুন ডাক্তার, মজুমদার, মৃত রক্তাক্ত পিণ্ডটার পানে চাহিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে কী যেন একটা স্বগতোক্তি করিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত ক্ষীণতম ইচ্ছাও আর ছিল না। তবু ডাক্তারের কর্তব্যমত মজুমদার মৃত কুলিটাকে একবার পরীক্ষা করিয়াছিল। পরীক্ষাশেষে ইঙ্গিতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছে।

মাথুর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দ্রুত হাতে তাহাকে কয়েকটা ইনজেকশান দিয়া মজুমদার মাথুরকে কোলিয়ারীর ডিসপেনসারীতে লইয়া যাইতে আদেশ দেয়।

সূর্যশংকর নির্বাক নেত্রে সবই লক্ষ্য করিতেছিল। পায়ের যন্ত্রণাই শুধু নয়—মনের মধ্যে সে আশ্চর্য একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

—কই, দেখি কোথায় লাগলো। মজুমদার সূর্যশংকরের প্রতি মনোযোগী হয়।

নিরুত্তরে পা-টা দেখাইয়া দিয়া সূর্যশংকর কুলির দলটার দিকে তাকাইয়া থাকে। মৃত কুলিটাকে এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া কে যেন একটা নোংরা ছেঁড়া-ফাটা তেরপলের টুকরাতে দেহটাকে খানিকটা ঢাকিয়া দিয়াছে। উহাদের অস্পষ্ট কথাবার্তা হইতে একটি বিশেষ কাহিনী ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। আর সূর্যশংকর কেমন এক বিক্ষিপ্ত মনে তাহাই শুনিতেছে।

খাদে আসিবার আগে রামভরত আজ তাহার আওরাতের সঙ্গে জোর ঝগড়া বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সাথিয়া ঘুম চোখে চুলায় ভিজা কাঠ গুঁজিয়া দিয়াছিল, ফলে চুলা ধরে নাই; তাহার উপর না ছিল চা-পাত্তি; না লোটাতে পানি। সকালে চাপাটি ও চা খাইয়া রামভরত খাদে আসে—

দুপুরে বাড়ি ফেরে না—সেই সন্ধ্যায় বাড়ি যায়। খাদে আসার সময় একটা গামছায় মোটা মোটা দু'তিন টুকরা রুটি, দু'চারিটা মির্চা, একটু লবণ, খানিকটা বা চাটনী বাঁধিয়া লইয়া আসে। দুপুরে উহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করে।

আজ সকালে রামভরত ঠেলা দিয়া বউকে উঠাইয়া দিলেও চুলায় ভিজা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া সাথিয়া আবার দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সর্বাঙ্গ দিয়া মাটি আঁকড়াইয়া এমন মরণ ঘুম আর কোনদিন সে ঘুমায় না। অন্তত রামভরত যতক্ষণ না খাদে যায়। সাথিয়া বেঁহুশ হইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার চুলা যে নিভিয়া গিয়াছে—হাঁড়িতে পানি নাই, নদী হইতে জল আনিতে হইবে, রামভরতকে চাপাটি আর চায়ে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে, তাহা সাথিয়ার খেয়াল ছিল না।

খেয়াল হইল তখন—যখন রামভরতের হ্যাঁচকা টানে চোখ মেলিয়া সাথিয়া দেখে, ফিকে সাদা ভোরের গায় উজ্জ্বল তামাটে রঙ ধরিয়াছে, মরচে-ধরা টিনের বেড়াটা হাল্কা ছায়া ফেলিয়া চুপিসারে তাহার গায়ের আলস্য নিজের গায়ে মাখিয়া লইতেছে।

নদী হইতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া, স্নান সারিয়া ফিরিতে রামভরতের ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় লাগে। তাহার পর তাড়াতাড়ি চাপাটি ও চা খাইয়া তাহাকে খাদে যাইতে হয়।

রামভরত ফিরিল, সাথিয়াকেও জাগাইল। কিন্তু চাপাটি, চা—? সাথিয়াকে গালাগাল দিতে দিতে রামভরত খানিকটা ছাতু চাহিল। ছাতু ছিল। কিন্তু ছাতু মাখার জল জুটিল না। হাণ্ডি, লোটা, কোথাও একটু জল নাই। সাথিয়াকে পিতারী মাতারী তুলিয়া যাচ্ছে-তাই ভাবে গালি-গালাজ শুরু করে রামভরত। সাথিয়ার শরীর ভালো নয়। তা ছাড়া মুখ বুজিয়া কুৎসিত গালাগাল সহিয়া যাইবে, তেমন মেয়ে ওদের সমাজে বিরল। উভয় পক্ষের কলহটা যখন চরমে উঠিল তখন রামভরত সাথিয়ার চুলের মুঠি ধরিয়া বেশ কয়েক ঘা পিটাইয়া খাদে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

আর সাথিয়া? ওই তো সাথিয়া। ছাউনী-তোলা খাদ-অফিসের একটু দূরে হরিতকী গাছগুলার তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। চড়া রোদ মাথায় করিয়া এই গরমের দিনে মাইলটাক পথ হাঁটিয়া আসার ক্লান্তি কি কম!

হরিতকী গাছের ছায়ায় বসিয়া বার বার মুখ ও গলার ঘাম মুছিতে মুছিতে সাথিয়া আঁচলের হাওয়া খায়। পাশে একটি বড় বাটিতে রামভরতের জন্য রুটি ও অড়হরের ডাল রাঁধিয়া আনিয়াছে। ঘিউ দেওয়া ডাল। রামভরত তারিফ করিয়া খাইবে। আর পাশেই এক লোটা ঠাণ্ডা পানি। আসিবার সময় সাথিয়া আবার কয়েকটা বিড়িও কিনিয়া আনিয়াছে—রামভরতকে দিয়া যাইবে।

হরিতকী গাছের তলায় বসিয়া সাথিয়া বিশ্রাম লয় আর ভাবে—দূরে খাদের মুখে এতো ভিড় কেন? কি যেন একটা ঘটিয়াছে! এতোটা তফাত হইতে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। কাছে যাইতেও সাথিয়ার সাহস হয় না। সাহেবেরা সকলেই সেখানে। চেনা-জানা মুখ চোখে পড়িতেছে। ওই তো বচন, না? গিরধারী, মাংলু—আরও যেন কে কে?

কয়লা বোঝাই করা টিবিটার কাছে কামিনের দলটাও জোট পাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদেরও কাছে ঘেঁষিতে দেওয়া হয় নাই। ডাণ্ডা-হাতে শিবদয়াল সিং তাহাদের পথ রুখিয়াছে। সাথিয়া দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তবু তাহার মনে হয়—কয়লার গুঁড়া-মাখা কামিনগুলা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। রামভরত কই—রামভরত?

সূর্যশংকরের কয়েক হাত দূরে দাঁড়াইয়া কুলিরা রামভরত আর সাথিয়ার কথাই বলাবলি করিতেছিল। সূর্যশংকরের কানে সেই কথাই ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ করি, রামভরত আর সাথিয়ার কথা ভাবিয়াই সূর্যশংকরের মনটা ক্রমশই আশ্চর্য একটা অস্বস্তি ও বিমর্ষ চিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

পায়ের আঘাত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মজুমদার বলে, 'একটা ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে দি, মিঃ চৌধুরী!

—দরকার হবে?

—ও, নিশ্চয়। আফ্‌টার অল্‌ ইন্‌জিউরী তো।

—বেশ দিন। কিন্তু মাথুর—? সূর্যশংকর ইঞ্জিনিয়ার দোবের দিকে তাকায়। এ দৃষ্টির অর্থ—মাথুরকে এখনও কেন এখানে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে? দোবে জানায় স্ট্রেচার আনার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে। স্ট্রেচার আসিলেই মাথুরকে ডিসপেনসারীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ডাক্তার মজুমদার ইনজেকসানের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করিয়া লইতেছিল। সূর্যশংকর বলে, 'আমি অফিসে যাচ্ছি; আপনি আসুন।'

যে হরিতকী গাছগুলির তলায় সাথিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল, তাহার অদূরেই কোলিয়ারীর অফিস। যাওয়ার পথে সূর্যশংকর আড়চোখে সাথিয়ার দিকে তাকায়। বড় সাহেবকে আসিতে দেখিয়া সাথিয়া পা গুটাইয়া লইয়াছিল। সূর্যশংকর কাছে আসিলে মাথার ঘোমটা আরও একটু টানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লয়। আসিতে আসিতে সূর্যশংকর সাথিয়ার মুখের যেটুকু দেখিতে পায়—সেটুকু তাহার চিন্তাস্রোতের সাথে ভাসিয়া চলে। সহজ, সাধারণ এদেশীয় একটি মেয়ের মুখ। কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। তথাপি এই মুখটি সূর্যশংকরের উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগ্য রামভরত যে আর ইহজীবনে তাহার ঘরবালীর হাতে-সেঁকা চাপাটি খাইতে আসিবে না—এই কথাটি তাহার অপেক্ষমানা স্ত্রীকে কেমন করিয়া জানানো যায় তাহাই সমস্যা।

সমস্যা যত কঠিন হউক তাহা এড়াইয়া যাইবার পথ সূর্যশংকরের ছিল না। কোলিয়ারীর ম্যানেজার হিসাবে তাহার দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা বেশি। সব কিছুর জন্যই সে দায়ী। এত বড় একটা দুর্ঘটনার সমস্ত দায় তাহাকে বহন করিতে হইবে। কত যে লেখালেখি, ছুটাছুটি—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অবশ্য সবই যে এই মুহূর্তে, তাহা নয়। পরেও।

উপস্থিত যাহা করা উচিত তাহাও একেবারে যৎসামান্য নয। ইঞ্জিনিয়ার দোবেকে অফিস কামরায় ডাকাইয়া পাঠাইয়া সূর্যশংকরকে এখনই দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় কাজকর্ম সারিতে হইবে। কিন্তু সর্বাগ্রে সাথিয়াকে কোন গতিকে এখান হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার।

শেষ দুপুরে অফিস হইতে উঠিয়া সূর্যশংকর যায় ডিস্‌পেন্‌সারীতে। সেখানে মাথুরের তদারক সারিয়া উঠিতে বিকেল শেষ হইয়া আসে। মজুমদার বলিয়াছে, মাথুরকে টাউনের সিভিল হস্পিট্যালে পাঠাইতে হইবে। আজ রাত্রেই পাঠাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু এ জঙলি জায়গার সবই অদ্ভুত। সারাদিনে আসার ট্রেন একটি, যাওয়ার ট্রেনও সেই এক। আসিতে হইলে সকাল, যাইতে হইলে বিকাল। আজ আর ট্রেন ধরা যাইবে না। প্রায় তিন মাইল পাহাড়ী পথ ভাঙ্গিলে তবে স্টেশন। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নাই। মোটর করিয়া যওয়া চলে—কিন্তু রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ। জার্কিং হইবে। মজুমদার তাহাতে রাজী নয়।

ডিস্‌পেন্‌সারী হইতে সূর্যশংকর সবে মাত্র উঠিয়াছে—এমন সময় ঘোড়ায় চড়িয়া ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী থানা হইতে দারোগা আসিয়া হাজির। চিঠি পাইয়া অ্যাক্‌সিডেন্টের তদারক করিতে আসিয়াছে। দারোগা ভদ্রলোক নাগপুরের লোক। বয়সে যুবক—এখনও গোঁফ ঘন হয় নাই; কাজে কাজেই পাকা দারোগা হইতে পারে নাই। বৃত্তান্ত শুনিয়া বলে: বেকার এ ছুটাছুটি ম্যানেজার সাহেব। আণ্ডার্‌গ্রাউণ্ডমে অ্যাকসিডেণ্ট। আদমী তো হামেশাই মারা যায়। এহি ডেথ্‌ লিয়ে পুলিস কি এন্‌কোয়ারী করবে! ডাক্তারবাবুর ডেথ্‌ সার্টিফিকেট তো আছে, না! ঠিক আছে—লাস আগ দিতে ভেজিয়ে দিন।

দারোগাকে সাথে করিয়া সূর্যশংকরকে আবার অফিসে ফিরিতে হয়। পুরানো ইঞ্জিন-ঘরের শেডের তলায় রামভরতের দেহটা তেমনিভাবেই ঢাকা দেওয়া পড়িয়া আছে। একটু দূরে সহদেব সিং এবং আরও দু'-চার-জন কুলি গোল হইয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে। শব সৎকারের সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। শুধু বড়সাহেব একটিবার মুখের কথা বলিলেই তাহারা লাস উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে। দারোগা না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ আজ পোড়ান হইবে কি না, সে বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল। ব্রাহ্মণ মিশির আবার বলিয়াছে, অপঘাতে মৃত ব্যক্তিকে সূর্যাস্তের আগে না পোড়াইলে রামভরত প্রেতযোনি পাইবে। এই বিষয় লইয়াই এতক্ষণ রামভরতের সহকর্মীদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা চলিতেছিল।

রাম নাম স্যাত্‌ হ্যায়। রামভরতের মৃতদেহ লইয়া সহদেবরা চলিয়া যায়। সমবেত কণ্ঠস্বরের গুরু গম্ভীর একটা ধ্বনি পড়ন্ত বিকালের রৌদ্র-কিরণের ম্লান আভাকে যেন হঠাৎ আরো ম্লানতর করিয়া দেয়। ছোট একটা ঘূর্ণি ইঞ্জিন-ঘরের নিকট হইতে একরাশ কয়লার গুঁড়া উড়াইয়া লইয়া পাক খাইতে খাইতে আগাইয়া যায়—আর ঠিক সেই হরিতকী গাছগুলির গোড়ায় আসিয়া চক্রাকারে শূন্যে উঠিয়া আকাশে মিলাইয়া যায়। সকালে এইখানেই সাথিয়া বসিয়াছিল।

অপস্রিয়মান মূর্তিগুলির দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে একসময় সূর্যশংকরের মাথাটা একটু নীচু হইয়া আসে; বুক ঠেলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ ভাঙিয়া সূর্যশংকর বাংলোয় ফিরিতেছিল। সূর্য ডুবিয়াছে। পশ্চিম দিগন্তের তামাটে রঙ ফিকা হইয়া আসিতেছে। দিনের শেষ আলোটুকু নিঃসাড়ে শুষিয়া লইয়া গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে ক্রমশই অন্ধকার জমিতে থাকে। অসংলগ্ন পদক্ষেপে সূর্যশংকর ফিরিয়া চলিয়াছে। সর্বাঙ্গ ভরিয়া অসহ্য ক্লান্তি। মনটাও তাহার ভাষা মেঘের মত ঘটনা হইতে ঘটনান্তরে ভাসিয়া রহিয়াছে। নীড় প্রত্যাগত পাখিদের পাখার ঝাপটা ও কলকাকলিতে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সূর্যশংকর পথ ঠাওর করে। আবার আগাইয়া চলে।

কি যেন হইয়া গেল? অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে তিনজন হাঁটিয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ প্রতিধ্বনিত একটা ক্ষিপ্ত শব্দকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতেই সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। মাথুর হযতো বাঁচিবে—অঙ্গহীন হইয়া জীবন কাটাইবে। সূর্যশংকর নিজে বাঁচিয়া গিয়াছে। দোবে বলিতেছিল—ভাগ্য; দৈব। তাহার যুক্তিতে, একই ঘটনার মুখামুখি হইয়া কেহ মরে, কেহ বাঁচে—একই অবস্থার মাঝে পড়িয়া কেহ হারে, কেহ জিতে। ইহাই ভাগ্য—অদৃষ্ট। অদৃষ্ট আর দৈব—এক রহস্য। কখনো কখনো তোমার অপ্রত্যাশিত স্বপ্নকে অবহেলায় হাতের মুঠায় তুলিয়া দেয়, আবার কখনো কখনো হাতেব মুঠা হইতে শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে ছিনাইয়া লইয়া নাগালের বাহিরে ছুঁড়িয়া দেয়। একদিকে ইহার অপার করুণা, আশ্চর্য পক্ষপাতিত্ব—অপরদিকে যুক্তিহীন নির্মমতা, অমোঘ দণ্ড।

বেচারী রামভরত! সূর্যশংকর যে-দিন হইতে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল ঘেরা এই কোলিয়ারীতে ম্যানেজারি করিতেছে সে-দিন হইতেই রামভরত সূর্যশংকরের সাথী। ম্যানেজার সাহেবের খাস পিয়ন বা চাকর। কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান এই যুবকটিকে সূর্যশংকর স্নেহ করিত। একটু বোকা হইলেও রামভরতের কর্তব্যজ্ঞানের অভাব ছিল না। আর সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল তাহার টান। সাহেবের জন্য রামভরতের গভীর একটা ভালবাসা ছিল। কেন যে, সূর্যকংকর তাহা জানে না। আজ সারাদিন শত কাজের মাঝেও সূর্যশংকর বারবার শুধু রামভরতের কথাই ভাবে। খুঁটিনাটি কতো ঘটনাই তাহার মনে আসে আর যায়—মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে।

সূর্যশংকর মুখ তোলে। সামনেই তাহার বাংলো দেখা যাইতেছে। বারান্দায় আলো। বেতের চেয়ারে বনলতা; অমর সামনে পায়চারি করিতেছে।

গেটের কাছাকাছি সবেমাত্র আসিয়া পৌছাইয়াছে—এমন সময় হঠাৎ অন্ধকার ঝোপের আড়াল হইতে কি যেন ছুটিয়া আসিয়া সূর্যশংকরের পায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। আর একটু হইলেই সূর্যশংকর পড়িয়া যাইত। টাল সামলাইয়া পা ছাড়াইয়া লইবার জন্য সে পা ছোঁড়ে। পায়ের উপর হইতে ভারটা তবু সরে না। সূর্যশংকর আবার চেষ্টা করে; নিষ্ফল হয়।

কি এটা? সূর্যশংকর ভালো করিয়া নজর করিবার চেষ্টা করে। না, কুকুর বা অন্য কোন পশু তো নয়। এ মানুষ। পিঠভর্তি চুল ছড়ান। মুখ নীচু। কে যেন দুই হাতে সূর্যশংকরের কঠিন বুট সমেত পা দুটি বুকের মধ্যে কঠিনভাবে সাপ্টাইয়া ধরিয়াছে। সূর্যশংকর শুধু বিস্মিতই হয় না, তাহার বুকটাও হঠাৎ কাঁপিয়া ওঠে।

—এই কোন্ হ্যায়? ছোড়ো—; ছোড়ো জল্দি! পা ঝাঁকুনি দিয়া সূর্যশংকর নিজেকে মুক্ত করিতে চায়।

পায়ের কাছে যে মাংসপিণ্ডটা হাঁটু-বুক এক কবিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোন সাড়া-শব্দ নাই। একটা ভারি পাথর যেন হঠাৎ সূর্যশংকরের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

সূর্যশংকর চিৎকাব করিয়া ডাকে, 'অমর, ও অমর—এই যে গেটের কাছে। তাড়াতাড়ি একটা বাতি নিয়ে এস।'

অন্ধকারেই সূর্যশংকর হাত নামায়। নরম একটা বাহু তার মুষ্টিবদ্ধ হয়। মানুষটিকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া সূর্যশংকর আবার বলে, 'এই, কোন হ্যায়—উঠো তুরন্ত্।'

সূর্যশংকরের পায়ের কাছে লুটানো মূর্তিটা অদ্ভুতভাবে গোঙাইয়া গোঙাইয়া কাঁদিতে থাকে।

টর্চ লইয়া অমর আসিয়া পৌছাইয়াছে। পিছনে বনলতা। টর্চের আলোয় সূর্যশংকর কোনোরকমে একটা পা ছাড়াইয়া লইয়া পদতলের মূর্তিটাকে খানিকটা তুলিয়া ধরে।

এতক্ষণে মূর্তিটিকে চেনা যায়। সাথিয়া—রামভরতের স্ত্রী। আলোয় সাথিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া সূর্যশংকরের মত কঠিন মানুষও শিহরিয়া ওঠে। কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে—সারা মুখ ফোলা, গলায়, বুকে, হাতে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। চুল খোলা। পিঠে, মাথায় চুলগুলি আলুথালু হইয়া রহিয়াছে।

—ধর তো, অমর! ছাড়াতে পারছি না—!

অমর বনলতার হাতে টর্চ দিয়া সাথিয়াকে ধরিতে আসে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় না। সাথিয়া এক ঝটকায় অমরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। অমর আবার আসে। এবার সাথিয়া তাহার হাতে জোর কামড় দেয়। হাত লইয়া অমর সরিয়া দাঁড়ায়; যন্ত্রণাবিকৃত শব্দ করিতে থাকে।

—তুমি পারবে না। বাহাদুরকে ডাকো।

অমর বাহাদুরকে ডাকিতে থাকে।

সূর্যশংকরের যে পা-টায় আঘাত লাগিয়াছিল, সাথিয়া এখন সেটাকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণায় পা-টা টনটন করে। ইচ্ছা করিলে সূর্যশংকর সাথিয়ার বুকে বা পেটে জোর দু'টা লাথি মারিতে পারিত। নিজেকে মুক্ত করাও ইহাতে কঠিন হইত না। কিন্তু পা যেন উঠিতে চায় না। পাথর হইয়া থাকে।

—আরে ছোড়ো না! চোট্ লাগা হায় ইয়ে গোড়মে। দুখাতা হায়। কুছ বোল্না হায় তো বোলো! সূর্যশংকর অসহায়ের মত বলে।

সাথিয়া কথা বলে না, কাঁদে। এবার আর গোঙানি নয়—ডুকরাইয়া কাঁদিতে থাকে।

বাহাদুর আসিলে সূর্যশংকর সাথিয়াকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে ধরিতে বলে। বাহাদুর পিছন হইতে সাথিয়াকে বুকের মধ্যে জাপ্টাইয়া ধরিয়া টান দেয়।

সাথিয়ার গায়ে অসুরের শক্তি আসিয়াছে। সহজে বাহাদুর তাহাকে হঠাইতে পারে না। দু'জনায় অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি চলে। ধস্তাধস্তিতে সাথিয়ার গায়ের শাড়ি খুলিয়া পড়ে; জামা ছেঁড়ে। অন্ধকারে এলোকেশী এক চামুণ্ডা মূর্তির ধক্‌ধকে চোখ দু'টি জ্বলিতে থাকে। অবশেষে কোনরকমে পায়ের উপর হইতে সাথিয়াকে সরাইয়া লইলে সূর্যশংকর একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ায়।

সাথিয়া ডানা-কাটা পাখির মত ঝট্‌পট্ করে, আর বাহাদুরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়।

সূর্যশংকর বলে, 'বাহাদুর, উসকো ঘরমে বন্ধ্ করকে তালা লাগা দেও। আর দেখো, প্যয়ছানতা না রামভরতকো ডেরা। জল্‌দি যাও; দো চার আদমি বোলাকে লে আও—বাদ ইয়ে পাগলীকে ঘর ভেজ দেও।

নিজের ঘরে সাথিয়াকে তালা বন্ধ করিয়া বাহাদুর গেল লোক ডাকিতে। ওদিকে খোলা জানালা দিয়া সাথিয়ার তীব্র ক্রন্দন ও চিৎকার ভাসিয়া আসিতেছে। পাগলই বটে—সাথিয়া পাগলের মতই অসংলগ্ন প্রলাপ বকে। স্বামীকে সে ফেরত লইতে আসিয়াছে। বড়সাহেব ইচ্ছা করিলেই তাহার স্বামীকে ফেরত দিতে পারে। তাহার স্বামী আর দোষ করিবে না। তাহারা এখান হইতে চলিয়া যাইবে। সাথিয়া আর কোনদিন সকালে ঘুমাইবে না। এবার সকাল সকাল ঘুম হইতে জাগিবে, চুলা ধরাইবে, চাপাটি সেঁকিবে, লোটায় জল রাখিবে। সাহেব—তোমার পায়ে পড়ি—আমার মরদটিকে ফিরাইয়া দাও। আমি তোমার ঝুটা পরিষ্কার করিয়া দিব, তোমার মদৎ করিব, তোমার রাণ্ডি হইব।

নিজের ঘরে বিছানায় চুপচাপ সূর্যশংকর শুইয়া শুইয়া সব শোনে।

অমর বলে, 'শুনছো, সূর্যদা ?'

—শুনছি! মৃদু স্বরে সূর্যশংকর জবাব দেয়।

—সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে নাকি ?

—যেতেও পারে।

—ট্র্যাজিক !

এক গ্লাস ওভালটিন্ লইয়া বনলতা ঘরে ঢোকে।

—একটু বেশি করেই করলাম, খেয়ে নাও। বিছানার পাশে বসিয়া বনলতা সূর্যশংকরের হাতে গ্লাস তুলিয়া দেয়।

সূর্যশংকর বিনা আপত্তিতেই উঠিয়া বসে ; ওভালটিনে চুমুক দেয়। বনলতা সূর্যশংকরের চোট্-খাওয়া পায়ে হাত বুলাইতে থাকে।

—পা-টা বেশ ফুলেছে তোমার। জোরেই লেগেছে।

—হ্যাঁ, তা লেগেছে! দ্ব্যর্থবোধক স্বরে কথা বলে সূর্যশংকর।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ পরিপূর্ণ নীরবতা নামিয়া আসে। সকলেই আত্মচিন্তায় মগ্ন। কেহ কাহারো চোখের দিকে পর্যন্ত তাকায় না। সাথিয়ার মর্মভেদী ক্রন্দনের তীব্রতাটাও হঠাৎ মন্থর হইয়াছে। দীর্ঘ করুণ খেদোক্তিগুলি থাকিয়া থাকিয়া জোয়ার আসা জলস্রোতের মত ঘরের তিনটি মানুষের মনের তট ভিজাইয়া দিয়া আবার সরিয়া যায়। বনলতা হঠাৎ বলে, 'মেয়েটার কী কপাল! পেটের ছেলেটা এখন বাঁচলে হয়।'

সূর্যশংকর ও অমর দু'জনাই চমকাইয়া ওঠে।

—ছেলে? সূর্যশংকরের চোখে অগাধ বিস্ময়।

—ও তো অন্তঃসত্বা।

—অন্তঃসত্বা!

সূর্যশংকরের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বনলতা মৃদুস্বরে বলে, 'বাহাদুর ওকে যখন তোমার পায়ের ওপর থেকে সরিয়ে·নিলো তখন—' কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করে বনলতা। পরেই আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'বেচারী!'

যেন একটা হরিণী চোখের সামনে পালাইয়া জঙ্গলে লুকাইল—আর সূর্যশংকর তীব্র দৃষ্টিতে তাহারই অনুসরণ করিতেছে এমনভাবে তাকাইয়া থাকে। মনের একটা জট খুলিয়া গিয়াছে। ও, ভাবী জননী বুঝি-বা এইজন্যই সকালে দাওয়ায় মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া পড়িয়া আলস্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চুলা ধরাইতে পারে নাই, জল আনিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।

সাথিয়ার কৃত অপরাধের জন্য রামভরত তাহাকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়াছে—কঠিন শাস্তি। কিন্তু একটিবারও সে এই পরম বস্তুটির কথা কি মনে করিয়াছিল? ভাবিলে হয় তো অমন অভিমান করিয়া চলিয়া যাইত না।

আর সে নিজে! নিজেকেও সূর্যশংকরের যথেষ্ট ভাগ্যবান ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। পায়ের কাছে মেয়েটা যেভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সূর্যশংকরের বুট সমেত সবল লাথিটা অনায়াসে তাহার পেটে পড়িতে পারিত। অথচ পড়ে নাই। ভাগ্য; নেহাতই ভাগ্য। আঃ—সে বাঁচিয়া গিয়াছে—, বিরাট একটা অপরাধের ভার হইতে যেন মুক্তি পাওয়া গিয়াছে। সূর্যশংকর স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে।

বিচিত্র এই মানুষের মন। নিরবচ্ছিন্ন একটা প্রাণস্রোত অলস গতিতে বহিয়া চলে; তার না থাকে কোনও আকর্ষণ, না কোনও উদ্দেশ্য। ধারাবাঁধা, মাপজোখ-করা কতকগুলি অভ্যাসের, বোধ এবং সংস্কারের ভেলায় ভাসিয়া পরম নিশ্চিন্তে আমরা বহিয়া যাই। হঠাৎ যখন ভেলা ভাঙ্গে, সংসাররূপী সমুদ্রের হাজারো ঢেউ অকস্মাৎ ফুঁসিয়া ওঠে, তখন শুধু চমকই লাগে না—কেবলমাত্র নিজেকে নিঃসহায়ই মনে হয় না, উপরন্তু যে-ভেলাকে কোনদিন বিচার করি নাই, যাহার ক্ষমতা-অক্ষমতা, ভালো-মন্দর খোঁজ করি নাই—শুধুমাত্র পাঁচজনের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম—, এবার তাহার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠি। অবিশ্বাস বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি একে একে তাহার কত যে হিসাব কষা শুরু হয়। আর সেই হিসাবমতই দেখি— বহুদিনের সঞ্চিত অনেক পুঁজিই এখন অসার, কাণা কড়িতেও তাহা বিকাইবে না। অতএব উহাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলিয়া দাও। এমনি করিয়াই তো মনের পাতা ঝরে, জঞ্জাল বাড়ে।

পিটার কবেই চলিয়া গিয়াছে।

হীরার দড়ির খাটিয়াটা শূন্য পড়িয়া থাকে। জ্বরের ঘোরে, বুকের যন্ত্রণায় আর কেহ করুণ কণ্ঠে বিলাপ করে না। কেহ বলে না, 'কিসি ফিকিরসে ইয়ে দরদ্ তো থোড়ি কমা দে বাঈ, শালানে কালিজা কটতি হ্যায়ে।' একটু পরেই আবার ছটফট করিতে করিতে কেহ ডাকে না, 'তু আ যা হীরা—। নাগিচ আ যা— জহর কুছ্ হ্যায় তো দে! পিলা দে; মর্ যায়। গোর ভি মালুম ইত্‌নে তক্‌লিফ না দেগা।'

আহা, বেচারা পিটার সারাদিন, সমস্ত রাত কী কষ্টটাই না সহ্য করিয়াছে; ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়াছে। বারবার বিষ চাহিয়াছে। বিষ খাইয়া যন্ত্রণার হাত হইতে সে অব্যাহতি পাইতে পর্যন্ত রাজি ছিল।

অথচ হীরা তাহাকে বিষ দেয় নাই, জল দিয়াছে। মৃত্যু নয়, প্রাণ।

কেন? পিটার তাহার কে? কেন এই মমতা এবং এই শূন্যতা?

এই কি সেই হীরা—একদিন যে পিটারের বুকের উপর ভোজালি তুলিয়া তাহাকে ঝড়বৃষ্টিতে ঘরের বাহির করিয়া দিতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করে

নাই। আর কেনই বা আজ পিটারের ফেলিয়া-যাওয়া খাটিয়াটা শূন্য রাখিয়া নিজে মাটির দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকে! অদ্ভুত একটা দেশজ সংস্কারকে কেন হীরা প্রাণপণে প্রশ্রয় দেয়। সে শুনিয়াছে, বেমারী-লোকের শূন্য-খাটিয়া অধিকার করা অশুভ। ইহাতে অসুস্থ ব্যক্তি নাকি আর বাঁচে না। যতদিন সে সুস্থ না হইতেছে ততদিন খাটিয়া শূন্যই থাকিবে। পিটারের শূন্য খাটিয়ায় মাঝে মাঝে হাত রাখিয়া হীরা যেন পিটারকে স্পর্শ করিতে চায়। বলিতে চায়, 'গার্ড সাহাব, আপনে নিদ যাইয়ে। ডর কিজিয়ে মত, দো চার দিনোমে আচ্ছা হো যাইয়ে গা।'

হীরাবাঈ মতিবাঈয়ের বোন। ও-অঞ্চলের একজন কুখ্যাত বাঈজী ছিল এই মতিবাঈ। নাচে-গানে তেমন পারদর্শিতা কোনদিনই লাভ করিতে পারে নাই; দেহ-ব্যবসায়ে শুধু নাম কিনিয়াছিল। অক্লান্ত সঙ্গদান এবং বিকৃত যৌনাচারের হরেক রকম খোরাক যোগাইতে পারিত বলিয়াই তাহার আসর ছিল জম-জমাট। আর ছিল রূপ। সে রূপও টিঁকিল না; আসরের সব আলো নিভিল। সে কী অন্ধকার তখন! তখনই না ওস্তাদ ইব্রাহিম মিয়া আসিয়াছিলেন। হীরাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—বিল্লী বোলে তো লাট্‌ঠা ······।

এতদিন হীরা মনেপ্রাণে তাহাই মানিয়াছে। বিল্লীরা তো দলে দলে তাহার দুয়ারে আসিয়া ডাকাডাকি করিয়াছে—আর হীরা লাঠি দিয়াই তাহাদের দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। পিয়ারের কথা বলাই বাহুল্য। হীরা তাহার দিদিকে দেখিয়া বুঝিয়াছে পিয়ার আর সুরত—প্রেম আর রূপ এই দুই-ই অসার। তবু রূপের কিছুটা মূল্য আছে। রূপ চিরকাল থাকে না বটে, যতদিন থাকে ততদিন প্রেমিকের অভাব ঘটে না। তা ছাড়া রূপের হাট জমাইতে পারিলে তো কথাই নাই—সামান্য কটাক্ষও কাঞ্চনে বিকায়। রূপের এ-হেন বাস্তব মূল্যটা বুঝিতে বুদ্ধির প্রয়োজন ঘটে না। তৃষ্ণার্তের দল যে চাতক পক্ষীর মত তাহার কাছে আসিয়া ভিড় জমাইবে, ইহা কে না জানে!

সাবধানী চতুর ব্যবসায়ী যেমন স্থায়ী মূলধন কখনই কারবারে খাটায় না, বহু বুদ্ধিমান মানুষ যেমন তাহার স্বল্প পুঁজির টাকায় হাত দিতে চাহে না, অথচ পাঁচজনের কাছে তাহার সম্পদের সংবাদটা সাধারণ কতকগুলি সুবিধা আদায়ের জন্য গোপন রাখিতেও রাজী নয়, হীরা যেন তেমনি। রূপ লইয়া

সে কারবার ফাঁদিবে না। কারণ রূপের কারবার চোরাবালির উপর প্রাসাদ গড়ার মতনই। কিন্তু ভগবানের দেওয়া রূপকে সৌভাগ্যবশত যখন দেহের কোটায় বন্দী করিতে পারিয়াছে তখন সে-দেহের শিখা জ্বলুক না, ক্ষতি কি। আসুক পতঙ্গ, আলিঙ্গন করিতে আসিয়া তাপ লাগিয়া তাহাদের পাখা পুড়ুক, জ্বলুক, মরুক। আজ পতঙ্গ পুড়িতেছে তাহাতে কি, তেল ফুরাইলে তো একদিন প্রদীপ নিজেও নিভিত।

পুরুষকে নয়—পুরুষের লালসাকে বোধ হয় হীরা ঘৃণা করিত; অবিশ্বাস করিত তাহার প্রেমকে। আজীবন যে শুধু পুরুষের দেহ-বুভুক্ষা ও সুবিধাবাদী শিকারী মনটার রূপ দেখিতে অভ্যস্ত, তাহার কাছে পুরুষ মানুষ একটা লোভী ইতর পশু ছাড়া আর কি-ই বা হইতে পারে। অন্তত এতদিন তাহাই ছিল। তাহার রূপের আগুনে যাহাদের পাখা পুড়িয়াছে, তাহাদের জন্য হীরার কোনদিন এতটুকু দুঃখ হয় নাই। বরং মনে মনে খুশীই হইয়াছে। হীরার মনের এই মর্ষকামিতা স্বাভাবিক।

আকস্মিকভাবেই না ঝড় উঠিল; দমকা হাওয়ায় মনপত্রের বৃন্ত ভাঙ্গিল।

কিন্তু এখন যে পাতা ঝরা। সুরত কি ঝুটা? ইব্রাহিম মিয়া কি ঠিক বলিয়াছেন? সবই যদি ঝুটা, তবে কেন এই অস্বস্তি, করুণা, শূন্যতা? কেন পিটারও মিথ্যা হইয়া যায় না?

একদিন শহরের বড় হাসপাতালে যাইয়া পিটারকে দেখিয়া আসার ইচ্ছাটা এখনও খুবই প্রবল হীরার। সে শুনিয়াছে জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য পিটার নাকি ঘোলাটে চোখ মেলিয়া পড়িয়া আছে। কাহাকেও চিনিতে পারে না।

হাসপাতালে ঢুকিয়া কি ভাবে যে পিটারের সঙ্গে দেখা করিবে, হীরার সে এক সমস্যা! দেখিব বলিলেই কি দেখা যায়। কে তুমি? বেশ-ভূষা, আলাপ-আচরণে তোমাকে বি. এন. রেলের গার্ড মিঃ বি ডবলু পিটারের আত্মীয়া অথবা পরিচিতা বলিয়া তো মনে হয় না। তবে, দেখা করিতে চাও কেন?

কেন যে—সে-কথা হাসপাতালের লোককে হীরা কি বুঝাইবে? নিজেও কি সে জানে?

পিটারের বুকে নাকি জল জমিয়াছে। অসুখটা খারাপ; কি হইবে বলা যায় না।

হীরা আপন মনে এইসব কথাই ভাবে।

পিটার কি এখনও জ্বরে অচৈতন্য? তাহার 'আঁখের হল্‌দি' কি মুছিয়া যায় নাই? হীরার কথা গার্ড সাহেবের মনে আছে—না, ভুলিয়া গিয়াছে? হীরাকে কি পিটার চিনিতে পারিবে?

লছমি, এ লছমি? বাহিরে আসিয়া হীরা ডাক দেয়।

ভাঙ্গা মালগাড়ির ছায়ায় বসিয়া লছমি শিবলালের বাঁশি শুনিতেছিল। ডাকটা তাহার কানে যায় নাই।

চালার বাঁশের আড়ে একটা হাত দিয়া হীরা ঝুঁকিয়া দাঁড়ায়। দেহটা তাহার বাঁকা ধনুকের মত বাঁকিয়া থাকে। একদৃষ্টে শিবলালের আর লছমীর পানে তাকাইয়া থাকে হীরা।

শিবলাল বাঁশের বাঁশিতে দেহাতি মেঠো একটা সুর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ, নির্জন, হলুদ-দুপুরের সমস্ত আলস্য যেন বাঁশির, রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল—শিবলাল এতক্ষণে তাহা মুখর করিয়া বাতাসে ছড়াইয়া দিয়াছে।

স্টেশনের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় কে যেন আসিয়া দাঁড়ায়। কে—মস্টারবাবু না? হ্যাঁ—তিনিই তো। শিবলালকে ডাকিতেছেন বোধ হয়।

হীরা নামিয়া আসে। শিবলালের প্রায় কাছাকাছি আসিতেই হীরার মূর্তিটা শিবলালের চোখে পড়ে। ঠোঁট হইতে বাঁশি খসিয়া পড়ে। লছমীও পিছনে তাকায়।

—মাস্টারবাবুনে বোলাতা হ্যায়, লালাজী। যাওনা—। হীরা মৃদু হাসে। শিবলালের নামের শেষঅংশটুকু লইয়া তাহার এ-পরিহাস আজ নূতন নয়।

শিবলাল একবার স্টেশনের দিকে তাকাইয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। বাঁশিটা হীরার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলে, তু রাখ্ দে না, শাড়ওআইন।

হীরা কিছু বলিবার আগেই শিবলাল জোর কদমে আগাইয়া যায়। হীরা অবাক। ছোঁড়াটার সাহস দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। হীরাকে বেমালুম শালী বলিয়া ডাকিল, তাহার হাতে বাঁশি গুঁজিয়া দিয়া দিব্যি চলিয়া গেল। তামাশাটা মন্দ নয়।

এদিকে হীরার আকস্মিক আবির্ভাবে লছমীর প্রথমটায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। শিবলালের শালী সম্বোধনে মেয়েটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

—তু হাস্‌তি হ্যায় ছোড়ি ? হীরা ভ্রূকুটি করে।

—কিয়া বোলে—। লছমী কথা শেষ না করিয়াই আবার হাসে।

—বোলে তো কিয়া—? ম্যয় উ বে-শরমকি শাড়ওআইন বন্‌ গিয়া! হীরা কৃত্রিম ভৎর্সনার পর সরস স্বরে বলে, 'লালাজীনে তো তেরি দিল বিগাড়তা হ্যায়—আগর হাম শাড়ওআইন না ব্যনে তো ব্যনে কিয়া ?'

হীরা এবার নিজেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

হাসি থামিলে বাঁশিটা পরখ করিয়া দেখিতে দেখিতে হীরা তাহা নিজের ঠোঁটেই ঠেকায়। ফুঁ দেয়। একবার—দু'বার—কয়েকবারই। মোটা, মিহি, ভোঁতা, ভাঙ্গা কয়েকটি স্বর ওঠে আর মিলায়।

হীরা আবার হাসে।

অনেক দিন পরে লছমী হীরাকে হাসিতে দেখিয়া বেশ একটু অবাক হয়। বিশেষত শিবলালের সহিত নিরিবিলি বসিয়া বাঁশি শোনার অপরাধটা হীরা এমনভাবে উপেক্ষা করিবে, লছমী তাহা ভাবে নাই।

হীরা ফেরে।

—শাহর যাগি, লছমি ?

—শাহর ? ক'ব্‌ ?

—এতওয়ার রোজ।

—হ্যাঁ, য্যাও!

—যাগি তো বোল্‌ ; তালাও না পাও।

—তালাও।

হীরা হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।

—কিয়া ?

—তালাও!

হীরার মুখে আবার সেই ভাবান্তর। অন্ধকার ঘরে কেহ যেন হঠাৎ একটা বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছে।

মনে মনে হীরার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে : তালাও যখন তখন তো মিলিয়া গিয়াছে। পিটারকে সে নিশ্চয় সুস্থ দেখিতে পাইবে।

দেখা মিলিবে আর এক বাঁশরিওয়ালার। হীরা আর শূন্যমনে ফিরিয়া আসিবে না!

*

নদীই ; তবে পাহাড়ী। নাম, ঘাঘরী। বাংলায় যাহার অর্থ হইল ঘাঘরা।

ঘাঘরাই বটে। বিশাল পাহাড়টার ঠিক কোন্‌খান হইতে নদীটা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ দেখে নাই, জানেও না। তবে অনেক নিচে—একটি পাহাড়ী ঝরনাকে ধারাস্রোতে ধনী হইয়া লীলাচঞ্চলা হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার পর ক্রমশই ঘাঘরী রূপ বদলাইয়াছে। যতই নিচে নামিয়াছে, ততই তাহার প্রস্থবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, আঁকাবাঁকা গতিটাও হইয়াছে দ্রুত। পাহাড়টাকে বেড় দিয়া ঘাঘরা শেষ অবধি কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়াছে।

নদী হইলেও গ্রীষ্মকালে ঘাঘরীকে চেনা যায় না। সমস্ত নদীটাকে মনে হয় বালুশয্যা। যত দূর দৃষ্টি যায়—বালির একটানা একটা আঁকাবাঁকা সর্পিল গতি ; উজ্জ্বল। তবে একেবারে নিঃস্ব হইলে এখানকার জীবগুলিকে মরিতে হইত। ঘাঘরী তাই একেবারে নিঃস্ব নয়। শীর্ণ একটা জলধারা প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে ; কোথাও কোথাও বা জল একটু বেশি।

পদ্ম প্রথমটায় আপত্তি করিয়াছিল। বলিয়াছিল, মরা নদীতে মরতে-যাবো নাকি ? না বাপু, তার চেয়ে এখানেই ভালো।

—এখানে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড কই ? আপনার ওই জাফরিকরা-কাঠ দিয়ে ঢাকা বারান্দা—আর লাউ-কুমড়োর বাগানে ফটো তোলা। আমি ওতে নেই। বাজে ছবি হবে, তারপরে আমায় দুষ্‌বেন। অমর আপত্তি তুলিয়াছিল।

—গরীবের এই ভালো।

—ফটোগ্রাফারের কাছে এটা খুবই মন্দ না কি হেমন্তদা—আপনিই বলুন।

—তা ঠিক। হেমন্তবাবু আলনা হইতে কোট নামাইয়া পদ্মর দিকে তাকান, যেখানে যা মানায়। আমি যদি এখন এই রেলের গলাবন্ধ কোটটা গায়ে চড়িয়ে টিনের চেয়ার টেনে বারান্দায় বসি—ঠিক মানাবে।

হেমন্তবাবু হাসেন। অমরও।

—নদীতেই বা কি আহা মরি রূপ আছে ! শুধু বালি আর বালি। অমর ও হেমন্তবাবুর হাতে চায়ের কাপ বাড়াইয়া দিয়া পদ্ম ঠোঁট উল্টায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া অমর বলে, 'ওটি বলবেন না। ঘাঘরীর যদি রূপ না থাকে, তা হ'লে আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই।' অমর এমনভাবে কথাটা বলে যে, সকলে একসাথে হাসিয়া উঠে।

হাসি থামিলে অমর আবার বলে, নদীর নামটি বড় মিষ্টি। রূপ মিলিয়ে, স্বভাব মিলিয়ে এমন নাম কে রেখেছিলো, জানি না। যেই রাখুক, লোকটা কবি ছিল। জানেন, হেমন্তদা, আমাদের দেশের এই নদী পাহাড়গুলোর নাম বেশির ভাগই এমনি সুন্দর। এই যে ঘাঘরী, কি মন্দ নাম। যেন কোমর থেকে ঘাঘরার মতই পাকে পাকে পাহাড়ের পা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

হেমন্তবাবু গোঁফ মুছিতে মুছিতে হাসেন, 'মেয়ে সুন্দর হ'লে তার ঘাঘ্‌রাটাও যে সুন্দর দেখাবে, তাতে আর সন্দেহ কি।'

অমর সশব্দে হাসিয়া উঠে, পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করে।

—লাখ কথার এক কথা বলেছেন। পাহাড়টাই সুন্দর, তাই নদীটাও সুন্দর। নদীতে বালি থাকতে পারে কিন্তু নদীর পাড় সেই— 'কানন-কণ্ঠলগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা'।

হেমন্তবাবু উঠেন। কোটটা আর গায়ে দেন না, হাতেই রাখেন। বলেন, 'আমি চলি; ক'দিন থাকবো না। অফিসের কয়েকটা কাগজপত্র ঠিক করে রাখি গে যাই।' পদ্মকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলেন, 'তুমি তো বহুকাল বাড়ির বাইরে বের হও না। যাও না—একটু বেড়িয়েই এসো নদীর ধার থেকে।'

—অতো রাস্তা মেয়ে ট্যাঁকে করে যেতে পারবো না, বাপু।

—মেয়ে নিয়ে যাবে কেন? ওকে আমার কাছে পাঠিযে দিও। স্টেশনে বেশ খেলা করে। হেমন্তবাবু চলিয়া যান।

অমর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলে—'যেতে হলে কিন্তু দেরি করলে চলবে না। রোদ একেবারে পড়ে গেলে ফটো তুলতে পারবো না। একটু তাড়াতাড়ি নিন।'

বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় অমর প্রশ্ন করিল, 'তখন হেমন্তদা কয়েকদিন থাকবেন না বললেন। আপনারা কোথাও যাচ্ছেন নাকি?'

—আমি আবার কোথায় যাবো! যাওয়ার চাল্‌-চুলো কি আছে নাকি?

—তবে?

—উনি যাচ্ছেন; ভাগ্নিকে তার দিদিমার কাছে রেখে আসতে।

—এই গরমে এতোটা ট্রেন জার্নি করা! হেমন্তদা কিন্তু বেশ কাহিল হয়ে পড়বেন।

অমরের কথাটা যে নেহাতই কাব্য তাহা নয়। এই দুরন্ত গরমে ঘাঘরী

নদীর জলটুকু শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহার রূপটুকু সত্যই শুষ্ক হইয়া যায় নাই। গাছ-লতা-পাতা ঘেরা নদীর তীর। বাতাসে যত ধূলা উড়িয়া লু বহিয়া যায়—গাছের পাতায় ততই কাঁপন জাগে, অদ্ভুত একটানা একটা শব্দ সমস্ত জায়গাটায় ছড়াইয়া পড়ে। দূরে তাকাইলে মনে হয় সোনালী জমিতে সবুজ পাড় বসানো একটা শাড়ি কে যেন এলোমেলো ভাবে খুলিয়া রাখিয়া পর্বতে অদৃশ্য হইয়াছে।

সূর্যের তেজ অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। রোদ অপেক্ষা এখন ছায়ার আধিপত্যটাই বেশি।

অমর যেমন পারিল, যখন যাহা মনে ধরিল, সেইভাবে দাঁড় করাইয়া পদ্মর ছবি তুলিল। বালুচরে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা ভারি হয়। শেষ পর্যন্ত দুজনাই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

—আর পারিনে, পা গেলো। চলুন ফিরি। পদ্ম পথে বসিয়া পড়ে।

—এরই মধ্যে বাড়ি ফিরবেন!

—বাড়ি না ফিরলেও আর রোদে বোদে নয়। চলুন খানিকক্ষণ ছায়ায় বসে জিরিয়ে নি।

—তাই চলুন। আপনাদের কোয়ার্টার তো কাছেই, বিশ মিনিটের পথ; গেলেই হবে। একটু সন্ধ্যে হোক।

বিকালের ছায়া নামিয়া বালুচর ছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। ওপারে দূর বনান্তরাল শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বটা এতক্ষণে গভীর কালো রেখায় অন্ধকারে মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে—ঠিক যেন জলরঙ্ চড়ানো একটি নিসর্গ চিত্র। অস্পষ্ট অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ রহস্য ভাণ্ডার। ওপার হইতে কয়েকটি বক বাতাসে বুক ভাসাইয়া উড়িয়া আসিতেছে।

এপারে তটের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পদ্ম দাঁড়ায়।

—কী সুন্দর ভিজে বালি!

সিক্ত বালুতটে পা ডুবাইয়া পদ্ম একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া পড়ে।

—খুঁড়লে জল উঠবে, জানেন! পদ্ম মুখ তোলে।

—নাকি? জানতুম না তো।

—ওমা! আচ্ছা, দেখুন! পদ্ম অনেকটা জায়গা জুড়িয়া গোল করিয়া

বালি খোঁড়ে। তারপর হাত গুটাইয়া সমান্তরাল ভাবে হাঁটুর উপর রাখে—মুখ গুঁজিয়া একদৃষ্টে গর্তটার দিকে তাকাইয়া থাকে।

অমরও বালির উপর বসিয়া পড়ে।

গর্তটার মধ্যে ধীরে ধীরে জল জমিয়া উঠিতে শুরু করে।

—বা, বেশ তো!

—এখানে অনেকেই এই ভাবে জল বের করে কলসী ভরে, হাত পা ধোয়।

জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া অমর বলে, খুব ঠাণ্ডা। দাঁড়ান, আমিও একটা খুঁড়ি। অমর বালি খুঁড়িতে বসে। পদ্ম দেখে।

—আমারটায় তেমন জল হ'লো না। জল ছিটাইতে ছিটাইতে অমর কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে।

—কোথা থেকে আর হবে? কেমন মানুষ দেখতে হবে তো! যে ডাবে জল নেই, শুধুই শাঁস—সেই ডাব কুড়ুল দিয়ে কাটলেও যে একরত্তি জল পাওয়া যায় না, তা জানেন তো! পদ্ম হাসিতে থাকে। হাসিটা যেন ইঙ্গিতপূর্ণ।

—তাই নাকি! কি করে জানলেন মানুষটা আমি পাথর? অমরও পরিহাস করে।

—দেখলাম তো।

—জল হ'লো না—তাই।

পদ্ম এবার মাথা ঝাঁকাইয়া বলে, 'সত্যি-ই তাই। জানেন না, এদেশের লোকেরা কিন্তু এটা বিশ্বাস করে।'

—কি, এই বালি খুঁড়ে জল বের করা?

—হ্যাঁ। বালি খুঁড়লে যার গর্ত যতো জলে ভরবে তার নাকি ততোই মায়া-মমতা। শুনেছি, এ দেশের লোকে বিয়ের আগে ছেলে মেয়ে দু'জনাকে দিয়েই বালি খোঁড়ায়!

—আজব ব্যাপার! যেমন দেশ তার তেমনি কাণ্ড। অমর জোরে হাসিতে থাকে, 'শুকনো বালিতে গিয়ে খুঁড়ুক না, দেখি কেমন জল বেরোয়?'

—শুকনো বালিতে যাবে কেন?

অমর পদ্মর মুখের ঈষৎ হাসি মাখানো অথচ অন্যমনস্ক, ক্লান্ত ভাবটি লক্ষ্য করিতে করিতে কি যেন ভাবে।

'তা হ'লে আমি? আমার কি হবে—! আমার প্রাণে যে রস কষ কিছুই নেই—দেখছি।' অমর অসহায়ের ভঙ্গি করে।

পদ্ম বালির মধ্যে পা ডুবাইয়া দিয়া আনমনে বালিব ঘর গড়িতে থাকে। মৃদু অস্পষ্ট স্বরে হঠাৎ বলে, 'মুখের হাসিখুশীই কি প্রাণ?'

সমস্ত ব্যাপারটা নেহাতই পরিহাস ভাবিয়া অমর এতক্ষণ পদ্মর কোনো কথাতেই তেমন মনোযোগ দেয় নাই। অর্থাৎ যতটা মনোযোগ দিলে একটা কথার নিগূঢ়তম তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়, ততটা মনোযোগ সে দেয় নাই। কিন্তু পদ্মর শেষ কথাটা তাহার কানে বাজে। গলার স্বরটাও কানে পরিহাসের মত শুনাইল না, বরং মনে হইল পদ্মর গলায় বিশেষ একটা ইঙ্গিত আছে। অমর আবার ঘাড় ফিরাইয়া পদ্মকে দেখিতে থাকে। শ্রান্ত, শুষ্ক, থমথমে মুখ। দেখিযা সহজে কিছু বোঝা যায় না।

এক মুঠা বালি তুলিয়া অমর পদ্মর বালিরঘরের ওপর ছুঁড়িয়া মারে। আচমকাই।

—ওকি, ঘর আমার ভেঙ্গে যাবে যে!

—যাক্। বালির ঘব ভেঙ্গেই যায।

অমরেব গলার স্বরটাও হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ম্লান অথচ কেমন যেন রুক্ষ। পদ্মও তাকাইয়াছে। এক লহমা দুজনা দুজনাব চোখে চোখ রাখিয়া চুপ করিয়া থাকে।

পদ্ম চোখ নামাইযা মৃদুস্ববে বলে, 'আমার ঘর ভাঙ্গলে আপনার কি সুখ?'

—দুঃখই বা কিসেব! যে-ঘর ববাববের জন্য নয়, যা টিঁকবেনা, তা থাকলেই বা কি, ভাঙ্গলেই বা কি?

পদ্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়।

আবার একটা খাপছাড়া নিস্তব্ধতা। এবার যেন এই নীরবতার মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি এবং বেদনা জমিয়া উঠিতেছে। কেহ কোন কথা বলে না বটে কিন্তু মনে মনে ভাবনার পাখা মেলিয়া দেয়।

অবশেষে পদ্মই উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, চলুন।

অমর তবু ওঠে না। অলস ভঙ্গিতে দূরে চোখ মেলিয়া বসিয়া থাকে।

খানিকটা অপেক্ষা করিয়া পদ্ম বলে, 'হলো কি আপনার? উঠুন—' অল্পক্ষণ পূর্বের সেই গম্ভীর এবং থমথমে ভাবটা যেন পদ্ম কাটাইয়া উঠিয়াছে।

—কি হবে উঠে, বেশ তো আছি।

—তা বই কি? আপনার না হয় ঘর-সংসার বলে কিছু নেই। তা বলে কি সকলের! একরাশ কাজ পড়ে আছে না আমার!

—তবে যান। একাই যান আপনি। অত্যন্ত নিস্পৃহ স্বরে কথাটা বলিয়া অমর টান হইয়া বালির উপর শুইয়া পড়ে।

—শুনলেন যে উঠুন—। পদ্ম খোঁপাটা ঠিক করিয়া লইতে থাকে। 'আসবার সময় কি একা এসেছিলুম যে ফেরার সময় একলা ফিরবো।'

অমর তবু ওঠে না। আরও একটু অপেক্ষা করিয়া পদ্ম এবার অমরের হাত ধরিয়া টান দেয়। অমর তবু নিশ্চল। শেষ পর্যন্ত টানাটানি। পদ্ম প্রাণপণ শক্তিতে অমরকে টানিয়া উঠাইবার চেষ্টা করে আর অমর কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রবল আকর্ষণের ফাঁকে পদ্মর হাতের মুঠি শিথিল হয়। কয়েক পা পিছাইয়া পদ্ম অত্যন্ত বেকায়দায় বালির উপর ছিটকাইয়া পড়ে।

অমর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে।

পদ্মও উঠিয়া বসিয়াছে। চুলে, গলায়, মুখে, বালি ঢুকিয়া একাকার। মুখের একপাশ আর কাঁধটা তো বালিতে বালিময়।

পদ্মর অবস্থা দেখিয়া অমর হো হো করিয়া হাসিতে থাকে।

আঁচল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে পদ্ম নিজেও হাসে।

—দেখুন তো, কি করলেন?

—তাই তো, আমি করলুম! আপনি গেলেন গায়ের জোর ফলাতে আর—

—থাক, থাক। এখন একটু জল না পেলে অন্ধ হয়ে যাবো। পদ্ম দু হাতে চোখ রগড়ায়।

—দিন, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি!

অমর পদ্মর চোখের বালি পরিষ্কার করিতে আগাইয়া আসে।

তবু জল চাই। জল ছাড়া পদ্মর চলিবে না। বালি তো শুধু নয়—পদ্মকে চোখের জল দিয়াই মনের কালি ধুইয়া ফেলিতে হইবে। আর সর্বাঙ্গ ভিজা বালিতে মাখামাখি হইয়া যে অসহনীয় অস্বস্তি তাহাও মুছিয়া না ফেলা পর্যন্ত তাহার স্বস্তি নাই।

একটু আগাইয়া গেলেই জল—একেবারে পাড়ের কাছেই। দুজনাই

আগাইয়া যায়। পাহাড়ী নদীর ধারা। এইখানটায় আবার কালো কালো অজস্র পাথর আর নুড়ি। কাছেই বটগাছের একটা পত্রপূর্ণশাখা বাঁকা ধনুকের মত জলের উপর নামিয়া আসিয়াছে। একটা অংশ তার জলমগ্ন। সমস্ত জায়গাটা জল, পাথর, ছায়া আর শাখায় অপূর্ব একটা স্নিগ্ধতা দিয়া ভরা।

অমর জুতা খুলিয়া সরাসরি জলে নামে। হাঁটু অবধিও জল নাই। সামান্য একটু স্রোতের টান আছে। পরমানন্দে অমর সেই জলই পান করে, মুখ হাত ধোয়।

গাছের আড়ালে আর পাতার ছায়ায় দাঁড়াইয়া পদ্ম সন্তর্পণে তাকায়। এখান হইতে অমরকে দেখা যায় না। নির্জন পত্রকুঞ্জে দাঁড়াইয়া পদ্ম নিজেকে শোভন করিতে বসে। আঁজলা ভরিয়া জল তোলে। মুখ, চোখ, ঘাড় হইতে বালির শেষ অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত ধুইয়া ফেলে। বুকে—পিঠে পর্যন্ত বালি ঢুকিয়াছে।

পাথরের উপর চুপচাপ বসিয়া অমর ভাবে ; এই যে শুষ্কপ্রায় নদীর একটি শীর্ণ ধারা নুড়ি ও পাথরের সান্নিধ্যকে আজও ভুলিতে পারে নাই, বটগাছের অবনত শাখাটির যেটুকু নাগালে পাইয়াছে বুকে জড়াইয়া নীরবে সোহাগ জানাইতেছে ; ইহার জলের ছোট ছোট দু'একটি বৃত্ত, কিছু খড়কুটা—সোহাগের ভাগ পাইবার জন্য যাহারা জড় হইয়াছে—ইহারা সকলেই যেন তাহার মনের বিশেষ একটি চিন্তার দৃশ্যরূপ। পদ্মর প্রাণপ্রবাহ ঠিক অমনই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—তবু নিঃশেষ হয় নাই—এখনো হেমন্তবাবুর যে-অংশটুকু পাওয়া যায় তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পদ্ম সোহাগ জানায়। তাঁহার সেবা, সংসারের দায়-আদায়—এ সবই তো তাই। আর অমর যেন ওই খড়কুটা—ভাসিয়া আসিয়া সোহাগে ভাগ জুটাইতে বসিয়াছে।

পত্রান্তরাল হইতে পদ্ম বাহির হইয়া আসে।

অমর কালো বড় একটা পাথরের উপর বসিয়া অন্যদিকে তাকাইয়াছিল। কাছে আসিয়া পদ্ম একবার আকাশের দিকে তাকায় ; তারপর অমরের মুখে দৃষ্টি রাখিয়া মৃদু স্বরে বলে, 'চলুন—সন্ধ্যে হয়ে এল।'

নীরবে কতকটা সময় বহিয়া যায়। অমর কোনো জবাব দেয় না কথার। পদ্মর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। আকাশের গায় যে সোনা-গলা রঙ্ লাগিয়াছিল

সে-রঙও সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মুছিয়া আসিল। অমর পাথর ছাড়িয়া নীচে নামে। '

পদ্ম ও অমর ফিরিয়া চলিয়াছে। পাশাপাশি ; গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া।

—আমি তো নিজের জায়গায় ফিরে চললাম—শীঘ্রি-ই! অমর বলে।

—মানে?

—কলকাতায়।

—হঠাৎ?

—তা একটু হঠাতই। আর বেশি দিন এখানে থাকতে সাহস হয় না।

পদ্ম প্রথমে কিছুই বলে না। মনে মনে কি ভাবে, পরে বলে, 'আপনি যে ভীতু এ কথা কি নতুন করে জানতে হবে?'

—ভীতু কি না বলতে পারি না, তবে আমি দুর্বল। এ আমি নিজেই জানি। তাইতো পালিয়ে যেতে চাই। অমরের গলায় আবেগ।

পদ্ম চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন থামিয়া যায়। বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা দুরুদুরু। চোখের সামনে আবছা অন্ধকার যেন গাঢ় একটা কুয়াশার মতন সবকিছু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

—পালিয়ে যেতে চান? পদ্মর কণ্ঠস্বরে চাপা আশ্চর্য এক উত্তেজনা।

—কি জানি! কিন্তু এ-ছাড়া তো পথ নেই।

—নেই?

—না।

হাঁটিতে হাঁটিতে দু-জনাই রেল লাইনের উপর উঠিয়া আসে। স্লিপারে পা ফেলিয়া আগাইয়া চলে। সাইডিং-এর ক্রসিং, ক্ষুদে হোম সিগন্যালের আলো। ওই তো বাড়ি ; স্টেশন।

পদ্মর হঠাৎ যেন খেয়াল হয় সব ফুরাইয়া আসিতেছে।

আচমকা অমরের হাতটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া পদ্ম বলে, 'কাল আসবেন একবার? কা-ল।'

—আসবো।

সামনেই কোয়ার্টার। কথাও যে ফুরাইয়াছে।

পদ্ম যেন হঠাৎ জোর করিয়া ঠেলিয়া অমরকে লাইন হইতে নামাইয়া দেয়। তারপর হন হন করিয়া সোজা কোয়ার্টারের দিকে আগাইয়া চলে।

অমর বিমূঢ়, বোবা হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। কাল? কাল বিকালের গাড়িতেই না হেমন্তবাবু চলিয়া যাইবেন!

ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াও অবশেষে আবার অমরকে লাইনের উপর উঠিতে হয়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ী পথ ভাঙ্গিয়া তাহাকে ফিরিতে হইবে। বাতি চাই—লোক চাই। হেমন্তবাবুর কাছে স্টেশনে যাইতে হইবে। তিনি পোর্টার ও বাতি দিয়া দিবেন। দরকার পড়িলেই দেন।

অমর স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়।

পদ্ম দ্রুত পদক্ষেপে সোজা গিয়া কোয়ার্টারের পাচিলের আড়ালে অদৃশ্য হইল।

অমর ভাবে, কই পদ্ম একবারও তো ফিরিয়া তাকাইল না!

ছোটকিমাতলার দিনগুলি বনলতার আর সহ্য হইতেছে না। এই অসহ্য ভাবটা অনেক কষ্টে প্রায় একটা মাস কোন রকমে যেন নিজের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল। এখন সহ্যাতীত হইতে চলিয়াছে।

সেদিন সামান্য কথায় মনের এই জ্বালাটা বনলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সূর্যশংকর যথারীতি সকালে খাদে চলিয়া গিয়াছে। অমর একটু বেলায় উঠিয়া যখন চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিল তখন বনলতার স্নান সারা হইয়াছে। সুশ্রী সুন্দর দেহটা বেশ সতেজ। মাথার চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়ানো। গায়ে একটা ফিকে রঙের সরুপাড় শাড়ি।

অমরকে চা ঢালিয়া দিয়া নিজের কাপটায় দুধ মিশাইতেছে, আচমকা অমরের কথাটা কানে যায়। 'তোমার চোখ দুটো অত লালচে কেন বনোদি?'

প্রশ্নটা বড় আকস্মিক। বনলতা নিজের চোখ দেখিতে পায় না, কিন্তু অমরের চোখের দিকে তাকাইয়া তাহার বিস্ময়টা বুঝিতে পারে।

—কি জানি। বনলতার অন্যমনস্ক জবাব।

—ঠাণ্ডা লাগিয়েছ নাকি? যা সকালে স্নান করো তুমি, তাও আবার কুয়ার জল। অমর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়।

—সকালে আমি বরাবরই স্নান করি। বনলতা মৃদু স্বরে বলে।

অল্প একটু নীরব থাকিয়া অমর বলে, 'কাল রাত্রে অনেকক্ষণ তুমি জেগেছিলে, না?'

বনলতা সে-কথার কোন জবাব দেয় না। নীরবে চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ঠেকাইয়া রাখে।

একটু অপেক্ষা করিয়া অমর আবার বলে, 'এমন ভাল জায়গা, তবু তোমার শরীরটা তো দিন দিন শুকিয়ে আসছে দেখছি। এখানের গরমটা ঠিক ধাতস্থ করতে পারছ না বোধ হয়। কি বলো বনোদি?'

প্রশ্নটা অমর সহাস্য মুখে সাধারণ ভাবেই করিয়াছিল। কিন্তু বনলতা এই সাধারণ কথাটার জবাব সহজভাবে দিল না। 'ঠিকই বলেছ তুমি। এখানকার বুনো হাওয়া আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

বনলতার গলার স্বরে যে তিক্ততা, মুখের ভাবে যে বিরক্তি এবং ব্যঙ্গ— অমরের চোখে তাহার অর্থটা অবোধ্য নয়।

জবাব অবশ্য অমর সঙ্গে সঙ্গেই দিতে পারিত। হয়ত সে জবাবটা রূঢ় হইত, কিন্তু অযোগ্য হইত না। তথাপি অমর কিছু বলে না। আর এক পেয়ালা চা নিজের হাতেই ঢালিয়া ফেলে। বেশ আস্তে আস্তে একটা বিস্কুট চিবোয়। তারিফ করিয়া নতুন চায়ের পেয়ালাটা অর্ধেক শেষ করে। সিগারেট ধরায়। বনলতাকে এই সময়ের মধ্যে কয়েকবার বেশ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্যও করিয়াছে।

এতোটা নীরবতার পর অমর এবার আস্তে আস্তে বলে, 'এখানে তোমার পোষাবে না—এটা যদি বুঝতেই পেরে থাক তবে আর এখানের মায়া বাড়িয়ে লাভ কি ? আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলুম ফিরে যাওয়ার কথা।'

বনলতা নীরব। কোনো দিকেই তার লক্ষ্য নাই। নীচু মুখে সাদা টেবল-ক্লথটার শূন্যতাটাই যেন অনুভব করিতেছে।

মনে মনে অজস্র কথার একটা ঢেউ যেন চেতনার ওপর বিশৃঙ্খলভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অতীতের কয়েকটা বিক্ষিপ্ত দৃশ্য এবং কথা মনে পড়ে, বর্তমানেরও। সব যেন মনের চিন্তায় দ্রুত বুনন তুলিয়া কোনও একটা নক্শা তৈরি করিতে গিয়াও পারে না। যেন মাকুর সুতা কাটিয়া সবটাই গোলমাল হইয়া যায়।

বনলতার বুকটা টনটন করিতেছিল। অসহ একটা ভার। গলার কাছে বাতাস একটু একটু করিয়া কঠিন হইয়া আসিয়াছে। চোখে জ্বালা, কপালের শিরাও যেন রক্তের চাপে দপদপ করে।

অমরই শেষ পর্যন্ত আবার বলে, 'তুমি বলেছিলে একটা বোঝাপড়া করে ফেলবে তাড়াতাড়ি। অন্তত তোমার কথা থেকে আমার তাই মনে হয়েছিল। বোঝাপড়া কি তুমি করেছ বনোদি ?'

মাথা নাড়ে বনলতা। না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবং একটু বিরতির পর যেন মনের ঘোর কাটাইয়া সজ্ঞানে আসে। বলে, 'কার সঙ্গে বোঝাপড়া করব। আমি যে এখানে আছি এটুকুও তো বোধ নেই ওর। সমস্ত ব্যাপারটা ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে এড়িয়ে যেতে চায়, যেন খেয়াল করছে না, করবার কিছু নেই বলে।' বনলতা চাপা গলায় বলে। বেদনা এবং ক্ষোভটা খুব স্পষ্ট।

—সূর্যদা কি ইচ্ছে করে তোমায় উপেক্ষা করে চলেছে ?

—হ্যাঁ। তুমি কি আমায় এতোটা বোকা ভাবো অমর যে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। না কি তোমার সূর্যদা এমন একজন মানুষ যে, বাড়িতে কে

আছে না আছে, কে মরল বাঁচল তার খেয়াল করে না! সব বুঝে, সব জেনে তবু ওর এই ঔদাসীন্য। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

অমর চিন্তিতভাবে সিগারেটে টান দেয়, আর বনলতার আহত বিক্ষুব্ধ বেদনাম্লান মুখটারও আড়াল পড়া কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করে।

—এ-ভাবে মুখ বুজে দু'পক্ষের যুদ্ধ কিন্তু ভাল নয় বনোদি আর বোঝাই তো যাচ্ছে, সূর্যদা যা পারবে তুমি তা পারবে না। তার চেয়ে সরাসরি স্পষ্ট করে তোমাদের এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেল।

অমরের উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন এখন আর ছিল না। কাল সারারাত বনলতা নিজের ঘরে অন্ধকার আর নির্জনতার মধ্যে যতটা ছটফট করিয়াছে এতোটা বোধ হয় আর কোনদিন করে নাই। নিজেকে, নিজের মনকে বিচার করিতে বনলতা বাকি রাখে নাই। একটা সঙ্কল্পও সে স্থির করিয়া লইযাছে।

পরিণাম সম্পর্কে তাহার আব কোনো চিন্তা নাই। কত স্বামীই তো স্ত্রী ত্যাগ করে—তা বলিয়া কি তাহাদেব জীবন কাটে না। অবশ্য এখানে একটা কিন্তু আছে। বনলতাই একদিন সূর্যশংকরেব জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। সে-দিন ত্যাগটা ছিল তাহার পক্ষের। আর আজ সূর্যশংকরের।

সূর্যশংকর অবশ্য প্রথম দিনই বলিয়া দিয়াছে, তাহাদেব দুজনার মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক নাই। কথাটা প্রকাশ্যে অবশ্য ইহাই। কিন্তু মনে মনে সত্যই কি বনলতার সঙ্গে তাহার সম্পর্কটা শেষ হইয়া গিয়াছে। কই বনলতার তো সে-কথা মনে হয় না। স্বামীব সংসাব হইতে চলিয়া গিযাও বনলতার কি কোনোদিন বাস্তবিক মনে হইয়াছে সূর্যশংকর তাহার কেহ নয়, পথের মানুষ! না, বনলতা এ-ভাবে তাহার জীবনের একটি অতি সত্য এবং অনুভব-কাতব-সম্পর্ককে কোনোদিন মিথ্যা বলিতে পারে নাই। আজও পারে না। ভবিষ্যতেও হয়ত পারিবে না।

—আমাকে একটা কথা ঠিক করে বলবে বনোদি? অমব আচমকা শুধায়।

বনলতার চিন্তায় বাধা পড়ে। অমবের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলে, 'বলো'।

সামান্য ইতস্তত করিয়া অমর সরাসরি প্রশ্ন করে, 'তোমার মন কি এবার বদলেছে?'

কথাটা ছোট, শুনিতেও সহজ – কিন্তু বনলতা জানে অমর কত গভীর এবং জটিল একটা প্রশ্নের জবাব জানিতে চাহিয়াছে ; এই কথাটাই গত এক মাস ধরিয়া বনলতা কতভাবে ভাবিয়াছে, বিচার করিয়াছে, নিজের মনের ভাললাগা, মন্দলাগা সহন-অসহন বোধের সঙ্গে যাচাই করিয়াছে। এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি কাল রাত্রে সে করিয়া ফেলিয়াছে।

অমর বনলতার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকাইয়াছিল। সে দৃষ্টিতে অন্তহীন কৌতূহল।

—আমি ভেবে দেখেছি অমর। খুব ভাল করেই ভেবেছি। বনলতা পিরিচের আগায় চামচের মাথাটা অকারণে নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদু গলায় বলে, 'মন আমার আগে যা ছিল, আজও তাই। এতটুকু বদলায় নি।' একটু থামে বনলতা, আবার বলে, 'জীবনের বিশ বাইশটা বছর আমি যে সংসারে মানুষ ভাই, যে ভাবে মানুষ তাতে আমার জ্ঞানবুদ্ধি, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান, ভাল মন্দের বিচার নিজের মতন করে একটা রূপ নিয়েছে। আমার স্বভাবে তারা মিশে আছে। অন্য স্বভাবের মেয়ে হলে হয়ত সহ্য করতে পারত কিন্তু আমি পারব না। আমার স্বামী বোতল বোতল মদ খেয়ে ভাববে এটা কিছু নয়, কিচ্ছু না ; স্ত্রীলোক তার কাছে নীতির বেড়া হবে না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সে ভাববে আলাদা শৌখিনতা, ঘর সাজানো ব্যাপার— না, এ-সব সহ্য করতে তখনও পারি নি, আজও পারব না।'

বনলতা আবেগের মাথায় একটানা একটা কথা বলিয়া যেন হাঁপ ছাড়ে।

সমস্ত কথাটাই অমর বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছে। হ্যাঁ, শুনিয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য—বনলতার নয়, সূর্যশংকরের পক্ষ লইয়া যেন কয়েকটা কথা বলার জন্য তাহার ইচ্ছা জাগিতেছে। কেন ?

অমরের মনের মধ্যে কখন যেন চুপিসারে পদ্ম আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বনলতার কথার অর্থ আছে, যুক্তি আছে—তবু যেন মনে হয় যুক্তি আর অর্থই পৃথিবীর সব নয়। মানুষের মন, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ—এসব যুক্তির আর অর্থের বাহিরের জগতের জিনিস।

বলি বলি করিয়াও অমর কিছু বলিতে পারে না। বনলতার মুখের ওপর হইতে নিজের চোখ দুটি সরাইয়া হেঁট মুখে বসিয়া থাকে। সিগারেটের আগুন দিয়া আঙুলের নোখে ছেঁকা দিবার অযথা একটা চেষ্টাও যে কেন করে কে জানে।

দিন দুই পরের কথা।

বিকালের দিকে বনলতা বাংলো ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। একা। অনেকটা পথ অন্যমনস্কভাবে আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন খেয়াল হয় বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। তাড়াতাড়ি ফিরিতে থাকে।

উর্ধ্বশ্বাসে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির কাছে আসিয়া হাঁপ ফেলে। গেটের কাছে আসিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই একটু দূরে গাছপালার আড়াল হইতে যে লোকটি বাহির হইয়া আসে বনলতা তাহাকে দেখিবার আশা করে নাই। অলস পদক্ষেপে সূর্যশংকর আগাইয়া আসিতেছে।

—তুমি কি সোজা-পথ ধরে আসছো? সূর্যশংকর কাছে আসিলে বনলতা শুধায়।

—হ্যাঁ। কেন?

বনলতা যেন বেশ একটু অবাক। আঁচল দিয়া আলতো ভাবে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলে, —'আমিও তো এই পথে এলুম।'

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে বারান্দায় উঠিয়া আসে। ঢাকা বারান্দা হইতে বেতের চেয়ার টানিয়া সূর্যশংকর খোলায় বসে। বাহাদুরকে ডাকে। বনলতাও খোলা চাতালটায় একটা চেয়ার টানিয়া লইয়াছে।

—কি কাণ্ড! আমি ভয় পেয়ে পড়িমরি করে ছুটছি—

—দেখলাম তাই। কি হয়েছিলো তোমার?

—কি আবার! বেড়াতে বেড়াতে কখন যে সেই পাথর ভর্তি বাঁকটার কাছে এগিয়ে এসেছি জানিই না। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ শুনে হুঁশ হলো। দেখি কেউ কোথাও নেই; বিকেলও প্রায় শেষ হয় হয়। কেমন যেন ভীষণ ভয় হলো।

—আমি তো তখন—

—শোনোই না। বনলতা বাধা দিয়া বলিয়া চলে, 'এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, দেখি কি, পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক উঁকি মারছে। তাই দেখে এক মুহূর্ত আর না দাঁড়িয়ে সোজা ছুটছি—। বনলতা কথার শেষে নিশ্চিন্তের একটা শ্বাস ফেলে।

—এতে ভয় পাবার কি ছিলো?

—ছিলো না! কি বলো তুমি। পাহাড়ী জায়গা; বিদেশ-বিভুঁই,

তার ওপর নির্জন, নিস্তব্ধ ; বিকেলও নেই—অতটা পথ এগিয়ে গিয়েছি একা। বাকি কথাটা আর শেষ করে না বনলতা, আলতো ভাবে আবার শাড়ির আঁচলে কপালটা মোছে। যেন সমস্ত ভয়টুকু এতোক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে সে মুছিয়া ফেলে।

—পাথরের আড়ালে আমিই ছিলুম।

—তুমি ?

—হ্যাঁ, দিব্যি সাইকেলে ফিরছি—একটু বোধ হয় বেহুঁশ ছিলাম, পাথরের বাঁকের কাছে এসে সাইকেলটা পাথরে লেগে স্লিপ্ করে গেলো। টাল খেয়ে ঢালুতে গড়িয়ে পড়লুম। উঠে দেখি, সাইকেলেব হ্যাণ্ডেল গেছে বেঁকে, টায়ার ফেটেছে। ভাবছি, কি করি, কাউকে দেখতে পেলে সাইকেলটা তার হাতে গছিয়ে দেওযা যেত—তখনই বোধ হয় আমায় তুমি দেখেছো!

—কি আশ্চর্য, দেখলে আমায তো ডাকলে না কেন তুমি ? বনলতা তেমনি অবাক স্বরেই বলে।

—কি করে ডাকবো। আমি তো ঢালুব নীচে, পাথরের আড়ালে—সাইকেল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। ওপরে উঠে এসে যখন দেখলুম তোমায়, তখন তো প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি ছুটছো। তবু তোমার সঙ্গ নেবার জন্যে অনেকটা ছুটেছি।

—খুব করেছো। তুমি আসছো সঙ্গী হবার জন্যে আর আমি ভাবছি কেউ আমার পিছু নিয়েছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি—। বনলতা যেন নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ জানায়। 'দোষটা কিন্তু তোমারই।'

সূর্যশংকর মৃদু হাসে। বলে, 'কেন ? তোমারও তো হতে পারে। যার ভয়ে তুমি ছুটে পালাচ্ছো তাকে অন্তত একবার চোখ চেয়ে দেখবে না ?'

সূর্যশংকরের মুখে অর্থপূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শেষের কথাটায় হাসিটা আরও স্পষ্ট, আরও অনাবৃত হয়। বনলতা যে সূর্যশংকরের তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাগুলির অর্থ সবটাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে—তাহার মুখ দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

কথাটা যে ইঙ্গিতপূর্ণ বনলতা অবশ্য তাহা বুঝিতে পারে। মুখে সে কিছুই বলে না। মনে মনে ভাবে।

সাহেবের ডাক বাহাদুর অনেকক্ষণই শুনিতে পাইয়াছিল।

চা ও বৈকালিক জলখাবারের প্লেট গুছাইয়া লইয়া বাহাদুর এবার হাজির হয়। সাদা ধবধবে টেবল-ক্লথ পাতা গোল বেতের টেবল সামনে রাখিয়া বাহাদুর চায়ের পাত্র সাজাইয়া দেয়।

—এতো কি দিলি রে? সূর্যশংকর বলে, 'আমি একটু পরেই যে জঙ্গল যাবো। রাতের খাওয়া সেরেই বেরুবো। জিনিসপত্র সাজিয়ে দিবি। বুঝলি?'

বাহাদুর যে বাংলা বুঝিতে না পারে এমন নয়। বুঝিতে সে অনেক কথাই পারে কিন্তু দুইচারিটি কথা ছাড়া বেচারী বেশি কিছু বলিতে পারে না। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদকে নিজের জিহ্বার মধ্যে আয়ত্ত করিতে গিয়া প্রায়ই সে ফ্যাসাদ বাঁধায়। আজও বাহাদুর সাহেবের সামনে বাংলা বলিবার লোভ সামলাইতে পারে না। বনলতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বাহাদুর সাহেবকে বলে, 'মায়জী আপনা হাতে দোখানা হোয়েছে সাব, আওর ম্যায় তো এক্।'

বাহাদুরের কথা শেষ হয় না—সূর্যশংকর সজোরে হাসিয়া ওঠে। বাহাদুর ভ্যাবাচাকা খাইয়া চুপ করিয়া যায়।

—মাজী আপনা হাতে দু'খানা হয়েছে কিরে! সর্বনাশ! মাজী তো সামনেই বসে। বেটা, গর্দভ! বল্, নিজের হাতে দুরকম খাবার তৈরী করেছে। সূর্যশংকর হাসিতে থাকে। বাহাদুর বেজায় লজ্জা পাইয়া অপ্রস্তুত মুখে পালায়। হাসি থামাইয়া সূর্যশংকর বনলতাকে বলে, 'বেটা পালালো। তোমায় কমপ্লিমেণ্ট দেবার এতো লজ্জা আগে জানলে ও নিশ্চয় তোমার হাতে-তৈরী খাবারগুলো বয়ে নিয়ে আসতো না। অবশ্য গর্ব করা উচিত নয় আমারও। আমিও একেবারে বেয়াদপ হিন্দী বলি।'

—তুমি যেন কী। ওকে অমন অপ্রস্তুত করলে কেন! মোটামুটি ঠিকই তো বলেছিল। বনলতা কাপে চা ঢালিতে থাকে।

প্লেট হইতে মাংসের সিঙ্গাড়াটা মুখে পুরিয়া সূর্যশংকর বলে, 'কোনটা ঠিক ওর মনের বক্তব্য না মুখের ব্যাকরণ।'

—দুই-ই।

—বুঝলাম না।

—খুব কঠিন তো নয় কথাটা তবু না বুঝবে কেন?

সূর্যশংকর আরও একটা সিঙ্গাড়া মুখে দেয়। একদৃষ্টে বনলতার দিকে খানিকটা তাকায় তারপর সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে। গোধূলির আভায়

সামনের লতাকুঞ্জে হাল্কা সোনার রঙ ধরিয়াছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছটি লালে লাল। এক জোড়া চন্দনা আসিয়া বসিয়াছে। কোথা হইতে ইহারা উড়িয়া আসিয়াছে কে জানে। পাশাপাশি বসিয়া ঠোঁট ঠোকাঠুকি করে, পাখা ঠোকরায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘন হয়; আবার একে অপরের কাছ হইতে সরিয়া যায়।

বনলতা চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুক ঠেলিয়া বাতাসে মিশিয়া যায় তখন বনলতার চমক ভাঙ্গে। দেখে, সূর্যশংকর একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি উদাসী নিরপেক্ষ কোনো এক দর্শকের দৃষ্টি নয়—তাহারও অপেক্ষা কিছু বেশি। একটা মানুষ যেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া কাহারও অন্তর উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে।

বিষণ্ণ হাসি হাসে, বনলতা। বলে, 'অমন করে দেখলেই কি সব জানতে পারবে?'

—না। কিন্তু জানলেই ভালো হত।

—কেন, কৌতূহল মিটতো!

সূর্যশংকর চায়ের পাত্র নিঃশেষ করিয়া সিগারেট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলে, 'নিজেকে তুমি দু'খ না করলে কেন? তার দায় আমার নয় কিন্তু তবু আমায় তুমি দায়ী করছো।'

—তোমায় দায়ী করবো কেন? বনলতা আরও বিষণ্ণস্বরে বলে, 'এ আমার দোষ। আমার ভাগ্য। তুমি তো সেই কবেই চলে এসেছিলে। চাও না বলেই না। তবু আমি সহজ কথাটা বুঝলাম না। এখানে এসে এ ক'দিন থেকে, তোমায় দেখে ধীরে ধীরে যেন সবই বুঝতে পারছি।'

অল্প একটু নীরবতা। বনলতা সন্ধ্যার অস্ফুট অন্ধকারে নিজের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সবটুকুই যেন ডুবাইয়া দিয়া বলে, 'আর এ টানা-পোড়েন ভালো লাগে না। তোমার বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারলে স্বস্তি পেতাম। মনে হয় তোমার মনের কথা আমি বুঝি নি। অকপটে যদি ব্যক্ত করতে তোমার মন, আমার পরম লাভ হত।

—তা কি করিনি?

—না। আমার সম্পর্কে বিরাগ, বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছ, কিন্তু সোজাসুজি তোমার মনের কথা প্রকাশ করো নি।

—না কি? তা বেশ, কি জানতে চাও বলো? সূর্যশংকর চেয়ারটা একটু সরাইয়া লইয়া পা টান করিয়া বসে।

বনলতা নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে একটু যেন সময় লয়। মনে মনে আজ সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, অনেকদিনের বহু অনিশ্চিত চিন্তা, বহু প্রত্যাশার প্রকৃত স্বরূপ আজ সে সরল, সহজ, যথার্থ ভাবেই জানিয়া লইবে। এ অন্তর্দ্বন্দ্বে লাভ কি? মিথ্যা মায়াডোরে মনকে অহেতুক বাঁধিয়া যতটুকু সান্ত্বনা তাহার অপেক্ষা যে ঢের বেশি দুঃখ। সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাসো না; ভালোবাসিতে চাও না? আমিই কেবল ভিখারীর মত দাও দাও করি। তোমার ওপর আমাব অধিকারটা যেমন একতরফা, প্রার্থনাটাও তেমনি এখন এক পক্ষের। জানি তোমার প্রত্যাখ্যান আমার পক্ষে চরম দুঃখের, পরম লজ্জার। কিন্তু তবু মনে মনে এতোকাল বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি আমায় ভালোবাসো। এতোদিন তোমার এতো অবহেলা সত্বেও নিজেকে সর্বদিক দিয়া নিঃস্ব ভাবিতে পারি নাই। আশা করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি। মানুষ মরিতে বসিয়াও যেমন জীবনের আশা করে তেমনি। কিন্তু ভালোবাসা তো ভিক্ষা নয়, অবহেলা আর অবজ্ঞা নয়। শুধু এক পক্ষের আত্মসমর্পণ নয়। তাই এ বোঝাপড়া—এই প্রশ্ন।

—যা জানতে চাইবো আজ অকপটে তার জবাব দিয়ো। বনলতা একটু দৃঢ় স্বরে বলে।

—সজ্ঞানত যতোটা অকপটে বলা সম্ভব অবশ্যই বলবো।

—আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?

—পরিচিত আর পাঁচ জনের মত নয়; তার চেয়ে নিশ্চয় কিছু স্বতন্ত্র।

—আমার ভালো-মন্দের কথা ভাবো?

—ভাবতে চাই না, তবু অনিচ্ছেয় মাঝে মাঝে ভেবে ফেলি।

—ভাবোই যদি তবে এ-অবস্থায় আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো কেন? কি আছে আর আমার, কে আছে? কোথায় যাবো? আপদে বিপদে কে পাশে এসে দাঁড়াবে, কাকে পাবো বলতে পারো? আর আমার ভালো-মন্দ বলতে এ-সবই তো বুঝোয়। বনলতা মনের আবেগ বহুকষ্টে কিছুটা সম্বরণ করিয়া কথাগুলি শেষ করে।

সূর্যশংকর যেন মনোযোগের সঙ্গেই কথাগুলি শোনে। চিন্তিতই মনে হয়।

—আমার ভালোর জন্যে কি তুমি করলে?

—যা আমি করতে পারি, আমার পক্ষে সম্ভব।

—আশ্রয় না দেওয়া, গ্রহণ না করা—শুধু এই বুঝি তোমার পক্ষে সম্ভব?

—তা-হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে আর কি সম্ভব হতে পারে। সূর্যশংকর আর একটা সিগারেট ধরায়। অন্ধকারে তাহার মুখ প্রায় দেখাই যায় না—শুধু সিগারেটের লাল স্ফুলিঙ্গটাই চোখে পড়ে। একটু নীরব থাকিয়া সূর্যশংকর বলে, 'অকপটে আরও কটা কথা বলি, শোনো। তোমার কি আছে, কোথায় যাবে, পাশে কাকে পাবে—এ সমস্ত কথা আজ আর আমায় জিজ্ঞেস করে লাভ কি।

খানিক দূরে একটা বাতি দেখা যায়; লণ্ঠনের আলো। অন্ধকারের মধ্যে তালে তালে দুলিতেছে।

সূর্যশংকর ও বনলতা উভয়েই সেই আলোর দিকে তাকাইয়া থাকে। আলো হাতে যাহারা আসিতেছে বনলতা তাহাদের জানে। অমর আর স্টেশনের কোন কুলী নিশ্চয়। আজকাল রোজই এই ভাবে অমর রাত্রে বাসায় ফেরে। সেদিন তো রাত্রে ফিরলই না। আর কিছুক্ষণ পরেই, অমরের আবির্ভাবে, বনলতার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাটা যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সে যেন আরও অসহ্য। কি যেন তবু বাকি থাকিয়া যায়। কিসের একটা প্রশ্ন, শূন্যতা। আর বুঝি সময় হইবে না, সুযোগ জুটিবে না। বনলতা কেমন যেন অজ্ঞান-আবেগের বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিয়া বসে, 'আমি তোমার স্ত্রী। আমার পাশে তুমি থাকবে না?'

সূর্যশংকর বনলতার অসহায়তার তীব্রতাটা বুঝি অনুভব করিতে পারে। বলে, 'তেমন ভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীতে সবাই একা। পাশে কাউকে পাওয়া যায় না। হয় অন্ধের মত আগের লোকের লাঠি ধরতে হয়, না হয় পিছনের লোকের হাত।'

—তুমি? তুমি কি কিছুতেই আমাদের সম্পর্ক মানবে না? অসহ্য আকূতি, বিহ্বল বেদনায় বনলতা যেন শেষবারের মত প্রশ্ন করে।

—না, আমি তোমার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো না। পারলে আগেই পারতাম।

বনলতা আর কোনো কথা বলে না। অন্ধকারেই সূর্যশংকরের মুখ হইতে দৃষ্টিটা অপসারিত করিয়া আকাশের পানে তাকায়। কালো একটা মেঘ দ্রুতগতিতে তারাগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে।

গেট হইতে পোর্টারকে বিদায় দিয়া অমর বারান্দায় উঠিয়া আসে।

—কোথায় গিয়েছিলে? সূর্যশংকর প্রশ্ন করে।

—স্টেশন।

—ওখানে বুঝি মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে খুব আড্ডা জমিয়েছো?

সহজ সরল প্রশ্ন, তবু অমরের বুকটা হঠাৎ ধক্ করিয়া ওঠে। অন্ধকারে অমরের মুখ দেখা সম্ভব নয়, নতুবা চোখে পড়িত সূর্যশংকরের সরল প্রশ্নেই অমরের মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

—এই একটু রেডিয়ো টেড়িয়ে আসি। অমরের জবাবটা বড় মৃদু। হয়তো কথা ঘুরাইবার জন্যই বনলতাকে সম্বোধন করিয়া আবার বলে, 'বড় তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো, বনোদি।

বনলতা উঠিয় যায়। অমর বনলতার শূন্য চেয়ারে বসিয়া পড়ে।

—জঙ্গল যাবে নাকি? সূর্যশংকর প্রশ্ন করে হঠাৎ।

—কবে?

—আজ, একটু পরে।

—এই রাত্রে?

—হ্যাঁ। যাবে তো চলো। তুমি তো একদিন রাত্রে জঙ্গলের রূপ দেখতে চেয়েছিলে।

— বেশ, চলো।

বনলতা জল লইয়া ফিরিয়া আসে। এক চুমুকে জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া অমর পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বনলতাকে বলে, 'তুমিও চলো না, বনোদি? জঙ্গল বেড়িয়ে আসবে। রাতের অরণ্য; অদ্ভুত।'

—তুমিও যাচ্ছো নাকি? বনলতা অন্যমনস্ক ভাবে অমরকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ; যাবে তুমি, চলো না?

—যাও, তোমরা যাও। বনলতা বারান্দা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

রাত বাড়ে।

দোনলা বন্দুক, কার্টিজ, বেতের বাস্কেটে তোয়ালে জড়ানো দু'বোতল মদ, এককুঁজা জল, সামান্য কিছু খাবার জিপ গাড়িতে তুলিয়া দিয়া বাহাদুর সূর্যশংকরকে জানায়, সমস্ত প্রস্তুত।

ছ'সেলের টর্চটা তুলিয়া লইয়া সূর্যশংকর ঘরের বাহিরে আসে। পাশে অমর। উভয়ে অরণ্যবিহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল।

বনলতা তাহার ঘরে খোলা জানলার কাছে বসিয়াছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারকে আলোয় ও তীব্র গর্জনে বিক্ষুব্ধ করিয়া জিপগাড়িটা গেট হইতে বাহির হইয়া যায়।

বনলতা বাহিরের অন্ধকারে চোখ মেলিয়া পাথরের মতন বসিয়া থাকে।

উচিত-অনুচিতের কোনোকালেই বাঁধা-ধরা কোনো সংজ্ঞা নাই। একজনের কাছে যাহা উচিত, অন্যের কাছে তাহা অনুচিত। অতো বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার একতরফা জয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঔচিত্যবোধের নিদর্শন নাই। মানুষ তাহার স্বার্থের তাগিদে অনেক উচিতকে অনুচিত করে। আবার কতো যে অনুচিত উচিত হইয়া ওঠে তাহার হিসাব মেলা ভার।

পদ্ম অনেক ভাবিয়াছে। ভাবিয়া কূল পাওয়া যাওয়া না—এমন একটা ভাবনাই সে ভাবিয়াছে ; তাই ভাবিয়াও কোনো কূল পায় নাই। অমরের কাছে অমন করিয়া নিজের ব্যর্থতা প্রকাশ করা তাহার উচিত হয় নাই।

পদ্ম ভাবে—অমর বোধ হয় সবই বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে স্বামী, সংসার, সমাজ, সব কিছু থাকা সত্ত্বেও পদ্ম স্বৈরিণী। যে পরিবেশের মধ্যে পদ্ম আছে তাহার প্রতি ওর কোন মোহ নাই—মায়াও নয়। পরিবেশটা পদ্মর কাছে লৌকিক, বাহ্যিক। আসলে পদ্মর কিছুই নাই। না প্রেম, না পবিত্রতা।

প্রেম, পবিত্রতা!

কিসের প্রেম, কেনই বা পবিত্রতা? —পদ্মর ঠোঁটের আগায় বাঁকা হাসি ফুটিয়া ওঠে। প্রেম বলিয়া, পবিত্রতা বলিয়া জগতে কিছু নাই। এ শুধু ফাঁকা বুলি। এ জগতে প্রেম বলিয়া সত্যই যদি কিছু থাকিত, পদ্ম এমন করিয়া পাঁকে পড়িয়া থাকিত না।

চিন্ময়দাকে পদ্মর মনে পড়ে। পদ্মদের মফস্বল শহরের একচ্ছত্র যুবরাজ। মোটা খদ্দরের পায়জামা আর শার্ট পরিয়া হাতে কালো চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া চিন্ময় সমস্ত শহরটা টহল দিয়া বেড়াইত। সর্বত্র তাহার অবাধ গতি, অব্যাহত আত্মপ্রসার। চিন্ময়দার অনেক ভক্ত। ছেলেরা ভক্তির ঠেলায় চিন্ময়কে ঠেলিয়া স্বর্গে তুলিয়াছিল। তাহার মুখের কথায় হাতবোমা ছোঁড়া হইতে শুরু করিয়া কেরানী পিতার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চুরি করা টাকায় দেশসেবার তহবিল ভারী করিতেও তাহারা পিছপা হয় নাই। মেয়েমহলে চিন্ময় সেন আকাশপ্রদীপের মতই চোখ আর মনের বিস্ময় যোগাইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। নিজেকে ধরা দেয় নাই। যেদিন হাওয়ার টাল সামলাইতে না পারিয়া চিন্ময়রূপ আকাশপ্রদীপেও আগুন লাগিল, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া

উঠিল—সেদিন ছেঁড়াখোঁড়া দগ্ধ দেহটা লইয়া পদ্মর কোলেই ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল।

ছেলের দল ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চিন্ময়কে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। পুলিশ হইতে পাঁচ—পাঁচটা ওয়ারেন্ট।

পদ্মর আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে—সেদিনের নাটকীয় পরিস্থিতির নায়ক-নায়িকারা অভিনয় কেমন জমাইয়া তুলিয়াছিল।

রাত তখন বোধ হয় বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড শীতের ঠেলায় মফস্বল শহরের অমন যাত্রার আসরটাও জমে নাই। পদ্ম যাত্রা দেখিতে গিয়াছিল—ভালো না লাগিলেও বসিয়াছিল। হঠাৎ ছোট একটি ছেলে আসিয়া কানে কানে জানায়—বাহিরে কে একজন তাহাকে একটু ডাকিতেছে। নাম বলিল চন্দন।

চন্দন—? বাচ্চা ছেলেটির সঙ্গে পদ্ম তৎক্ষণাৎ মেয়েদের আসর হইতে বাহির হইয়া আসে। চায়ের দোকানের সামনেই চাদরে মাথা মাথা কান মুড়িয়া একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল। গালময় দাড়ি। ছেলেটি আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল।

পদ্ম ভালো করিয়া লোকটিকে দেখিবার আগেই সে দ্রুতপায়ে আগাইয়া আসে। কাছাকাছি আসিয়া চাপা গলায় বলে,—'আমি চিন্ময়। এখানে নয়,—একটু ওধারে চলো। লোকের চোখে পড়তে চাই না।'

অন্ধকারে আসিয়া চিন্ময় একটু স্বস্তি পায়।

—অনেক কষ্টে লুকিয়ে এসেছি। তোমার কথাই মনে পড়ছিলো আজ ক'দিন ধরে। আমায় একটু আশ্রয় দেবে?

চিন্ময়ের গলায় কখনো আবেদন অনুরোধের সুর বাজিতে পারে পদ্ম ভাবে নাই। তাহার মিনতিভেজা কণ্ঠস্বরে পদ্ম অবাক মানিল।

—সকলেই আমার বিপক্ষে। শত্রুর অভাব নেই। কয়েকটা দিন আমায় তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো, পদ্ম! তুমি ছাড়া আজ আপনার বলতে আমার কেউ নেই।

চিন্ময় তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়াছিল। পদ্মর সাধ্য ছিলো না—সে-হাত ছাড়ায়।

পদ্ম চিন্ময়কে লুকাইয়া নিজের ঘরে আনিয়া তোলে।

প্রৌঢ়, অন্ধ পিতাকে লইয়া পদ্মর সংসার। সদানন্দবাবু সদানন্দই। মাটির

মানুষ। অসম্ভব ভালো লোক। কাজে কাজেই চিন্ময়কে নিজেদের বাড়িতে লুকাইয়া রাখিতে পদ্মর খুব অসুবিধা হয় নাই।

পদ্মদের বাড়িতে মাত্র দুখানি ঘর। একটি সদানন্দবাবুর, অপরটি পদ্মর। সদানন্দবাবুর চিন্ময়কে ঘরে রাত কাটাইতে দিতে পদ্মর সাহস হয় নাই। চিন্ময়ও তাহাতে বাধা দিয়াছিল। চিন্ময়ের আত্মগোপনের খবরটা ভালমানুষ সদানন্দবাবুও কিভাবে গ্রহণ করিবেন—তাহা আন্দাজ করা সম্ভব হয় নাই। চিন্ময় বারবার অনুরোধ করিয়াছে, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করিলে তাহার ভাগ্যে জেলের দরজা পুরাপুরি খুলিয়া যাইবে।

পদ্মও তখন কি যে ভাবিয়াছিল, কে জানে—। চিন্ময় তাহার মনে দাগ কাটিয়াছিল অনেকদিন আগেই। সে-দাগ তেমন গভীর নয়। হয়তো চিন্ময় দুর্লভ বলিয়াই পদ্ম তেমন করিয়া কোনদিনই তাহাকে মনের গভীরে টানিয়া লইতে পারে নাই। সুযোগটা হঠাৎ আসিল। অস্পষ্ট একটা স্বপ্ন দিনের আলোতেও যখন বাস্তবরূপ লইয়া দেখা দিল—পদ্ম তখন নিজেকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। আর চিন্ময়—? চিন্ময় দিনে কতোবার করিয়া যে ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত করুণ বেসুরো সুর তুলিয়া পদ্মর সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছে, স্তুতিবাদে তাহার মন গলাইয়াছে—তাহার হিসাব হয় না। চিন্ময়ই পদ্মকে রাত্রের অন্ধকারে বিদ্রোহের দার্শনিকতায় মুগ্ধ করিয়াছে। মনে মনে বিবাহ করার প্রেরণাও যোগাইয়াছে।…পরবর্তী ঘটনার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। রাত্রিবাসের উত্তপ্ত উত্তেজনা একদিন ফিকা হইয়া আসে। সদানন্দবাবু হয়তো জানিতে পারিয়াছিলেন। দূরদেশে ঘর গড়িবার প্রলোভন দেখাইয়া চিন্ময় পদ্মর যৎসামান্য গহনাগুলি লইয়া রাত্রিশেষের অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

চিন্ময় আর ফেরে না।

হাজার লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও কথাটা প্রকাশ হইয়া যায়। কানাকানি, চোখ টেপাটেপি হইতে শুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত টিটকারি এবং গালিগালাজ চলিতে থাকে। পুলিশ আসিয়া পদ্মকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

সদানন্দবাবু বহুদিনের বাসস্থান তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। দু-একটা ভালো সম্বন্ধ পদ্মর জুটিয়াছিল। বিবাহ হয় নাই। চিন্ময় সংক্রান্ত গোপন খবরটা উড়ো-চিঠিতে কে যেন পাত্রপক্ষকে জানাইয়া

দিয়াছিল। পদ্মর ভাগ্যে বিপত্নীক হেমন্তবাবুই কেমন করিয়া না জানি জুটিয়া গেল।

চিন্ময়ের আঘাত দিবার শক্তি যতই তীব্র হোক না কেন, সে আঘাত সহ্য করিয়া লওয়ার ক্ষমতা পদ্মর ছিল। বেশির ভাগ মানুষেরই থাকে। সহ্যশক্তিটা মানুষের বাঁচিবার তাগিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঁচিবার বাসনা যাহার যত বেশি সহ্য করিবার শক্তিও তাহার তত অধিক।

পদ্ম বোকা নয়। চিন্ময়-পর্ব তাহার জীবনের আদি হইলেও অন্ত-পর্ব যে হইতে পারে না, সহজভাবেই পদ্ম সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। জীবন বলিতে যে যাই বুঝুক, পদ্ম বুঝিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকার সুখ, সুবিধা, স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখাই জীবন। পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়—ইত্যাদি আভিধানিক শব্দগুলির অর্থ ধরিয়া জীবনের বিচার চলে না। বিচার করিতে যাওয়ার মত মূর্খতাও আর নাই। স্রোত-রুদ্ধ হইয়া স্রোতস্বিনী শুকায়—মন-রুদ্ধ হইলে মানুষ মরে। মৃত্যু জীবন নয়, মৃত্যুমুক্তিই জীবন। এ জীবন তাই আকাশের মতই বিশাল, উদার। তাহার বুকে কতো ঝড় ওঠে; কতো বৃষ্টি, রোদ, কতো অস্পষ্ট ছায়াপথ, বহ্নিদীপ্ত ধূমকেতু দেখা দেয় আর মিলায়। কে তাহাকে মনে রাখে? বৈশাখের ঝড় শ্রাবণে হারাইয়া যায়, শ্রাবণের অশ্রু শরতের সলাজ হাসিতে মুছিয়া যায়। সব ভুলিয়াই আকাশ বাঁচিয়া থাকে।

পদ্ম তাহার জীবন হইতে ঝড় ঝাপ্টার দাগগুলি মুছিয়া ফেলিয়া আকাশের মতই বাঁচিয়া থাকিবে।

বাঁচিয়া থাকার জন্য একটা অবলম্বন দরকার।

হেমন্তবাবু পদ্মর অবলম্বন। পেটের অন্ন, মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, দেহ আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র, রোগ হইলে ঔষধ—এক কথায় বাঁচিয়া থাকার জন্য যাহা প্রয়োজন হেমন্তবাবু সবই যোগান। আর যোগান বলিয়াই তো তিনি পদ্মর অবলম্বন।

তবু পদ্ম ঠিক যেন বাঁচিয়া নাই। বরং বলা ভালো, বাঁচিয়া থাকার যে পরিপূর্ণ সুখ, সে সুখের সহিত তাহার পরিচয় নাই। কেনো যে—পদ্ম স্পষ্ট ভাবেই তাহা অনুভব করিতে পারে। এমন একটা অভাব তাহার—যে অভাবের তীব্রতাটা শুধু নিজেই অনুভব করা যায়—কাহাকেও বোঝানো চলে না। আজ দীর্ঘ চার পাঁচ বছর ধরিয়া পদ্ম সেই অভাবের জ্বালায় তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করিতেছে।

হেমন্তবাবু প্রথম প্রথম অতোটা বুঝিতে পারেন নাই। ক্রমশই পদ্মর অব্যক্ত অভিযোগ যে কি তাহা জানিতে পারিলেন। বুঝিলেন—চল্লিশোত্তর বয়সে তাঁহার মত ভগ্নস্বাস্থ্য ভদ্রলোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে—যে গাছ মূল সমেত কাটা হইয়া গিয়াছে, যাহার আর চারা নাই হেমন্তবাবু সে গাছের শাখায় একটি সবুজ পাতাও যে আর দেখিবেন এ আশা কি করিয়া করেন!

তবু—।

পদ্ম একদিন হাতে নাতে ধরিয়া ফেলে।

—ছাই পাঁশ ওসব কী মাথামুণ্ডু গেলো!

এক গ্লাস জল সমেত একটি কবিরাজী বটিকা গলাধঃকরণ করিয়া হেমন্তবাবু লজ্জায় প্রায় অসাড় হইয়া পড়েন।

—শুনি ওষুধটা নাকি ভালো! আমতা আমতা করিয়া জবাব দেন হেমন্তবাবু।

—আমার মাথার পিণ্ডি। ভালো—! কতো তোমার ভালো ওষুধই তো খেলে। কোন উপকারটা পেলে বলতে পারো? উল্টে আরো পাঁচটা উপসর্গ নিয়ে ভুগছো।

হেমন্তবাবু চুপ করিয়া থাকেন, জবাব দেন না। জবাব দিবার কিই বা আছে! যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহা শুধরাইবার জন্যই তো এই সব ব্যর্থ চেষ্টা।

হেমন্তবাবুর মুখের দিকে তীব্র চোখে চাহিয়া পদ্ম স্পষ্ট আর খর গলায় বলে, আর যদি কোনোদিন তোমায় ওই মাথামুণ্ডু গিলতে দেখি ঠিক জেনো আমি গলায় দড়ি দেব।

হেমন্তবাবু ভয় পান। ভাবিয়া দেখেন, অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করার নেশায় মশগুল থাকা অর্থহীন। পদ্মও স্বস্তি পায়। যাহা হইবার নয় তাহার জন্য হেমন্তবাবুর একটানা আজেবাজে ওষুধ খাওয়া তাহার মোটেই পছন্দ হইত না। দিন দিন হেমন্তবাবু আরো ক'টা রোগ-উপসর্গ বাধাইয়া বসিতেছেন। শেষ পর্যন্ত বুকের রোগটা তাঁহার যেন আরো বাড়িয়া যায়। সপ্তাহখানেক শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভীষণ ভয় পাইয়াছিল পদ্ম। ক'দিন তো ভাবনায় তাহার চোখের পাতা এক হয় নাই।

মনে পড়ে রোগশয্যা হইতে উঠিয়া হেমন্তবাবু একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'একটা কথার জবাব দেবে ছোট বৌ, রাগ করবে না— ?'

—না গো, না। বলো তোমার কি কথা? পদ্ম দুধের গ্লাস আগাইয়া দিয়া বলিয়াছিল।

—অসুখের সময় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি মরে গিয়েছি। কারা যেন আমায় শ্মশানে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি তখন ওই বারান্দায় মাঝে বেতের মোড়ায় বসে। হেঁট হয়ে পায়ে আলতা পরছো। হঠাৎ চোখ তুলে তাকালে। দেখলে শ্মশানযাত্রীদের। কোনো কথাটি বললে না; শুধু ঘরের মধ্যে উঠে এসে ওদের মুখের ওপরই দরজা দিলে বন্ধ করে। হেমন্তবাবু থামিয়া গিয়াছিলেন।

—তারপর— ? পদ্ম প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন বাতাসের চাপে ভার হইয়া উঠিয়াছিল।

—তারপর আর কি, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি আমার মাথার পাশে মাথা এলিয়ে ঘুমোচ্ছো তুমি।

বুক ঠেলিয়া আসা দীর্ঘনিশ্বাসটা কোনোরকমে চাপা দিয়া পদ্ম প্রশ্ন করিয়াছিল। 'খুব স্বপ্ন তো! যাকগে— ; কই, কি জানতে চাও বললে না ?'

—আমি মরে গেলে তুমি কি করবে? হেমন্তবাবু পদ্মর চোখে চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন।

পদ্ম অদম্য বিস্ময়ে হেমন্তবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বোবা হইয়া গিয়াছিল। বেশ খানিকটা পরে উত্তর দিয়াছে, 'আমার তো আর কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত তোমার কাছেই গিয়ে হাজির হবো।'

পদ্মর উত্তর শুনিয়া হেমন্তবাবু পাথরের মতন নির্জীব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন। আর পদ্ম রান্নাঘরে আসিয়া গরম কড়াইয়ের হাতল দু'টা সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল। ফোস্কা পড়িয়া হাত দুটি তাহার জ্বালা করিতেছিল সত্যি, তবু সে জ্বালা পদ্মের মনের জ্বালার তুলনায় শতগুণ শীতল।

*

সুধাকর ফিরিয়া আসিয়াছে।

একরাশ কচি কাঁঠাল পাতা সংগ্রহ করিয়া গোঁসাইজী এইমাত্র বাড়ি ফিরিলেন।

ছায়ায় বসিয়া গামছা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে ডাক দেন। —কুসুম, ও কুসুম!

রান্নাঘর হইতে উঁকি দিয়া কুসুম জবাব দেয়—'আসি'।

পাখা হাতে কুসুম কাছে আসিলে গোঁসাইজী হাসিয়া বলেন —'শুনেছিস, সুধা ফিরেছে। পথে মতিলালের সঙ্গে দেখা। বললে, সুধা নাকি আর এ-বাড়ি আসবে না। ভিন্ন থাকবে।'

কুসুম নীরবে পাখার হাওয়া করিতে করিতে কথাগুলি শোনে। গোঁসাইজী আবার বলেন, —'ব্যাটার আমার গোঁ কি কম! আসলে কি জানিস, বাবুকে এখন একটু সাধ্যি-সাধনা করতে হবে, তবে তিনি বাড়ি আসবেন।'

কুসুম এবারেও কোনো জবাব দেয় না।

গোঁসাইজী কাঁঠাল পাতাগুলি ছিঁড়িয়া বাছিয়া এক পাশে রাখিতে থাকেন। একটু পরে আপন মনেই বলেন, —'এ দুপুরে আর নয়, বিকেলে যাবো ওদিকে।'

ও' দিকের অর্থ যে সুধাকরের খোঁজে কুসুম তাহা বুঝিতে পারে।

—আপনি কেন যাবেন? গরজ থাকলে নিজেই আসবে।

—হ্যাঁ, ওর গরজের জন্যে আমি বসে থাকবো। আ-আ—আয় হরিণী।

দাওয়ার একপাশে ছায়ায় হরিণী তাহার অলস দেহটা কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। কচি কাঁঠাল পাতার গন্ধে বোধ হয় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হরিণী চতুষ্পদ প্রাণী—; আহারের আয়োজনটা ধারণা করিয়া লইতে তাহার এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। গোঁসাইজীর কাছে আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। পরম স্নেহে হরিণীর গায়ে গলায় মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গোঁসাইজী তাহাকে কাঁঠাল পাতা খাওয়াইতে থাকেন।

—একটা অবোধ বোবা প্রাণী, সেও আদর করে ডাকলে কাছে আসে, আর মানুষ আসবে না! গোঁসাইজী আপন মনেই বলেন।

কুসুম কোন উত্তর দেয় না। মনে মনে বলে, আদর করে ছাগলকে ডাকা যায় কিন্তু যে, মানুষ পাগল তাকে কি আদর করে ডাকা যায় নাকি!

ডাকিতে হয় না; সুধাকর নিজেই আসে।

তখন দুপুর। লু বহিতেছে। একটানা সোঁ সোঁ একটা শব্দ। ঠাকুর-ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে গোঁসাইজী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে সুধাকর এ-ঘর ও-ঘর সব দেখিয়া লয়। কুসুমের ঘরে আসিয়া দরজা ঠেলে।

কুসুম ঘুমায় নাই, তন্দ্রা ও চিন্তার আবর্তে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে। গায়ের কাপড়টা ঠিক করিয়া লয়। ঘরে পা দিয়াই সুধাকর আবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়।

কুসুম তাকায়, সুধাকরও।

কুসুম উদ্বিগ্ন হয়। এই ক'দিনে সুধাকরের চোখ মুখের কী শ্রীই না হইয়াছে। মাথায় একগাদা রুক্ষ চুল, মুখময় দাড়ি; গাল বসিয়া গিয়াছে—গলার কণ্ঠা দেখা দিয়াছে, চোখের কোলে কালি, বেশভূষা নোংরা।

সুধাকর দেখে কুসুমের কালো মুখ তেমনই পুরন্ত। আগের মতই নিভাজ কণ্ঠ। এ ক'দিনের অবর্তমানে কুসুমের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুধাকর যদি চিরকালের জন্যও গৃহত্যাগ কবিত, তবু বোধ হয় কুসুমের পুরন্ত মুখ ও উঠন্ত বুকে কোথাও দাগ বসিত না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুধাকর ঘর দেখিতে থাকে। ঠিক আগের মতই—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নির্জন, নিস্তব্ধ।

—আমার বাক্সটা ক-ই? সুধাকর প্রশ্ন করে।

—চোখের ইঙ্গিতে বাক্সটা সুধাকরকে দেখাইয়া দেয়। মুখে বলে, 'খাওয়া হয় নি?'

—না। সুধাকর তাহার বাক্সটা টানিয়া বাহির করে।

—স্নানও করো নি নিশ্চয়।

—না। জ্বর হয়েছে।

কুসুমের চোখের পাতা কুঁচকাইয়া আসে। সুধাকরের দিকে আগাইয়া যায়; বলে, 'কই দেখি, গা দেখি'।

কুসুম হাত বাড়াইয়াছিল। সুধাকরের গায়ের উত্তাপ আর দেখা হইল না; তাহার কণ্ঠের উত্তাপেই কুসুম হাত নামাইয়া লইল।

—ওই শতরঞ্জিটা আমার, দাও—ওটা দাও; তোশক চাই না—চাদর দাও; দেশ থেকে যেটা এনেছিলাম—; আর বালিশ—। সুধাকর বিছানার দিকে চোখ রাখিয়া বলে।

—কি হবে বিছানা? কুসুম এবার সত্য সত্যই অবাক মানে।

—আমার চিতেয় লাগবে।

কুসুম স্তব্ধ। নিষ্পলক চোখে সুধাকরের উগ্র মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া ও ভাবে ; লোকটা কি বাস্তবিকই ক্ষেপিয়া গিয়াছে নাকি !

—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছো কেন ? কথাটা কি কানে ঢুকলো না ?

—যা নেবার তুমি নিজেই নাও। চাদর আমার বাক্সে। এই নাও চাবি—আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া কুসুম সুধাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দেয়।

সুধাকর হ্যাঁচ্‌কা টান মারিয়া শতরঞ্জি বাহির করে—পাতা বিছানা তালগোল পাকাইয়া কাত হইয়া থাকে। বালিশ উঠাইয়া মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া সুধাকর বাক্স খুলিতে বসে। চাদর বাহির করিতে গিয়া—প্রথমেই বাহির হয় একটা বাঁশের বাঁশি। বাঁশিটা ভালো করিয়া দেখিতে দেখিতে সুধাকর এক লহমার জন্য কুসুমের মুখের দিকে তাকায়। ক্রমেই তাহার চোখে-মুখে বিকৃত কুৎসিত হাসি ফুটিয়া ওঠে।

—কোন্ নাগরের ধন—অ্যাঁ—বলি এতো যত্ন কেন ?

কুসুম যেন পাথর। একটি কথাও তাহার মুখে নাই।

বাঁশিটা ফেলিয়া দিয়া সুধাকর চাদর বাহির করে। নিজের বিছানাটা গুটাইয়া লইতে লইতে সুধাকর বলে, 'তোমার ঠাকুরকে বলে দিও, আমি ভিন্ন থাকবো। আমার ভিন্ন পাত, ভিন্ন খাট। এ সংসারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই !'

তোরঙ্গটা টানিয়া সুধাকর হাতে ঝুলায় ; বিছানাটা বগলে। কুসুম পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুধাকরকেও বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হয়। কুসুম নীচু গলায় বলে, যাও কোথায় ?

—যমের বাড়ি। তুমি রূপের ধুচুনি নিয়ে কেলে কেষ্ট ঠাকুরের তপস্যা করো, আর আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরি। বয়েই গেছে আমার। ভিন্ন থাকবো, খাবো-দাবো, মেয়েমানুষ নিয়ে রাত কাটাবো—কিসের পরোয়া আমার। পুরুষ মানুষের আবার অভাব—

কুসুম পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়—সুধাকর যেমন ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়াছিল তেমনি হঠাৎই চলিয়া যায়।

দাওয়ায় আসিয়া কুসুম দেখে—প্রখর রৌদ্রের মাঝে ধূলাবালি-ওড়া পথ দিয়া সুধাকর হন্‌হন্ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কুসুম দেখে—আর বুকটা

ক্রমেই ভারি হইয়া উঠে। চোখের মণিতে জল জমিয়া দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিলে কুসুম চোখ ফিরাইয়া লয়।

সন্ধ্যা বেলায় গোঁসাইজী দাওয়ায় নিজের হাতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কুসুমকে কাছে ডাকেন।

কুসুম কাছে আসিলে গোঁসাইজী বলেন,—'বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

কুসুম বসে। গোঁসাইজী বলেন, 'সুধা এসেছিলো, কই তুই তো আমায় বলিস নি? মতিলালদের বাসায় গিয়ে শুনলাম, সুধা তার বাক্স-বিছানা নিয়ে গেছে।'

এ কথার কি উত্তর দিতে পারে কুসুম! সুধাকরের আকস্মিক আবির্ভাব ও অপসরণ এতোই গ্লানিময় যে, সে কথা গোঁসাইজীকে বলিতে তাহার বাধিয়াছে। পেটের একমাত্র সন্তানের ভিন্ন হইয়া যাইবার শাসানি পিতাকে শুনানো খুব শ্রুতিমধুর নয়! তাহা ছাড়া এই যে গণ্ডগোল—এই সবই তো কুসুমকে কেন্দ্র করিয়া। কুসুম না থাকিলে সুধাকর কি কখনো এমন করিতে পারিত, না ঐভাবে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পরিবার ও পরমপূজ্য দেবতাকেও গালি-গালাজ করিতে পারিত। যখন মানুষ নিজেকে কোনো এক বিপর্যয়ের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন তাহার পক্ষে নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি!

—কি, কথা বল্‌ছিস না যে—গোঁসাইজী আবার প্রশ্ন করেন।

—আপনার সাথে দেখা হয়েছে?

—না। বোধ হয় ইচ্ছে করেই দেখা করে নি। মতিলাল বললে, সুধার যা বলার তোকেই নাকি বলে গেছে।

—বলেছে। কুসুম সংক্ষিপ্ত জবাবে আলোচনাটা বন্ধ করিতে চায়।

—কি বলেছে রে?

কুসুম এবারও মুখ খুলিতে চায় না। গোঁসাইজী একটু অপেক্ষা করেন।

—লজ্জা পাস কেন? দ্বিধা করিস না—যা বলেছে আমায় বল্। মন পুড়িয়ে মুখ বুজে থাকা ভালো নয়। তাতে অশান্তি বাড়বে বৈ কমবে না।

—এ বাড়ির সঙ্গে ওর আর কোনো সম্বন্ধ নেই। কুসুম মাটিতে চোখ রাখিয়া মৃদু সুরে বলিতে থাকে, 'ভিন্ন থাকবে ও, ভিন্ন হাঁড়িতে খাবে। যাতে মন লাগে, তাই নিয়ে থাকবে।'

গোঁসাইজী মনোযোগ সহকারে প্রতিটি কথা শোনেন। চট্ করিয়া কোন জবাব দেন না, অন্ধকার শূন্যের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকেন।

—চৈতন্যমঙ্গল পড়েছিস, কুসুম! সহসা একসময় বলিয়া ওঠেন, 'পড়িস নি,—সুন্দর জিনিষ, অনেকদিন আগে তোর মাকে আমি চৈতন্যমঙ্গলের একটা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—আজ তোকেও বুঝিয়ে দি—

সম্পদ বিপদ যত সব কর্মফল।
আন গাছে নাহি লাগে আনের বাকল॥
এক তরু হৈতে ভিন ফল নাহি ধরে।
আন তরু আন ফল ধরিতে না পারে॥

কর্মফলের অনুরূপ ফলই সংসারে মানুষ পায়। কু-কর্ম সুফল হরণ করে, আবার সদ্-কর্ম সুফল উৎপন্ন করে। সম্পদ অর্থ এখানে বিত্ত নয়, কেন না, কু-কর্ম দ্বারাও মানুষ অনেক সময় সম্পদ আহরণ করতে পারে। সম্পদ অর্থে বুঝতে হবে সুসময়, বৈভব। বুঝলি কুসুম? এক গাছের বাকল যেমন অন্য গাছে লাগে না—পেয়ারা গাছের বাকল কি নিম গাছে লাগানো চলে—না, কাঁঠাল গাছে ফলে নিম ফল? যে গাছের যা ধর্ম—সেই গাছে সেই ফলবে। যা আমার স্বভাব, যেমনটি আমার কর্ম—ঠিক তেমনটি ফলই আমি পাবো। এর ব্যতিক্রম হয় না; হতে পারে না। গোঁসাইজীর ভাবাবেগ তীব্র নয়, শান্ত—সুমধুর! সামান্য বিরতি। আবার বলেন,

'হাঁটবো উত্তরদিকে মুখ করে, আর মনে মনে চাইবো দক্ষিণমুখো বাসা, তাই কি হয়? তোর মা—এ কথা বোঝে নি, অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি—কিছুতেই তার ভুল শুধরোতে পারি নি। সুধাকরকে আমি দোষ দিই না—। তোকেও বলি—কুসুম, এখনো সময় আছে, ভেবে দেখ।

কুসুম আর কত ভাবিবে! এতো দু' এক দিনের কথা নয়। আজ ক্রমাগত তিন বৎসর হইতে কুসুম এই একই কথা ভাবিয়া চলিয়াছে। তবু প্রথম প্রথম সুধাকর মোটেই এমন ছিল না—তখন তাহার ভয়-ডর ছিল; ঠাকুর-দেবতায় মান্যি ছিল; ছিল গোঁসাইজীর উপর অসীম শ্রদ্ধা। ঠাট্টা, তামাশা, মান, অভিমান—এই সবের মধ্য দিয়া তাহাদের দু'টি জীবন স্রোতের ফুলের মত একই সাথে পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। সুধাকর তাহার মাথার ঘোমটা খসাইয়াছে, চিবুক ধরিয়া সোহাগ জানাইয়াছে, কখনো কখনো রাত্রে

তাহার মুখে রসকলি আঁকিয়া দিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাকাইয়া বিবশ গলায় বলিয়াছে —'তুই কি সুন্দর রে, কুসুমি!' তাহার পর নীচু গলায় গান ধরিয়াছে— 'প্রেম ঢল ঢল ঈষৎ হাস, শ্যামমোহিনী সাজে রে। কুটিল কুন্তলে করবী রাজ, রতন জড়িত খোঁপার সাজ .....'

শ্যামমোহিনী—? ঠিক, তখন কুসুম শ্যামমোহিনীই ছিল বটে। কিন্তু তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল, সুধাকর বুঝিতে পারিল. নিজেকে বুভুক্ষু রাখিয়া তাহার মোহিনীকে শ্যামের নামে উৎসর্গ করা অর্থহীন। এ কি? কুসুম তাহার স্ত্রী—; তাহার জীবনসাথী—লীলাসঙ্গিনী, শয্যাভাগী। শ্যাম কে? কেনই বা এ বিড়ম্বনা! কুসুমের আঘ্রাণ, তাহার শোভা একা সুধাকরই উপভোগ করিবে। সেখানে শ্যাম মিথ্যা, শ্যাম বাধা, শ্যাম শত্রু।

সুধাকরের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে মৃত্তিকাব দাবী নামিয়া আসে। সুধাকর হাত বাড়ায়। কুসুম সে হাত ঠেলিয়া দেয়।

যে হাত অধিকার করার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেই কি বিপদ কাটে? যাহার হাত, সে সরে না—যে হাত সরাইয়া বাঁচিতে চায়, সে নিজেও সরে না।

তাই এতো উদ্বেগ, এতো অশ্রু, এতো ভাবনা!

গোঁসাইজী কি বলিতে চান? কুসুম কি আন গাছ—? শ্যাম বৃক্ষের বাকল কি তাহাতে লাগিবে না!

কুসুম সারা রাত ছটফট করে। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে: নীলকণ্ঠরূপী শ্যাম— —আর শ্যামের গলায় বেড় দিয়া একটা সাপ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে।

ঠাকুর, এ কি করলে! এ যে পাপ! আমায় বাঁচাও—!

কুসুমের চিবুক প্লাবিত করিয়া চোখের জলের ধারা বয়।

দহন দাহন শেষ হইয়া এবার বর্ষণ। দীর্ঘ দিন ধরিয়া আকাশটা সূর্যতপ্ত তামাটে হইয়াছিল।

শেষ পর্যন্ত উত্তাপ উষ্মা সবই যেন ধীরে ধীরে উপশম হয়। পর্বতমালার শীর্ষে শীর্ষে বাধা পাইয়া নিরন্তর মেঘ জমিতে থাকে, আকাশ রঙ বদলায়। কাজল-কালো মেঘের সমারোহ আর বিদ্যুত-উৎসব। আকাশ বাতাস গুরু-গম্ভীর মেঘস্বরে প্রতিধ্বনিত, প্রকম্পিত।

ক্লান্তিহীন বর্ষণের মধ্য দিয়া আর এক ঋতুর আবির্ভাব হয়। স্বভাবে এ ঋতু পৃথক ; সম্পদে স্বতন্ত্র।

বুঝি মানুষও এমনি। অন্তত যাহাদের লইয়া এই কাহিনী সেই মানুষ-গুলির মনের আকাশেও কেমন করিয়াই না রঙ বদল হইতে ছিল! একদিন যাহারা শুধু নিজস্ব জগতটুকু লইয়া পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল আজ তাহারা যেন আর সে জগতে নাই। ওই আকাশের মতই সম্পদে, স্বভাবে ইহারাও পরিবর্তিত হইতে বসিয়াছে!

কুসুম যখন শোনে ঘরছাড়া সুধাকর সত্যসত্যই মতিলালের সোনার আঙটি চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, দুই বন্ধুতে ভীষণ রকম একটা মারপিট হওয়ার পর সুধাকর শয্যাশায়ী তখন তাহার মনটা অসম্ভব খারাপ হইয়া যায়।

পরের আঙটি বেচে সোহাগীর খরচা যোগাতে যায়। শুনে অবধি ঘেন্নায় মরি। বলিস কি গো, বোস্টমের ছেলে ; অমন বাপ যার, তোর মত বউ যার—তার এই কীর্তি। দামিনী পানের পিচ ফেলিয়া মুখবিকৃত করে। একটু পরেই খাটো স্বরে বলে 'তা হ্যাঁরে কুসুম, শুনি তোর সোয়ামী না কি তার নিজের দোষে বেগড়ায় নি ?'

দামিনীর চোখে মুখে এমন একটা কুৎসিত হাসি ফুটিয়া ওঠে যে কুসুম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হয়। কুসুম বোঝে দামিনী অনেক কিছু জানে ; তাহাকে ঠেস দিয়া কথা বলার অনন্দটুকুও যেন তাই ভালো করিয়া পাইতে চায়।

কুসুম চুপ করিয়া থাকিলেও দামিনী থামে না।

—জানিনে বাপু সত্য-মিথ্যে; লোকে বলে। শুনি স্বামী তোর ভালো মানুষই ছিলো। এখন না হয় পেরথক্ হয়েছে। নেশা-ভাঙ করে, নষ্ট চরিত্তি মেয়ের হাতে খায়; খাটে শোয়।

দামিনী একটু থামে। কুসুমকে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলে, 'সংসারে টাকা পত্তর দেয় ?'

কুসুম এবারও কোনো জবাব দেয় না।

মেয়েটার রকম সকম দেখিতে দেখিতে দামিনীর গায়ে জ্বালা ধরে, অসম্ভব রাগ হয়। বাঁকা হাসি হাসিয়া বিদ্রূপ ভরে বলে, 'কালে কালে আর কতোই দেখতে হবে কে জানে, ভাই। ভাতার থাকলো পরের খাটে, আমি রাণী নিজের পাটে। তা বলি কুসুম, পুরুষ মানুষের আর দোষ কি ? তারও তো ইচ্ছেটিচ্ছে আছে। তোর না হয় কচি-কাচার সাধ-বাসনা নেই। ধম্মের কুলোয় সব তুলেছিস। ও মানুষটারও কি তা বলে কিছু থাকবে না ? বলে দেবতাবাই পারলো না। তো—'

দামিনীর কথায় বাঁধা দিয়া এবার কুসুম বলে, 'আছে কোথায় ?'

—কে জানে, শুনি সোহাগীর ভিটেয়।

কুসুম উঠিয়া পড়ে। বলে, 'উনুনটা ধরিয়ে দি, আকাশ কালো করে এলো ; আবার বুঝি জল নামবে।'

আকাশের দিকে তাকাইয়া দামিনীও উঠিয়া দাঁড়ায়। বৃষ্টি আসিবে। বলে, 'চলি ! শোন কুসুম, একটা কথা বলি তোকে। অসুখ বিসুখ থাকে তোর তো সতীন ঘরে তোল—হাজার হোক স্বামী, কথায় বলে পরমগুরু। এমন হেলা ফেলা করিস নে—'

দামিনী চলিয়া যায়।

কুসুমের মনে কাঁটাটা গভীর ভাবেই বিঁধিয়া থাকে। কারণে অকারণে বার বার তাহার যন্ত্রণাময় অনুভূতিটা প্রতি মুহূর্তে কুসুম উপলব্ধি করে। সুধাকরের জন্য কুসুম যত না উদ্বেগ অনুভব করে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী বিতৃষ্ণা।

মানুষটা কি ? লজ্জা, শরম, ভদ্রতা, ভালো মন্দ, কোনো জ্ঞানই কি নাই ? নেশা ভাঙ্ আর সোহাগীর আকর্ষণ এতোই যে পরের আঙটি চুরি করিয়া তাহার সোহাগ কিনিতে হইবে। ছি-ছি ! তাও আবার বন্ধুর জিনিস। বেশ হইয়াছে মার খাইয়াছে। পাপের ফল এমনি ভাবেই ভোগ

করিতে হয়। দামিনী প্রশ্ন করিতেছিল, সুধাকর সংসারে টাকা দেয় কি না? না, দেয় না। কোথা হইতে দিবে। নেশার খরচ যোগাইতে যাহাকে চুরি করিতে হয়, সে-লোক আবার সংসারে টাকা দিবে! অথচ আজ দু'মাস হইতে কুসুমদের সংসারে টানটানিটা প্রকট হইয়াছে। দু'টি লোকের দু'মুঠা ভাতের অভাব অবশ্য কোনদিন হয় নাই কিন্তু ভাত ছাড়াও তো অভাব আছে। সর্বাপেক্ষা কষ্ট হয় কুসুম যখন দেখে, ঠাকুরের নিত্য ভোগের থালায় একটু ছোলা ও গুড় ছাড়া এখন আর কিছুই জোটে না।

সংসারের সর্বপ্রকার অভাব অনাটনের কথা ভাবিলে হয়তো বহু দীনতাই চোখে পড়িবে। তবু জীবন ধারণের অতি তুচ্ছ সেই অভাবগুলি তাহাদের কাছে প্রধান হইয়া দেখা দেয় নাই; সমস্যা বলিয়াও মনে হয় নাই। সহজ ভাবেই তাহারা সব কিছু গ্রহণ করিয়াছে, সব অভাবই মনের সম্পদে পূর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু এ কি? এ যে দৈনন্দিন জীবনের ভাত-কাপড়ের অভাব নয়। সমস্যাটাও সে ধরনের স্থূল নয়।

যতই ভাবে কুসুমের মন সুধাকরের উপর ততই বিরূপ হইয়া ওঠে। মানুষটাকে অত্যন্ত হীন বলিয়াই তাহার মনে হয়।

দামিনী যাওয়ার পর এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। আকাশ জলশূন্য হয় নাই। এমন কি মেঘশূন্যও। সন্ধ্যার গোড়ায় আরও মেঘ জমিতে শুরু করে। সন্ধ্যার অন্ধকার ও আকাশের কালো মেঘের কালিমায় দিকদিগন্ত আঁধারে ডুবিয়া যায়। দূর পার্বত্য-অঞ্চল হইতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আসিতে থাকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ জুড়িয়া সমানে একটানা বিদ্যুৎ-লীলা।

গোঁসাইজী অখণ্ড মনোযোগে নিজের ঘরে বসিয়া কিসের একটা পুঁথি পড়িতেছেন। দেখিলেই মনে হয়, তমসাচ্ছন্ন কোন এক জগতের মাঝে সম্পূর্ণ ভাবেই তিনি হারাইয়া গিয়াছেন। এ বিশ্বচরাচর তাঁহার কাছে লুপ্ত, ত্যক্ত।

দেখিতে দেখিতে অঝোর ধারায় বাদল নামে।

কুসুম নিজের ঘরটিতে আশ্রয় লয়। অনুজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সামান্য যে কেরোসিন তেলটুকু অবশিষ্ট ছিল, কুসুম গোঁসাইজীর লণ্ঠনে তাহা ভরিয়া দিয়াছে। তাহার নিজের ঘরে আজকাল আর লণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না। রেড়ির তেলের এই প্রদীপেই বেশ চলিয়া যায়।

কপাট ভেজাইয়া দিয়া কুসুম সিক্ত বস্ত্রটা বদলাইয়া ফেলে। আনমনেই খোঁপাটা ঠিক করিয়া লয়। ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করে। জানালা দিয়া জল আসিতেছে কি না—দেখে ; এটা সেটা নাড়ে। একবার বিছানায় শোয়, আবার ওঠে।

মন তবু রাশ মানে না। সেই এক চিন্তা—একই অস্বস্তি। কী অসহ্য এই নিষ্পেষণ! কুসুমের ইচ্ছা হয়—দরজাটা হাট করিয়া খুলিয়া ওই বৃষ্টির মধ্যে বাহিরে চলিয়া যায়। একবার ভাবে, গোঁসাইজী কী এ কথা জানেন ? বোধ হয় জানেন না। কুসুম যাহা শুনিয়াছে তাঁহার কাছে গিয়া মুখ ফুটিয়া সব বলিয়া দিবে নাকি ? আবার ভাবে, গোঁসাইজীকে এ দুঃসংবাদ শুনাইয়া কি লাভ ?

কুসুম মেয়ে মানুষ। বাহিরের জগতটার সহিত তাহার পরিচয় আর কতটুকু! গোঁসাইজী তবু বাহিরে যান। তাঁহার কাছে লোকজন আসে। তিনি হয়তো সবই জানেন। কুসুমের কাছে কথাটা গোপন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু কেন ? কুসুম দুঃখ পাইবে বলিয়াই নাকি, না লজ্জায়। সন্তানের এ অপকীর্তির কথা বলিতে তাঁহার বুঝি বাঁধিয়াছে ! দুঃখ ! কুসুমের আর কিসের দুঃখ, কেই বা তাহার দুঃখ পাওয়া না-পাওয়ার মুখ চাহিয়া থাকে।

কুসুম আর ভাবিতে পারে না, ভাবিতে ইচ্ছা হয় না। আর কত সে ভাবিবে !

বিছানা ছাড়িয়া কুসুম উঠিয়া পড়ে। মনটাকে বশে আনিতে কি করা যায় তাহাই ভাবে। ঠাকুরের ধ্যান করিবে। এ চঞ্চল মন লইয়া তাহাও যে সম্ভব নয়।

হঠাৎ কুলঙ্গির প্রতি চোখ পড়ে কুসুমের। দু'টি তিনটি বই আছে ওখানে। সবই ঠাকুরের বই। এই বইগুলিই তাহার সান্ত্বনা। সব বুঝুক আর না বুঝুক, ভক্তিভরে কুসুম যখন বইগুলি পড়ে, মনের মলিনতা কাটিয়া যায়। গোঁসাইজী যদি অশেষ পরিশ্রম করিয়া কুসুমকে লিখিতে পড়িতে না শিখাইতেন, কি যে হইত, কেমন করিয়া কুসুমের মনের মেঘ কাটিত কে জানে।

রেড়ির তেলের প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া কুসুম কুলঙ্গি হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসে।

পাতা উল্টাইতেই নামটা চোখে পড়ে। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম। ভালই হইল। এই বইটা কুসুম কোনদিন পড়ে নাই। গোঁসাইজীর মুখে প্রায়ই সে জয়দেব গোঁসাইয়ের নাম শুনিয়াছে। গীতগোবিন্দের বহু পদও। সে দিন গোঁসাইজীর ঘর গুছাইতে গিয়া বইটা চোখে পড়ে। দু একটি পাতা উল্টাইয়া কুসুমের বড় ভালো লাগে। গোঁসাইজীর সেই অপরূপ কণ্ঠস্বরে গীত পদটিও মনে পড়ে: ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।

গোঁসাইজী ইহার অর্থ বুঝাইয়া দেন নাই। তবু কুসুমের মনে হইয়াছে এই পদের অর্থ আর তাহার মনের বক্তব্য এক। তাহার মনের কথাটি বুঝিতে পারিলে, অর্থ ধরিতে পারিলে বুঝিবে, কুসুম প্রতি মুহূর্তে এই ভিক্ষাই করিতেছে—: তুমি আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার রত্ন। এই ভবসমুদ্রের মাঝে তোমার মত শ্রেষ্ঠ রত্ন আর আমার কে আছে?

কুসুম গীতগোবিন্দমের পাতায় মনোনিবেশ করে:

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্ত মালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহঃ প্রাপয়।

অম্বর মেঘেমেঘে মেদুর হলো; বনপ্রান্তরও শ্যামল তমাল তরুনিকরে অন্ধকারময়। কৃষ্ণ বড় ভীরু। রাত্রে সে একা যেতে পারবে না। হে রাধা, তুমি কৃষ্ণকে নিজের সাথী করে নিয়ে যাও।

নন্দের আদেশে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সাথী করিয়া পথপ্রান্তবর্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুসুম থামে। সংস্কৃতে রচিত পদাবলীর অর্থ বুঝিবে এমন বিদ্যা তাহার নাই। বাঙলা অনুবাদ দেখিয়া কোনরকমে প্রথম শ্লোকটির মোটামুটি একটা মানে সে বোঝে। কিন্তু রসাস্বাদে এ এক প্রকাণ্ড বাধা। মন যদি না সহজে বিষয়ের অনুগামী হয়, যদি না কালিন্দী-কূলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কণামাত্র সে গ্রহণ করিতে পারে তবে কেন আর এই অপচেষ্টা। কুসুম চুপ করিয়া আনমনে শুধু বইয়ের পাতাগুলি উল্টাইয়া চলে।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ভেজানো দরজাটা সশব্দে হাঠ হইয়া খুলিয়া যায়। কুসুম চমকাইয়া ওঠে। প্রদীপ নিভিয়াছে। গভীর অন্ধকারের মাঝে সবই নিশ্চিহ্ন, নিমগ্ন।

কুসুম উঠিয়া পড়ে। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া দৃষ্টিটা বহিঃপ্রকৃতির পানে আকৃষ্ট হয়। নিরবচ্ছিন্ন জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে; বিরাম নাই, বিরক্তি

নাই। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে বৃষ্টির ছাট আসিয়া ঘরে ঢোকে। কুসুমের শাড়ি অবিন্যস্ত হয়, জলের ছিটায় খানিকটা ভিজিয়া যায়।

এবার দরজা বন্ধ করিয়া কুসুম খিল আঁটে। প্রদীপটা আর জ্বালাইতে ইচ্ছা হয় না। অন্ধকারেই মেঝের উপর গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে। শীতল স্পর্শ পাইয়া সর্বাংগ যেন জুড়াইয়া যায়। এমন কি মনটাও যেন একটু শান্ত হয়।

সুধাকরের কথাই আবার মনে পড়ে। মনে পড়ে দামিনীর কথা। দামিনী যাওয়ার সময় অত্যন্ত কুৎসিত কথা তাহাকে শুনাইয়া গিয়াছে। কুসুম তাহার জবাব দেয় নাই। কি জবাব সে দিতে পারিত? তাহার দোষে ভালোমানুষ সুধাকর মন্দ মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাহারই জন্য সুধাকর নেশাভাঙ করে, সোহাগীর কাছে থাকে—এমনি কতো কথাই তো দামিনী বলিল। কুসুম ভাবে: তাহার জন্যই যদি এত, তাহা হইলে আঙটি চুরিটাই বা তাহার জন্য না হইবে কেন? সোহাগীর খরচ যোগাইতে সুধাকরকে আঙটি চুরি করিতে হইয়াছে। যদি কুসুম সুধাকরকে প্রশ্রয় দিত, তাহা হইলে সোহাগী থাকিত কোথায়? সুধাকরেরও আঙটি চুরির প্রয়োজন হইত না।

যতই ভাবে কুসুমের মনটা ততই ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। একটা সহজ, সাধারণ ভালো মানুষকে কি সত্যই কুসুম উচ্ছৃংখল, অনাচারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন পশুতে পরিণত করিল? না-না, তাই কি হয়? লম্পট, অসাধু এই মানুষটার দুশ্চরিত্রতার জন্য সে দায়ী হইবে কেন? যে চোর সে স্বভাবে চোর। কুসুম তাহাকে চোর করিবে কোন স্বার্থে?

পুরানো কথা মনে পড়ে। বার বার মনে পড়ে। তন্ন তন্ন করিয়া মানুষ যেমন হারানো জিনিস খোঁজে ঠিক তেমনি ভাবেই কুসুম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে করিবার চেষ্টা করে সুধাকরের অসাধু রূপটা অতীতে কবে, কোথায়, কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। ছিদ্রান্বেষণ সহজ কাজ। কিন্তু এই সহজ কাজেও কুসুমকে হার মানিতে হয়। অভিযোগ করার মত কিছুই সে খুঁজিয়া পায় না।

সুধাকরের জন্য সে নিজে দায়ী হোক, কুসুম মনেপ্রাণে তাহাই ভাবিতে চাহিয়াছে। নিজেকে ইহার জন্য দায়ী করিতে তাহার একান্তই অনিচ্ছা ছিল। সব মানুষেরই বুঝি এমনটা হয়। মনুষ্যত্বের অভিমানেই হোক, কি

মনুষ্য স্বভাবের বিশেষ একটা শুভ বোধের জন্যই হোক, নিজের ক্ষতির জন্য নিজেকে দায়ী বলিয়া ভাবা যত না সহজ, পরের ক্ষতির জন্য নিজেকে দায়ী করা তাহা অপেক্ষা ঢের কঠিন।

ভাবিয়াও ভাবনার শেষ হয় না। ক্রমেই সহজ যুক্তিগুলি জটিল হইয়া ওঠে, আত্মসমর্থনের অস্ত্রগুলি আত্মবিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; কুসুমেরও ক্রমশ কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইতে থাকে, দামিনীর কথাই বুঝি ঠিক। সুধাকর যে নেশাভাঙ করে, আঙটি চুরি করে, ভ্রষ্টা রমণীর সংসারে আশ্রয় লয়, এ সবের জন্যই সে দায়ী।

এ কি দুর্দৈব! সুধাকরকে সে না দিল সুখ, না দিল শান্তি। অথচ তাহারই কারণে মানুষটা—।

কুসুম আর কত ভাবিবে! মাথাটা ভীষণ ভার হইয়া উঠিয়াছে। কপালের শিরা দুটা দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে। এ যন্ত্রণা অসহ্য; অসহনীয় এ মনস্তাপ।

না না; কুসুম আর ভাবিবে না। ভগবান মুক্তি দাও; আমায় মুক্তি দাও।

কুসুম জোর করিয়া ভূশয়ন হইতে উঠিয়া বসে। ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুর্জয় এক আকর্ষণে কেহ যেন কুসুমের সমস্ত মনটাকে টানিয়া নিজের হাতের মুঠায় ভরিয়া লইতেছে।

অন্ধকারেই কোনরকমে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কুলঙ্গি হইতে দেশলাইটা কুসুম উদ্ধার করে। প্রদীপ জ্বালে। ঘরের বিছানা, বাক্স, ছবি, খুঁটি নাটি আরো কত কি, আলোর জগতে আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই নিষ্প্রাণ বস্তুগুলিই প্রাত্যহিকের স্থূল স্পর্শ দিয়া তাহার মনের সীমানায় বেঁড়া বাঁধে। ভয় ভাঙ্গে কুসুমের। সান্ত্বনা বলো, আর সহায় বলো—নিঃসংগ কুসুমের ইহারাই তো সব।

গোঁসাইজীর কাছে যাওয়ার জন্যই কুসুম পা বাড়াইয়াছিল। চোখে পড়ে, প্রদীপের কাছে তেমনি ভাবেই গীতগোবিন্দটা খোলা আছে। বইটা তুলিয়া রাখার জন্য কুসুম হাত বাড়ায়। হঠাৎ দেখে—বইয়ের পাতাগুলি দমকা হাওয়ায় ওলট-পালট হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত পদ, বন্ধনী ও রেখা কণ্টকিত সেই অবোধ্য শ্লোকগুলি কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। তাহার

পরিবর্তে সহজ বাঙ্গালায় একটানা ছন্দবদ্ধ পদগুলি কে যেন সাজাইয়া দিয়াছে।

কুসুম বইটি নাড়াচাড়া করে। রহস্যটা ক্রমে ধরা পড়ে। বইয়ের শেষে সহজ বাঙ্গালা ছন্দে যে পদ্যানুবাদ দেওয়া আছে—কুসুম পূর্বে তাহা দেখে নাই। আশ্চর্য! কুসুমের মনে হয় এ যেন ঠাকুরের অনুকম্পা। যে তীর্থের দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে না পারায় কুসুমের মনটা ব্যথাক্রান্ত হইয়াছিল—ঠাকুর সেই তীর্থের সহজ পথটিও তাহার কাছে খুলিয়া দিয়াছেন। পরম-করুণা তাঁহার। কুসুম পড়ে:

রাধা কহে শুন সখি আমার আকুতি।
কৃষ্ণ বিনা মোর মন না চলয়ে কতি॥
ভূমিতে না চাহে পদ কৃষ্ণগুণ বিনে।
কৃষ্ণ-পরিতোষ সদা কহিছে ধেয়ানে।

পড়িতে পড়িতে কুসুমের চোখে অঝোর ধারায় জল নামে। এ যেন আর এক নূতন স্বাদ, নব-অনুভূতি।

অভিমানিনী রাধা রাস পরিত্যাগ করিয়া মনোদুঃখে এক লতাকুঞ্জে আশ্রয় লইয়াছেন। সখির সকাশে মনব্যথা ব্যক্ত করিতেছেন। শারদীয়া নিশিতে কৃষ্ণের সেই রসকেলির কথা তাঁহার মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে সেই বঙ্কিম-কটাক্ষ, বংশী ধ্বনি, সেই হাসি, আলিঙ্গন, পীনকুচ মর্দন।

সখি, মদন বাণে মোর অন্তর তাপিত। মধুসূদনকে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করো। আমি নিভৃত নিকুঞ্জ-মাঝে যাইব; 'নিশিতে রহসি কৃষ্ণ-নিলয়ে থাকিব।'

রাধা-কৃষ্ণের রতিলীলা পড়িতে পড়িতে কুসুম জগৎ-সংসার, আপন পর সব ভুলিয়া যায়। যেন রতি-সুখ-সময়ে রাধার মতই তাহার সর্ব অংগ অলস হইয়াছে।

দিন যায়। কুসুমের মনের বিকার বাড়ে। সে বিকারের বাহ্য কোনো রূপ নাই, তাহার কোন প্রকাশও নাই। যদিও বা কুসুমের কথায়বার্তায়, আচার-আচরণে পরিবর্তন দেখা দিয়া থাকে, কে তাহা লক্ষ্য করিবে!

কুসুম আজকাল গোঁসাইজীর নিকট হইতে সরিয়া থাকে। কে জানে কেন, গোঁসাইজীর কাছে যাইতে তাহার ভয় হয়, বুক কাঁপে। গোঁসাইজী

ডাকেন, কুসুম শুনিয়াও শোনে না। গোঁসাইজী কথা বলেন, কুসুমের সে কথায় কান থাকে না।

গোঁসাইজীর যখন যাহা প্রয়োজন নীরবে তাহা মিটাইয়া দিয়া কুসুম অন্তরালে সরিয়া যায়। সম্পূর্ণ নিঃসংগ থাকিতে তাহার ভাল লাগে। ভাল লাগে নির্জনতা, পুঁথি, পদাবলী, গীতগোবিন্দ আর ওই বারিবর্ষণ। মেঘলা সকাল, নিশ্চুপ দুপুর—নিরিবিলি নিজের মনের ভাবনায় আত্মমগ্ন হইয়া থাকা—কী যে ভালো লাগে! দিক দিগন্ত আঁধার করিয়া যখন বাদল নামে, সারারাত যখন একটানা বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়—কুসুম তখন অন্তরে-বাহিরে এক অদৃশ্য সেতু রচনা করিয়া সংগোপনে বিরহ নদী পারাপার করে।

কুসুমের দিনগুলি এই ভাবেই কাটিয়া যায। সুধাকরের চিন্তাটা ছায়ার মত সর্বদাই তাহাকে অনুসরণ করে। জাগরণে, ঘুমে—সুধাকর সর্বত্রই বিরাজমান। দামিনীর কথাটাও কুসুম ভুলিতে পারে না—'বলে দেব্‌তাবাই পারলে না, তো মানুষ।' …দামিনী কথাটা বুঝি ঠিকই বলিয়াছিল। আরও একটা কথা বলিয়াছিল দামিনী—'তোর অসুখ বিসুখ থাকে তো ঘরে সতীন আন। হেলা-ফেলা করিস নে বাপু, হাজার হোক সোয়ামী তো। কথায় বলে সবার বাড়া দেবতা।'

কুসুম সতীন আনিবে? কে সে সতীন? সোহাগী? সোহাগী কি এতোই সুন্দরী? খুব কি রূপ আছে তার! সোহাগীকে ভালো করিয়া একবার দেখিবার ইচ্ছা যে কুসুমের না হয় এমন নয়। কিন্তু যে মেয়েটা সুধাকরের সোহাগে ভাগ বসাইতেছে তাহার প্রতি অপরিসীম একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিয়া কুসুম মনের ইচ্ছাটা সংযত করে। যেন এক মুঠা বিষাক্ত জ্বালাধরা বাতাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া কণ্ঠের আগায় উঠিয়া আসিযাছিল কুসুম তাহা দমন করিল।

*

পিটারকে দেখার জন্য হীরা শহরের হাসপাতালে আসিয়াছে।

পিছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়া হীরা উপরে ওঠে। সিঁড়ির দোলায় বুক দোলে, ভয় হয় কেহ যদি দেখতে পায়, এখুনি হয়তো ছুটিয়া আসিবে, হিড়হিড় করিয়া হীরাকে টানিয়া নীচে নামাইবে আর গালাগাল দিয়া হাসপাতাল হইতে দূর করিয়া দিবে।

দারোয়ানের কথা না শুনিলেই হইত। দুরু দুরু বুকে, আশে পাশে উপরে নীচে তাকাইতে তাকাইতে হীরা শেষ পর্যন্ত যথাস্থানে পৌছায়।

হীরার কপাল ভালো। পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া অলক্ষে সে উপরে উঠিয়া আসিতেই কাঁচের জানালা দিয়া পিটারকে দেখিত পাইল। পিছনের সরু বারান্দার প্রথম ঘরটিই পিটারের।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া পিটার বসিয়া আছে। হাত দুটি অলসভাবে মাথার উপর তোলা।

চুপিসারে ঘরে ঢুকিয়া হীরা একটু দাঁড়ায়; এদিক ওদিক তাকায়। সাদা দেওয়াল, সাদা চাদর, মিটসেফের উপর ফুলদানিতে কিছু সাদা ফুল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ঘর। তবু কেমন যেন একটা থমথমে আবহাওয়া। কেমন একটা কটু গন্ধ।

পিটারেব দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় হীরা সামনে আগাইয়া যায়।

পায়ের শব্দে পিটার মুখ ফিরাইতেই হীরাকে দেখিতে পায়। প্রথমটায় অবাক, পরে কেমন যেন আবেগের সুরেই পিটার স্বগতোক্তি করে—'হীরাবাঈ'!

হীরাও খুশী। মুখের হাসিতে তাহারই আভা। দৃষ্টিটাও তাহার উজ্জ্বল।

—বেমারী আচ্ছা না হো গিয়া হায়, গার্ডসাহাব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বিলকুল আচ্ছা। মগর তুম কিধারসে আয়ি?

ছেলেমানুষী হাসি হাসিয়া হীরা আঙ্গুল দিয়া পিছনের দরজাটা দেখায়, 'পিছলি রাস্তাসে।'

—বেশাখ! আগর গির যাতি তো!

—মর্ যাতি। হীরা মৃদু মধুর শব্দে হাসিয়া ওঠে।

পিটার সোজা হইয়া উঠিয়া বসে। চঞ্চল চোখে হীরা ঘরের চারপাশ দেখিতে থাকে। বিস্ময় এবং বিহ্বলতার সুস্পষ্ট একটা ছায়া তাহার মুখে।

—দাবাইখানাসে ঘর না যাইয়েগা আপ্?

—জরুর।

—কব যাইয়েগা?

—আউর ভি দশ্ বারা দিন বাদ্।

হীরা সসঙ্কোচে ঘরের চারপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পিটার তখনও বিস্মিত এবং মুগ্ধ চোখেই হীরাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

বারবুয়া স্টেশনের পানবালী হীরা বলিয়া যে দেহাতী সুন্দরী মেয়েটাকে পিটার দিনের পর দিন দেখিয়াছে, কারণে অকারণে চোখের ইঙ্গিতে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছে যাহার নিকট, শিস দিয়া হাসিয়া কত রঙ্গ করিয়া হাতছানি দিয়াছে—এ যেন সে হীরা নয়।

পিটার হীরাকে শুধায়, এ ঘরের সন্ধান তাহাকে কে দিল? কেমন করিয়া হীরা জানিতে পারিল গার্ডসাহেব এখনো বাঁচিয়া আছে?

পিটারের শেষ কথাটায় হীরার কে জানে কেন খুব হাসি পায়। ও বলে, গার্ডসাহেব যে জিন্দা রহিয়াছে এ কথা সে জানিত। আর এ ঘরের কথা জানিল কি করিয়া? কেন, শিবলাল? শিবলালের চাচা না কাজ করে এখানে। শিবলালের সহিত হীরা এখানে আসিয়াছে। বিনি টিকিটে। শিবলালের চাচার সুপারিশে দ্বারোয়ান তাহাকে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া উপরে পাঠাইয়া দিয়াছে। হ্যাঁ গার্ডসাহেব, এখন নাকি এখানে কাহাকেও আসিতে দেওয়া হয় না। ডাগ্‌তার সাহাবরা দেখিতে পাইলে গোসা হন? পুলিশে ধরাইয়া দেন।

পিটারের পায়ের কাছে মেঝেতে হীরা কখন যেন হাঁটু মুড়িয়া বসিয়াছে। গালে হাত দিয়া পিটারের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কথা বলিয়া চলিয়াছে।

পিটার সব শোনে আর হাসে। বলে, হ্যাঁ—এখন দুপুর। এ সময় কাহাকে ও বেমারী-লোকের সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় না।

পিটার আর হীরা গল্প করে। পিটারের কথা পিটার বলে। বলে, তাহার সাজ্ঘাতিক অসুখ হইয়াছিল; নিমোনিয়া। বাঁচিবার কোনো আশা ছিল না। মৃত্যুর মুখ হইতেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। অসহ্য কষ্ট পাইয়াছে দিনের পর দিন।···হীরার কথা তাহার মনে পড়িত। আরে বাঈ, তুমেই না ম্যায়কো গোর ভেজতি থি। তুমি তো আমায় কবরে পাঠাচ্ছিলে; মরে গেলে কি লাভ হতো তোমার!

পুরানো কথাটা মনে পড়ায় হীরার মুখের হাসি সহসা মুছিয়া যায়। মনে মনে সে বলে: গার্ডসাহাব আমার বদনামি করছো; করো। হ্যাঁ—আমি তো তোমায় অমন জলঝড়ের দিন দূর করে দিয়েছিলুম। যদি তুমি মরে যেতে আমার আর কি লাভ হতো?

হীরার নিষ্প্রভ মুখ ও কাতর চোখ পিটারের দৃষ্টি এড়ায় না। পিটার

বুঝিতে পারে, মেয়েটা মনে দুঃখ পাইয়াছে। চতুর পিটার কথার মোড় ঘুরাইয়া লয়। স্টেশনের কথা জানিতে চায়। মাস্টারবাবু কেমন আছেন? ওখানে কি খুব বৃষ্টি হইতেছে? লছমী কেমন আছে?

এ কথা সে কথার পর হীরার মুখের আঁধার কাটিয়া যায়। পিটার হঠাৎ প্রশ্ন করে, এক বাত্‌তো বাতাও হীরাবাঈ!

হীরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

—কাহে তুম্ আয়ি হায় হিঁয়া?

হীরা প্রথমটায় পিটারের প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে শুধু পিটারের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

—হাঁ-হাঁ, শোচ্‌তি হায় কিয়া? বাতাও ভি তো—পিটার সহজ স্বরেই পরিহাস করে।

হীরা বোধ হয় কিছু একটা বলিবার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু হঠাৎ ঘরের মধ্যে অবাঞ্ছিত এক আগন্তুককে আসিতে দেখিয়া বেচারী চুপ করিয়া যায়। একটি বছর বাইশের মেয়ে ঘরে ঢোকে।

অচমকা একজন মেমসাহেবকে দেখিয়া হীরার মুখ শুকায়। বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। এখনই তো তাহাকে তাড়াইয়া দিবে! পুলিশের হাতে যদি ধরাইয়া দেয়, তবে? ভয়ে ভয়ে হীরা মেমসাহেবকে দেখে আর ভাবে, হাসপাতালের অন্যান্য মেমসাহেবদের মত এর পোশাকই বা সাদা নয় কেন? এ কে?

পিটারের কেবিনে পা দিয়া বেটসিও কিছু কম বিস্মিত হয় না। পায়ের কাছে অমন ভাবে বসিয়া ওই সুন্দরী মেয়েটা কে? এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে পিটারের কাছে বসিয়া আছে, যেন মেয়েটা পিটারের খুবই পরিচিত। কে এই দেহাতী মেয়েটা? হাসপাতালের জমাদারনী নয়; কারণ বেশভূষা তেমন নয়। তবে?

বেটসি হীরাকে তীক্ষ্ন চোখে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে। হীরা সে-দৃষ্টির সামনে ক্রমশই আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক রকমে সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। করুণ মুখে বার বার পিটারের দিকে তাকায়।

—ইজ্‌ শি এ হস্‌পিট্যাল স্টাফ্‌, ডিয়ার? বেটসির ভ্রূকুঞ্চন খুবই স্পষ্ট।

—নো। পিটার মাথা নাড়ে। আড়চোখে হীরাকে একবার দেখিয়া

লয়। বেটসির অর্ধ-ধূসর, তীক্ষ্ণ চোখে চোখ রাখিয়া কেমন যেন জড়িত স্বরে পিটার আবার বলে, 'নো'।

বেটসি একটু সরিয়া আসে। পিটারের ইজিচেয়ারের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়। হাত দুটি আড়াআড়ি ভাবে বুকের কাছে রাখিয়া আভিজাত্যসূচক ভঙ্গি করে।

—শি ইজ ফ্রম বারবুয়া। হ্যাপেনড্ টু নো মি, ডিয়ার। পিটার প্রাণহীন হাসি হাসিয়া ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া দেয়।

—হ্যাজ শি অ্যানি বিজনেস্ হিয়ার? দিস্ ইজ অল সিলি ফর ইউ! বেটসি পিটারের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া হীরার দিকে তাকায়, অত্যন্ত ঝাঁঝালো এবং মেজাজী গলায় শুধায় 'কিয়া কাম হায় তোমারি হিঁয়া?'

বেটসির গলার ঝাঁঝে হীরা সন্ত্রস্ত। হলুদ খাটো-ঝুল জামা পরা কট্‌কটে ওই মেমসাহেবটাকে দেখা পর্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে কী যে এক অস্বস্তি। থতমত খাইয়া হীরা নীরবে ভয়-চোখে তাকাইয়া থাকে; কথা বলে না।

অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পিটার হীরা সংক্রান্ত পরিচয়ের পালাটা বেটসির কাছে সংক্ষেপে বর্ণনা করে। উহার নাম হীরা। বারবুয়া স্টেশনের নিকটেই থাকে, চা পান সিগারেট খানা-দানার দোকান আছে। মেয়েটি বড় ভালো। পিটারের যখন অসুখ হয়, প্রথমটায় হীরার বাসাতেই ছিল। অনেক সেবা যত্ন করিয়াছে। ভেরি কাইণ্ডহার্টেড্ গার্ল। এখানে কি যেন কাজে আসিয়াছিল, তাই হাসপাতালে পিটারকে দেখিতে আসিয়াছে।

হীরার গুণবর্ণনায় পিটার আবেগের পরিচয় দেয় না। প্রশংসাসূচক কণ্ঠে, নিরপেক্ষজনের মতনই কথাগুলি বলে।

হীরার পরিচয় বেটসিকে খুশী করিতে পারে না। পিটারকে সেবা-যত্নই করুক আর বিপদের দিনে আশ্রয়ই দিক ওই সুপুষ্ট-তনু সুন্দরী দেহাতী মেয়েটার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বেটসির মনে হয় না। কোথাকার একটা জঙ্লি, অসভ্য মেয়ে; পান চা বিড়ি বিক্রয় যাহার পেশা সেই মেয়েটা আসিয়াছে হাসপাতালে পিটারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। ঘৃণায় বেটসি নাসিকা কুঞ্চিত করে। নিজে সে অ্যাসিস্টেণ্ট ইয়ার্ড মাস্টার জি কিংহামের মেয়ে। স্থানীয় অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজে তরুণী-কুলের অন্যতম। নাগপুরে কনভেণ্টে থাকিয়া বেটসি কিছুকাল

বিদ্যা ও সহবত চর্চা করিয়াছে। সাজগোজের ব্যাপারে বেটসির ঘটা ও ছটা তাহার সমাজের অপরাপর তরুণীদের কৌতূহলের বিষয়। ফ্যাশানে ওর সঙ্গে পাল্লা দেয় এমন আর কে আছে এখানে। বেটসি এখানকার য়ুরোপীয়ান ক্লাবে মিক্সড্ টেনিস-টুর্নামেন্টে প্রতিবার খেলে আর হারে। এক্স্‌মাসের পার্টিতে সকলকে টেক্কা দিয়া গান গায়; তাহার সঙ্গে নাচিবার জন্য তরুণদের কি উৎসাহ তখন।

এ হেন বেটসি কি কম! তবু, লোকে বলে ঘষা কালো-চামড়ার বেটসি নাকি দেখিতে ভালো নয়। বেটসি স্বাস্থ্যহীনা। মুখটা তাহার অপেক্ষাকৃত গোল, চোখ ছোট, অর্ধধূসর চোখের তারা উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। বব্ করা চুলের রঙটা কটা। একটা হাত একটু নাকি ছোটই।

হীরা চোরা-চোখে বেটসিকে ভালো করিয়া দেখে। মেমসাহেব হীরা অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু এত কাছে এমন ভাবে কাহাকেও দেখিবার সুযোগ তাহার আর হয় নাই। বেটসির বেশবাস ছাড়াও হীরা যেন আরো কিছু দেখিবার আশায় থাকে।

ইজিচেয়ারের হাতলটার উপর বসিয়া বেটসি একহাতে পিটারের গলা জড়ায়। বলে, 'আস্ক্ হার টু লিভ দিস্ রুম, ডিয়ার। উই ক্যান্ এক্সপেক্ট ড্যাড্ এণ্ড ডক্টর ল্যাবোডার হিয়ার অ্যানি মোমেণ্ট।'

সংবাদ শুনিয়া পিটারও বিচলিত বোধ করে। মিঃ কিংহাম এবং ডাঃ ল্যাবোডার যদি এই মুহূর্তে এখানে আসিয়া পড়ে হীরার উপস্থিতিটা খুব সুখকর হইবে না। হীরার দিকে তাকাইয়া পিটার বলে,—'আব্ তু যা হীরা। বাড়া ডাগ্তার সাব আভি আয়েগা।'

হীরা ওঠে। পিটার এবং বেটসির যুগল-মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাহার মুখটা কালো হইয়া উঠিয়াছে। কোন কথা না বলিয়াই হীরা কেবিনের পিছনের দরজার দিকে পা বাড়াইয়া দেয়।

—উধার কাঁহা যাতি হায়, ইধারসে যা। যা, ডারো মাত্। আভি কোহি কুছ না বোলে গা।

বাধা পাইয়া হীরা এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। আর একবার পিটারের দিকে তাকায়, ধীরে ধীরে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

বাহিরে করিডোরে আসিয়া হীরা সমস্যায় পড়ে। করিডোরের কোন দিকে গেলে নীচে নামিবার সিঁড়ি পাওয়া যাইবে কে জানে! তবু ডান

দিক দিয়াই সে আগাইয়া যায়। একের পর এক কেবিন। সবেমাত্র দু এ'ক জন লোক যাওয়া আসা শুরু করিয়াছে। দ্রুত শব্দ তুলিয়া একটি নার্স হীরার সামনে দিয়া চলিয়া গেল। কেবিনের মধ্য হইতে কথাবার্তার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে; কচিৎ কদাচিত একটু হাসিও বা।

করিডোর ধরিয়া সোজা অনেকটা আগাইয়া গিয়া হীরাকে অবশেষে থামিতে হয়। সিঁড়ি খুঁজিয়া পায় না। আবার উল্টা-পথে হীরা ফেরে। পিটারের কেবিন যে কোনটা এখন আর তাহা চিনিতে পারে না। সবই এক ধরনের। পশ্চিম মুখে করিডোরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটিয়াও হীরা সিঁড়ি খুঁজিয়া পায় না; আবার ফেরে। করিডোর ফাঁকা। কাহারো নিকট হইতে সিঁড়ির খবরটা জানিয়া লইবে সে উপায় নাই। কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া হীরা অপেক্ষা করিতে থাকে। কেহ না কেহ নিশ্চয় আসিয়া পড়িবে। পিটারের নিকট হইতে সিঁড়ির খোঁজটা জানিয়া লওয়ার বাসনা যে হীরার না হইয়াছে এমন নয়; কিন্তু বেটসির কথা মনে পড়িতে হীরা সে বাসনা মনে মনেই দমন করিয়াছে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া হীরা মুখ ফিরাইয়া তাকায়। চোখের সামনে যে পুরুষ মূর্তিটা আগাইয়া আসিতেছে তাহাকে দেখিয়া হীরা অবাক। এখানে, এ-সময় এই মূর্তিটি দেখিবার আশা সে করে নাই। লোকটিকে হীরা চেনে। বহুবার তাহাকে স্টেশনে দেখিয়াছে। ছোটকিমাতলার বড়সাহেব।

সূর্যশংকর মাথুরকে দেখিতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে আসে। হীরা সূর্যশংকরকে চিনিতে পারিয়া তাহার দিকেই তাকাইয়া থাকে। সূর্যশংকর চলিয়া যাইতেছিল, হীরা হঠাৎ তাহাকে সেলাম জানায়।

সূর্যশংকর মুখ তুলিয়া তাকায়; হীরাকে লক্ষ্য করে। চিনিতে পারে না। সূর্যশংকর যাওয়ার উপক্রম করে।

—নীচে উতারনাকি রাস্তা কিধার মিলেগি, হুজুর? হীরা সবিনয়ে শুধায়।

সূর্যশংকর আঙ্গুলের ইশারা করিয়া সিঁড়ির দিকটা দেখাইয়া দেয়।

কারিডোরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হীরা আসা যাওয়া করিয়াছে, সিঁড়ি খুঁজিয়া পায় নাই। অথচ সামনেই সিঁড়ি। তাজ্জব ব্যাপার।

সূর্যশংকর ততক্ষণে একটি কেবিনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। হীরা মন্থর পায়ে সন্তর্পণে ডান পাশটা দেখিতে দেখিতে সামনে আগাইয়া যায়।

কয়েক পা আগাইয়া আসিতেই হীরার চোখ একটি কাঁচের জানালায় সহসা আটকাইয়া যায়। সেই পিটার আর বেটসি। ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া বেটসি পিটারের গলা জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া দিয়াছে, চুলগুলি আর পিঠটাই শুধু দেখা যায়। পিটার বেটসির ঘাড়ের কাছে চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছে। তাহার চুলে গালে মুখ ঘষিয়া ঘষিয়া সোহাগ জানাইতেও পিটারের কার্পণ্য নাই।

দৃশ্যটা হীরার ভালো লাগে না। তথাপি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ও বিস্ময় অনুভব করিয়া হীরা সেই দিকেই তাকাইয়া থাকে।

পিটার আর বেটসির আলিঙ্গন যখন আরও দৃঢ়তর ও অন্তরঙ্গ হইয়া ওঠে তখন ওই দুটি মানুষের মুখ-চোখের ভাবটাই সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। স্ফীত নয়ন, রুদ্ধ-শ্বাস, কামনা থরো-থরো দুটি নরনারীর চুম্বন-লীলার উষ্ণতাটা বুঝি হীরাকেও স্পর্শ করে।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় শিবলালের সেই লোকটার সহিত হীরার দেখা। পিটার সাহেবের সহিত দেখা হইয়াছে কি না— একটিবার মাত্র প্রশ্ন করিয়াই পর মুহূর্তে হীরার দিকে সে হাত বাড়াইয়া দেয়। হীরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে না। অবশ্য তাহাতে যে পরিত্রাণ পাওয়া গেল তাহাও নয়। শিবলালের সেই পরিচিতজন হীরাকে বুঝাইয়া দিল, অসময়ে পিছনের পথ চিনাইয়া দিয়া সে হীরার সহিত পিটার সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া এই যে বাত-চিত হইল ইহার জন্য তাহাকে কিছু দিতে হইবে। এক আধুলির কম তো নয়ই। দাদারে, দাদা, তাহার কম কি হয়! কী ভীষণ দুঃসাহসের কাজই না তাহাকে করিতে হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব কি মেমসাহেবেরা দেখিলে তাহার নোকরি চলিয়া যাইত।

হীরা আঁচলের গিঁট খুলিয়া একটি আধুলিই বাহির করিয়া দেয়। হাসপাতাল হইতে বাহির হইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

—গড্ডি মিলে গি না? পয়সা দিয়া হীরা প্রশ্ন করে।

—হাঁ-হাঁ ; অভি ভি বহুত টায়েম্ হায়।

হীরা কি ভাবে। আবার প্রশ্ন করে,—'এ জী, এক বাত বাতাও গে?'

—জরুর। কাহে নেহি?

—উ লাড়কি কোন থি?

—কোন্?

—মেমসাহাব, হল্‌দি কুরতিওয়ালী। গার্ড সাহাবকো ঘরমে বেশারামী লাগাই হোয়ি হায়।

হলুদ-জামা-পরা কোন মেমসাহেবের কথা হীরা বলিতেছে লোকটা এক মুহূর্ত তাহা ভাবিয়া লয়। পরক্ষণেই সহাস্য মুখে বলে,—'সাম্‌ঝা। দুবলা, কালা না—? ইয়াড্ (ইয়ার্ড) সাহাবকো বেটি।'

—রায়তি হায় ইঁহা?

—হাঁ। ঘর না হায় উধার, রেলবালা।

এখানে থাকে। রেলকোম্পানীর ঘরে। হীরা যেন আরও নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য বেটসির আসা যাওয়ার খবর শুধায়।

মাথা নাড়িয়া লোকটি জানায়, হ্যাঁ—বেটসি রোজই আসে।

হীরা নির্বাক। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক চোখে লোকটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। যেন আরও কিছু সে জানিতে চায়। কিন্তু আর কি জানার আছে!

গায়ের রঙীন উড়নিটা ঠিক করিয়া হীরা মোরম ঢালা পথ দিয়া হাঁটিয়া চলে। হাসপাতালের ফুল বাগানে কিছু কিছু ফুল ফুটিয়াছে। বাদলা হইয়া আসিল। সাইকেলের ঘণ্টিতে হাসপাতালের পথ মুখর। লোকজন যাতায়াত করিতেছে। দূরে স্টেশন হইতে ইঞ্জিনের সিটির শব্দ ভাসিয়া আসে। মন্থর গতিতে হীরা আগাইয়া চলে। অন্যমনস্ক, ক্লান্ত, শূন্য হৃদয়। অদ্ভুত এক বেদনা বুকের তলায় যেন ক্রমশই ভারি হইয়া উঠিতেছে।

সন্ধ্যার গোড়ায় গাড়ি ছাড়িল।

প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। শিবলাল আসে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গাড়ি ছাড়ার প্রায় শেষ মুহূর্তে হীরা টিকিট করিল। শিবলালের সহিত গেলে বিনি টিকিটে যাওয়া যাইত। কি হইল শিবলালের কে জানে? বোধ হয় বাদলায় আটকাইয়া গিয়াছে। না

হয় ঘরে আসিয়া ছোঁড়াটার আর ফিরিতে মন চায় নাই। কাল ফিরিবে। নোকরির তো পরোয়া নাই। মাস্টারবাবু বড় ভালো লোক। কুলী পোর্টাররা খুশিমত কামাই করে, নোকরি করে ; মাস্টারবাবু কোনো কথাটি বলেন না। উহাদের সাহসও তাই দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে।

ট্রেনের কামারা প্রায় ফাঁকা। সপ্তাহের প্রায় দিনই এমনি ফাঁকা যায়। কামারাও থাকে অল্প। শনি, রবিবার কামারার সংখ্যা বাড়ানো হয়। ওই দিন ভিড়ও হয় যথেষ্ট। খিদরগাঁওতে সে-দিন বাজার বসে। আশেপাশের কুড়ি পঁচিশ মাইল এলাকা হইতে লোকজন সওদা বেচা-কেনা করিতে যায়। শহর হইতে সে-দিন দলে দলে খিদরগাঁও ছোটে ব্যাপারীরাও।

খিদরগাঁও মিটারগেজ লাইনেরই একটা ছোট জংশন স্টেশন। সেখান হইতে বারবুয়া মাইল আস্টেক দূর। একটি মাত্র স্টেশন। খিদরগাঁওতে গাড়ি বদল করিয়া তবে বারবুয়া যাইতে হয়।

খিদরগাঁওতে গাড়ি পৌছাইবে সেই ভোর বেলায়।

বাহিরে প্রবল বর্ষণ। একমুহূর্তও বিরাম নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরের সিক্ত, ক্লান্ত মূর্তিটা বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া আবার নিমেষে আঁধারে ডুবিয়া যায়। ভয়ংকর একটা শব্দ দৈত্যকায় হিংস্র কোনো পশুর গর্জনের মত সেই নির্জন প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফেরে। ভয় হয় এই বুঝি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া ছোট লাইনের পলকা গাড়িটা চুরমার হইয়া যাইবে।

সরীসৃপ যন্ত্র-দানবটার দেহ ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু শক্তি কম নয়। অমিতবিক্রমে আগুনে-ফুলকির হাসি ছড়াইয়া অবহেলায় সে পথ প্রান্তর অরণ্য পার হইতেছে। দুর্যোগ তাহার দুরন্ত গতিকে রোধ করিতে পারে নাই।

ট্রেনের কামরার দরজা জানালা বন্ধ। অনুজ্জ্বল একটা বাতি মাঝখানে মাথার উপর জ্বলিতেছে। কামরায় যাত্রীসংখ্যা অল্পই। পাশের একটা বেঞ্চিতে হীরা গুটিসুটি দিয়া শুইয়া থাকে। মধ্যকার বেঞ্চে হীরারই সমবয়সী একটি মেয়ে শিশুপুত্রকে স্তন-দান করিতে করিতে ঘুম-চোখে ঢুলিতেছে। পাশে তাহার স্বামীই বোধ হয়। উঁচু হইয়া বসিয়া বিড়ি টানে আর কাশে। ওপাশের বেঞ্চে আর একজন যাত্রী বিচিত্র কায়দায় হাত পা মেলিয়া নাক ডাকাইতেছে। অপরজন সম্ভবত কোনো ব্যবসাদার মাড়োয়ারী যুবক। ভারি

একটা পুঁটলির গায়ে হেলান দিয়া একদৃষ্টে হীরার পানে চাহিয়া আছে। দৃষ্টিটা তাহার নিরীহ গোছের নয়; অস্পষ্ট আলোতেও তাহার চোখের লোভাতুর দৃষ্টিটা ঠাওর করা কঠিন নয়। লোকটা গলায় কাঁপন তুলিয়া গান ধরিয়াছে—চটুল গান।

হীরা নজর করিয়া সবই দেখিয়া লইয়াছে। চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ভালো লাগে নাই তাই শুইয়া পড়িয়াছে।

পিটার আর বেটসির কথা মুহূর্তের জন্যও সে ভুলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া সেই উন্মত্ত আলিঙ্গনের দৃশ্যটা। এখনও যেন চোখের সামনে হীরা সেই দৃশ্যটাই দেখে। গভীর মনোযোগে তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটিগুলা হীরা মনে করিবার চেষ্টা করে। যেন মনে মনে হীরা ওই দৃশ্যটারই একটা ছবি আঁকিতেছে।

বেটসি মেয়েটার উপর হীরা হাড়ে হাড়ে চটিয়াছে। কালা দুবলা মেমটা যে বেহায়া সে বিষয়ে হীরা নিঃসন্দেহ। মেমরা নাকি বেশরমই হয়; উহাদের পোশাক-টোষাকই তো সে-রকমের। রাস্তা ঘাটের বালাই নাই, লোকজনের পরোয়া নাই—আওরাৎ আর মরদানাতে মিলিয়া জড়াজড়ি করিয়া থাকিতে লজ্জা পায় না। রাস্তার কুত্তাগুলার কথা হীরার মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বেটসি মেমটাও অমনি। কুত্তির মত গার্ড সাহেবের গা চাটিতেছে।

গার্ড সাহেবের উপর হীরা প্রথমটায় খুব যে বেশি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। কেমন যেন একটা সহজ বুদ্ধিতেই হীরা ধরিয়া লইয়াছিল গার্ড সাহেবের তেমন দোষ নাই। বেটসিই জোর করিয়া পিটারের পিয়ার আদায় করিয়া লইতেছে। গার্ডসাহেব তো হীরাকে দেখিয়া খুশী হইয়াছিল। তাহার সহিত হাসিমুখে কথা বলিয়াছে, গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। পিটারের ফ্যাকাসে মুখে চোখে হীরার জন্য বেশ একটা কোমলতা ফুটিয়াছিল। বেটসি আসার সাথে সাথেই সব যেন মলিন হইয়া গিয়াছে।

তবু, হীরা পরক্ষণেই ভাবে, দিল আগার না চায় তো পিয়ার কারে কোন্। তোমার যদি ইচ্ছাই না থাকে, কোন জোরে ওই কালো, রুগ্ন, বেহায়া মেয়েটা তোমার গলা জড়াইয়া চুমু খায়? তোমার পিয়ার পায়?

হীরা মনে মনে পিটারকে সম্বোধন করিয়া বলে: বেইমানী না কারো গার্ড সাহাব।

ক্রোধ, উদ্বেগ, হাতাশা, দুঃখ—হীরা বিভিন্ন অনুভূতির টানা-পোড়েনে ক্লান্ত হইয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

চিৎকার আর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ হীরার ঘুম ভাঙ্গে। চোখ মেলিয়া তাকায়। কিছুই নজরে পড়ে না। কেবল অন্ধকার। অস্পষ্ট কলরব ভাসিয়া আসিতেছে। ধড়মড় করিয়া হীরা বেঞ্চির উপর উঠিয়া বসে। চোখ রগড়াইয়া এদিক ওদিক তাকায়। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভয়ে হীরার সর্বাংগ হিম হইয়া আসে। কোথায় সে? বাড়ি, হাসপাতাল না গাড়িতে। গাড়িতে চড়িয়াই না সে ফিরিতেছিল! তবে? কোথায় তাহার অন্যান্য সাথীরা? হীরা উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

কয়েকটা লোকের অস্পষ্ট একটা গোলমাল শোনা যায় বটে কিন্তু কাহাকেও দেখা যায় না। কোথায় তাহারা? এই কামারাতে, না অন্য কোথাও? আ, কি হইয়াছে, কেন এতো অন্ধকার? সাঙ্ঘাতিক একটা শব্দও শোনা যায়, শব্দটা কিসের?

চিৎকার করিয়া হীরা জানিতে চায়, কি হইয়াছে, কোথায় সে? প্রথমে কোনো জবাব নাই। হীরা এবার গলার সমস্ত শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া ডাক দেয়। ভয়-ব্যাকুল হীরার সে ডাকে এবার কে যেন সাড়া দেয়। বলে, তাহাদের আর গার্ড সাহাবের কামারাটা, আগের দুটি কামারাও ইঞ্জিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গভীর জঙ্গলের মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।

হীরার গলাটা বুঝি এই অন্ধকারে কেউ দু'হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়াছে; দম বন্ধ করিয়া তাহাকে খুন করিতে চায়। কে যেন হৃদপিণ্ডটাকে নির্মমভাবে নিষ্পেষণ করিতেছে।

কোনো রকমে হীরা প্রশ্ন করে, সর্বনাশ, আগের গাড়ি গেল কোথায়? ওই ভয়ংকর শব্দটাই বা কিসের—? গাড়ির অন্য মানুষগুলিই বা কই?

লোকটা এবারও জবাব দেয়। বলে, আগের গাড়ি আর ইঞ্জিন যে কোথায় কে জানে! সামনেই পুল। নদীতে বান আসিয়াছে আর বানের তোড়ে পলকা পুলও ভাঙ্গিয়াছে। ওই যে বিরাট শব্দ, ওই শব্দ জলস্রোতের। সামনের গাড়ির কথা কেহ জানে না। হয় নদীর প্রখর স্রোতে মানুষ, জন, মালপত্র সমেত তলাইয়া গিয়াছে আর না হয় কোন জল-থৈ-থৈ মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাভিশ্বাস টানিতেছে। এই দুটি ক্যারেজের যাত্রীরা

আকস্মিক বিপদে হতচকিত হইয়া গার্ডের গাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। গার্ড সাহেবই এখন তাহাদের সকল বিপদের ত্রাণকর্তা।

অত্যন্ত হালকা স্বরে লোকটা হীরাকে অবস্থাটা মোটামুটি বুঝাইয়া দেয়। হীরাও বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। বলে, 'ম্যায় ভি যাওঙ্গে।'

লোকটা কোনও জবাব দেয় না।

যাইব বলিলেই তো যাওয়া হয় না। হীরা কেমন করিয়া যাইবে? একেই তো কামরার মধ্যে অমাবস্যার অন্ধকার তাহার উপর গার্ডের গাড়িতে যাইতে হইলে তাহাকে দরজা খুলিয়া নীচে নামিতে হইবে। তাহারও বিপদ কিছু কম নয়। হীরার সে সাহস হয় না।

—এ জী যাঁও ক্যায়সে? হীরা অদৃশ্য ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া অসহায়ের মত প্রশ্ন করে।

—উাতরকে চলি যাও।

—উতারনেমে ডর্ ল্যাগতি হায়! ইতনে কালা আঁধেরা, পানি ভি না জ্‌ম্ গিয়া হায় নীচে; যাঁও ক্যায়সে?'

লোকটা এবার আর কোনো উত্তর দেয় না। হীরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করে, 'তুম্ নে না যাও গে, জী?'

—না।

—ডার না হায় তোমারহি? হীরা বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করে।

—জরুর হায়। অন্ধকারের আড়াল হইতে লোকটা যেন এই ভয়ঙ্কর সময়েও পরিহাস করিয়া বলে, মাগর গার্ড সাহেবকা কামরামে যানে মে কিয়া ফ্যায়দা? আগর সের আয়া তো গার্ডসাহেব নে রুখ্‌নে সাখেগা? উসকে নাগিচমে হায় কিয়া? সিয়ারোকো ডার দেখানে কো বাস্তে এক আওয়াজী ঝুটা বন্দুক। বাস্ না—?

কথাটা ঠিকই; এ অঞ্চলের ট্রেন-সার্ভিসের এই এক কাণ্ড। গভীর অরণ্যের বুক চিরিয়া মিটার গেজ রেল লাইন। কোথাও ভীষণ চড়াই কোথাও উৎরাই; কোথাও গভীর খাদ, কোথাও বা পাহাড়ী ছোট নদীর উপর যেন-তেন প্রকারের কালর্ভাট গোছের একটি ব্রিজ। কাজে কাজেই আগাগোড়া পথ ইঞ্জিন ড্রাইভার আর গার্ডকে প্রতিটি মধ্যবর্তী স্টেশনের সবিশেষ খোঁজ লইয়া তবে চলিতে হয়। বিশেষত এই বর্ষাকালে। বর্ষাকালে লাইনটার অবস্থা খুবই মারাত্মক হইয়া ওঠে। কোথাও ধস নামিয়া লাইন বন্ধ হয়,

কোথাও পাহাড় হইতে বিপুল ধারায় জল নামিয়া আসিয়া লাইন ভাসায়, কোথাও আবার বিরাট বিরাট গাছ ঝড়ে-জলে ভাঙ্গিয়া ইঞ্জিনের গতিপথ রোধ করে। কখন, কোথায়, কি ভাবে ট্রেন থামিবে কে বলিতে পারে। হাজার সর্তকতা সত্ত্বেও মাঝ পথে, গভীর অরণ্যের মধ্যে ট্রেন থামিয়া যায় বৈকি! রাত-বিরাত বলিয়া কথা নাই ; যখন-তখনই তাহা সম্ভব। আরণ্যক পশুর আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তখন ইহারা কয়েকটি নিয়ম পালন করে। গার্ডদের কাছে থাকে এক ধরনের ক্ষুদে বেঁটে বন্দুক। তাহাতে শিয়াল কুকুরই মারা চলে তাহার বেশি কিছু নয়। তবে খোলা জায়গায় শব্দটা বেশী জোর হয়। আর শব্দের জন্যই তো এত ব্যবস্থা।

হীরা প্রথমটায় গার্ড সাহেবের কামরায় যাওয়ার জন্য যতটা ব্যগ্র হইয়াছিল সহযাত্রীর কথা শুনিয়া সে ব্যগ্রতা অনেকটাই ফিকা হইয়া গেল। উপরন্তু যাওয়ার উপায়ও যে নাই।

হীরা যেখানে বসিয়াছিল ঠিক তাহার বিপরীত দিকের বেঞ্চিতে হঠাৎ একটা অগ্নিশিখা কামরার অন্ধকারকে ঈষৎ ক্ষুণ্ন করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। নিমেষের মধ্যে আবার নিভিয়া যায়। শুধু জোনাকির মত একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতে থাকে। লোকটা নিশ্চয় বিড়ি ধরাইয়া ফুঁকিতে শুরু করিল। আজব লোক! ভয়-ডর বলিয়া যেন কিছুই নাই! দিব্যি একা এই কামরায় বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। কে এই লোকটা? নিমেষের আলোয় তাহাকে চেনা যায় নাই, স্ফুলিঙ্গের ক্ষীণ আভাতেও কিছু বোঝা গেল না।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হীরা বলে, 'কাঁহা যাওগে, জী?'

—বারবুয়া।

—বারবুয়া! ম্যায় ভি যাঁওঙ্গে। হীরা বুঝি আরও একটু নিশ্চিন্ত এবং সাহসী হইয়া ওঠে, 'ইয়ে গাড়ি কাল ফজিরমে খিদিরগাঁও পৌছ যায়গি না?'

—না।

—না—হীরার বিস্ময়োক্তি শোনা যায়।

না। তাহা সম্ভব নয়। লোকটি সহজ ভাবেই বুঝাইয়া দেয়, এ গাড়িকে আর খিদরগাঁও যাইতে হইবে না। যদি সত্য সত্যই ব্রিজ ভাঙ্গিয়া থাকে, লাইন জলে ডুবিয়া থাকে তবে এখন দু-চার দিন আর সামনের দিকে আগাইয়া যাইবার উপায় নাই। লাইন সারা হইলে তবে আবার গাড়ি চলাচল শুরু হইবে।

বৃত্তান্ত শুনিয়া হীরা গালে হাত তোলে। সে কি? দু চার-দিন এখন সে বাড়ি ফিরিতে পারিবে না। তবে? থাকিবে কোথায়? খাইবে কি? ওদিকে ছেলেমানুষ লছমী একা পড়িয়া আছে। হীরা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িতে থাকে।

ওপাশের লোকটা বুঝি জানালা খুলিয়া দিয়াছে। না কি, কামরাটাই এমন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। হু-হু করিয়া এত বাতাস আসে কোথা হইতে। জানালা খুলিয়া দিলেও বুঝিবার উপায় নাই। বাহিরের অন্ধকার আর কামরার ভিতরকার অন্ধকার হাতে হাত মিলাইয়া এক হইয়া গিয়াছে। জলস্রোতের সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা একটানা গর্জন করিয়া চলিয়াছে, থামে না; যেন কোনো কালেই থামিবে না।

ভোরের আলো ফোটে।

ফ্যাকাসে আলোয় বিনিদ্র-চোখ হীরা দেখে যে-লোকটার সহিত রাত্রে হীরা কথা বলিয়াছে সে আর কেহ নয় স্বয়ং ছোটকিমাতলার বড়সাহেব। অন্ধকারে না চিনিতে পারিয়া বড়সাহেবকেই সে যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই প্রশ্ন করিয়াছে; এমন কি যথোচিত সম্মানটুকুও দেখায় নাই। কিন্তু বড় সাহেব এ-কামরায় আসিল কি করিয়া!

খোলা জানালায় একটা হাত রাখিয়া সূর্যশংকর মাথা গুঁজিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত মানুষ যেমন ভাবে নিদ্রা যায় ঠিক তেমন ভাবেই।

ভোরের সাথে সাথে আবার কোলাহল জাগে। গার্ড সাহেব ও অন্যান্য যাত্রীরা নীচে নামিয়া পড়ে। হীরাও তাহার জানালাগুলি খুলিয়া দেয়।

জঙ্গলের মাঝেই গাড়ি থামিয়াছে। একটু পিছনেই জঙ্গলের একটা উত্তুঙ্গ খাড়াই। নীচু জমি পাইয়া হু-হু করিয়া জল নামিয়া আসিতেছিল। রাত্রে অন্ধকারে যাহা ব্রিজ বলিয়া অনুমান হইয়াছিল, সকালের আলোতে বোঝা গেল তাহা ব্রিজ নয়। জলধারার শব্দটাও নদীর নয়—জঙ্গল হইতে নামিয়া আসা জলপ্রপাতের। তবে হ্যাঁ—লাইনটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লোকজনের কথাবার্তা হইতে জানা গেল লাইন নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ঝাঁকুনির চোটে পিছনের কামরা আগের কামরা দুটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আগের কামরা দুটি কোথায়? যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও তাহার চিহ্ন নাই।

তবে ? সম্ভবত দুর্যোগের রাত্রে পিছাইয়া পড়া সাথীকে উদ্ধার করার আশা ত্যাগ করিয়া সামনের স্টেশনের উদ্দেশে গাড়িটা আগাইয়া গিয়াছে। যোগাড়-যন্ত্র করিয়া সকালেই খোঁজ লইতে আসিবে।

হীরা নীচে নামে না; গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর সব দেখে। তাহার রাত্রের সহযাত্রীদের দু-জনাকে নীচে ঘোরাঘুরি করিতে দেখিতে পায়। মাড়োয়ারী সেই ব্যবসাদার ছোঁড়াটা আর তাহার পাশে যে লোকটা ঘুমাইতেছিল সেই লোকটাকেও। অপর যাত্রী দুজনা নিশ্চয় আগের স্টেশনে নামিয়া গিয়াছে। হীরার কেন যেন হাসি পায়। বিপদ বুঝিয়া সকলেই কেমন না সরিয়া পড়িল! সেও তো ইহাদের সহযাত্রী ছিল। তাহাকে কেহই একবার ডাকিল না। হীরা কামরার মধ্যে বেঞ্চির দিকে তাকায়। মাড়োয়ারী ছোকরাটা তাহার গাঁটরী সমেতই সরিয়া পড়িয়াছে। কিছুই ফেলিয়া যায় নাই। সবাই পিটার সাহেব। বিপদ বুঝিলে সরিয়া পড়ে।

সূর্যশংকরের ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম-চোখে চারপাশটা একবার দেখিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসে। রুমালে মুখ মুছিয়া সামনে তাকায়। হীরাও তাকাইয়া আছে। সূর্যশংকর চিনিতে পারে; এই মেয়েটাকেই হাসপাতালে দেখিয়াছিল। গায়ের আলস্য ভাঙ্গিয়া সূর্যশংকর উঠিয়া দাঁড়ায়।

সূর্যশংকরকে দরজার দিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া হীরা পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়। হ্যাণ্ডেলে হাত আর ফুটবোর্ডে পা দিয়া নামিবার উপক্রম করিয়া সূর্যশংকর আর একবার ভাল করিয়া হীরাকে দেখিয়া লয়।

নীচে নামিয়া সূর্যশংকর সামনের দিকে পা বাড়ায়। কয়েকজন যাত্রীসহ গার্ড অনেকটা দূর পর্যন্ত আগাইয়া গিয়াছে। অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করিতেছে নিশ্চয়। ছাড়া-ছাড়া ভাবে আরও দুই চারিজন লাইনের পাশে এদিক ওদিক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সমস্ত জায়গাটা জল কাদায় ভরা। লাইনের পাশে ঢালু জমিটার উপর দিয়া তখনও জল বহিয়া যাইতেছে। সবেমাত্র সূর্য উঠিল। বর্ষণক্লান্ত, সিক্ত, নির্জন বনভূমির মাথায় গায় কাঁচা-সোনার রঙ। নাম-না-জানা পাখির কাকলি বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূর্যশংকর আপন মনে আগাইয়া চলে। যাইতে যাইতে ভাবে: আশ্চর্যই বটে! ছিল একই ক্যারেজের একাংশে, গদিওয়ালা আপার-ক্লাস কামরায়। দুর্ঘটনা ঘটার সময় সকলের মত সেও নীচে নামিয়া পড়িল। ছুটাছুটি হৈ-চৈ করিয়া লোকগুলি সব গিয়া ঢুকিল গার্ডের গাড়িতে। আর সে ওই বিরক্তিকর কোলাহল

হইতে সরিয়া নিশ্চিতে সময় কাটানোর জন্য আসিয়া ঢুকিল পিছনের কামরায়। ইচ্ছা করিয়া সূর্যশংকর আসে নাই। অন্ধকারে গাড়িতে উঠিবার সময় তাহার ভুল হইয়াছিল। ভুলটা অবশ্য বেঞ্চিতে বসার সাথে সাথেই ভাঙ্গিয়া গেল। কাঠ আর গদীর তফাৎ অন্ধকারেও যে বোঝা যায়। ভুল ভাঙ্গিল কিন্তু সূর্যশংকর নড়িল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। পাশেই হয়ত তাহার কামরা; অনেক আরামে বসা যাইত। কিন্তু তাহার কামরার পাশেই তো গার্ডের ভ্যান্। সেখানে ভীত ভেঁড়ার পালের মত কতকগুলা লোক একত্রে সারারাত চিৎকার করিবে। তাহা অপেক্ষা এই ভালো; এই নিস্তব্ধ শূন্য কামরা। কে জানিত শূন্য কামরার অন্ধকার হইতে সহসা আর একটি ক্ষীণ ভীতার্ত স্বর শোনা যাইবে, আর সূর্যশংকরকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাহস যোগাইতে হইবে অন্যকে।

বনলতা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল তেমনই আকস্মিক ভাবে চলিয়া গিয়াছে। আসার বেলায় যতটা নাটকীয়তা, যাওয়ার বেলায়ও ততটা প্রায়। বরং বেশিও হইতে পারে। যেভাবে ছোটকিমাতলা হইতে বিদায় লইল তাহাতে মনে হয় গভীর বেদনা, অভিমান এবং ব্যর্থতার গ্লানি বনলতার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ সৌজন্য, ভবিষ্যতের চিন্তা কিছুই আর বিবেচনা করার ছিল না। বরং এই ভাবে চলিয়া যাওয়ায় তবু যেন তাহার সম্মান কিছুটা বাঁচিল; সূর্যশংকরকেও খুব রূঢ় একটা আঘাত দেওয়া গেল।

অমরকে সঙ্গী করিয়া সূর্যশংকর সেই যে জঙ্গলে গিয়াছিল, নৈশ অভিযান শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল পরদিন বিকালে। বাংলোয় পা দিতেই জানা গেল বনলতা চলিয়া গিয়াছে।

না, বিদায়কালীন দুর্বলতার কোনো চিহ্নই কোথাও নাই, একটা চিঠি বা চিরকুট কিছুই না। বাহাদুরের মুখেই শুধু সংবাদটা রাখিয়া গিয়াছে।

বাহাদুরের কাছ হইতেই জানা গেল, মাজী সকালেই তাহাকে লোকের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। বাহাদুর অফিসে গিয়া কুলি ডাকিয়া আনে। দুপুরের একটু পরেই তিনি বাক্স ও সুটকেস লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। বিছানাও।

বিকালের ট্রেন ছাড়ার তখনও যথেষ্ট দেরি ছিল। ওই একটিই তো যাওয়ার গাড়ি। অমর তখনই স্টেশনে যাইতে চাহিয়াছিল, তাড়াতাড়ি পৌঁছাইতে পারিলে স্টেশনে বনলতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

সূর্যশংকর কোনো রকম আগ্রহ বা উৎসাহ কিছুই দেখায় নাই। বরং নিরুত্তাপ গলায় বলিয়াছিল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বুঝলে ও থাকত, দেখা করে যেত। দরকার থাকলে সঙ্গে করে নিয়েও যেত তোমাকে।'

—তোমার সঙ্গে যাই হোক, আমাকেও কিছু না জানিয়ে এ-ভাবে চলে যাওয়ার কি মানে? অমর খুবই ব্যথিত হইয়াছে বোঝা গেল।

—মানে আর কি, তোমার সঙ্গে দেখা করাটা এড়াতে চাইছে।

—এড়াতে চাইছে! কেন? অমর রীতিমত বিস্মিত হয়।

—কি করে বলবো বল। সূর্যশংকর হাতের সিগারেটটা ছাইদানিতে ফেলিয়া দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যায়।

অমর তবু সেই ক্লান্ত শরীর, উস্কোখুস্কো বেশবাসেই স্টেশনে যাওয়ার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বনলতার এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ সে কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই। একা, নিঃসহায় ভাবে বনোদি কোথায় চলিয়া যাইতেছে। কলকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তাহার অন্য কোনো পথ তো নাই। অমর অনেক আগেই এ-প্রস্তাব বনলতাকে জানাইয়াছে। বনলতা তখন মাথা হেঁট করিতে চায় নাই। সে সঙ্কল্প আজ ভাসিয়া গিয়াছে।

বনোদির ওপর অমরের অসম্ভব রাগ হইতেছিল। এবং অভিমানও। সূর্যদার ব্যবহারও অমরের পছন্দ হয় নাই। অসহায় অবস্থায় বনোদি কোথায় গেল তাহার সামান্য একটা খোঁজ পর্যন্ত লওয়ার আগ্রহ তাহার নাই। অদ্ভুত মানুষ।

দ্রুত পায়, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে দু মাইলের উপর রাস্তা হাঁটিয়া আসার পর হঠাৎ অমরের মনে হইল, বনোদি যদি তাহাকে সঙ্গে লইতে চায়—তবে?

কথাটা মনে পড়িতেই অমরের পা যেন আর নড়ে না। ছোটকিমাতলা ছাড়িয়া যাওয়া কিছু নয়, কিন্তু বারনুয়া স্টেশন—? পদ্মকে ছাড়িয়া যাওয়ার চিন্তাটুকু পর্যন্ত এখন অসহ! পদ্ম ছাড়া অমরের মন বিরাট এক শূন্যতা বই আর কিছু না।

অমর চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিল। আরও কথা, আরও অনেক প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। বনোদির সঙ্গে স্টেশনে সাক্ষাৎ হওয়াটাই এখন খারাপ। হেমন্তবাবু, পদ্ম ইহাদের চোখে দৃশ্যটা না পড়িবে এমন নয়। তাহাদের স্বাভাবিক সহজ প্রশ্নগুলির জবাবই বা অমর কি করিয়া দিবে। পদ্মর কাছে বনোদির গল্প যতটা করিয়াছে—তাহার মধ্যে কোথাও বনোদির অসম্মান নাই, বেদনা হয়ত আছে। কিন্তু এখন যেন কিছু বলিতে যাওয়াও লজ্জার। সূর্যদা এবং বনোদির সম্পর্কের সত্যটা সকলের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

নিজের মনের অবস্থাটা এবং বনোদির কথা ভাবিতে ভাবিতে সময় বহিয়া গেল। দূরে স্টেশন হইতে গাড়ি ছাড়ার সিটির শব্দটা ভাসিয়া আসিল।

ছায়াময় দূর স্টেশনের অস্পষ্ট ছবিটার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল অমর। ফিরিয়া চলিল। স্টেশনের দিক হইতে একটা গুরুগুরু শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে।

সেই যে বনলতা চলিয়া গিয়াছে তাহার পর মাস দেড়েক হইতে চলিল কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। আশ্চর্য! সামান্য একটা পত্র দিয়াও তো খবরটা দেওয়া যাইত। হয়ত বনোদি তাহাদের সহিত সম্পর্কটা চিরকালের মতন ইতি করিয়া দিয়াছে। অমরের তাহাই ধারণা। বহুবার অমরের ইচ্ছা হইয়াছে, কলকাতার ঠিকানায় বনোদিকে একটা চিঠি দেয়। কি ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত আর চিঠি দেয় নাই। হয়ত ভাবিয়াছে, বনোদির যদি গরজ না থাকে, তাহারই বা গরজ কিসের।

দীর্ঘ দেড়মাস পরে বনলতার একটা চিঠি পাওয়া গেল। সূর্যশংকরকে নয়, অমরকেই লিখিয়াছে।

চিঠি পড়িয়া অমর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আর কথা বলিতে পারিল না। তারপর চিঠিটা সূর্যশংকরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'বনোদি এখন নাগপুরে।'

—কলকাতায় ফিরে যায়নি তবে। সূর্যশংকর চিঠি লওয়ার জন্য হাত বাড়ায় না। তাহার আগ্রহ উৎসাহ কিছু আছে বলিয়া মনেও হয় না।

চিঠিটা একটা চামচে চাপা দিয়া অমর একটুক্ষণ সূর্যশংকরের দিকে অপলকে তাকাইয়া থাকে।

সূর্যশংকর নিশ্চিন্তে নির্বিকার মনে রাত্রের খাওয়া খাইয়া চলিয়াছে। এতটুকু চাঞ্চল্য নাই।

—চিঠিটা বোধ হয় তুমি পড়বে না? অমর অসহিষ্ণু, অসন্তুষ্ট গলায় শুধায়। রুটি আর মাংসের প্লেটটা টানিয়া লইয়া আবার বলে, 'এতটা রুড্ হওয়া তোমার উচিত নয় সূর্যদা।'

—কি বলছ পাগলের মতন! সূর্যশংকর বড় চামচের ডগায় একটা পুরুষ্ট মাংস লইয়া নিজের প্লেটে রাখে; বলে, 'আমার যে-ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কেন?' একটু চুপ। তারপর যেন অমরকে সান্ত্বনা দিতেই, বলে, 'তোমায় চিঠি লিখেছে তুমিই বলো ওর খবরাখবর।'

অমর প্রথমটায় জবাব দেয় না—পরে বলে, 'চিঠিটা খুব বড় নয়। অনেক কথাও কিছু লেখে নি। নিছক খবর বলতে শুধু, বনোদি নাগপুরে তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। তারপর তার চেষ্টায় ওখানকার গার্লস স্কুলে একটা মাস্টারী যোগাড় করে নিয়েছে—আজ কদিন হল। ভাল আছে।'

সূর্যশংকর অমরের কথা বলার ধরন দেখিয়া হাসিয়া ফেলে। 'তা খবর তো ভালোই।'

অমর কোনো জবাব দেয় না—আপন মনে খাইতে থাকে।

—নাগপুরে বনোর কোন বন্ধুর বাড়ি উঠেছে লিখেছে কি? একজন তো ছিল জানি, কমলা। কলেজের বন্ধু। কমলার স্বামী ওখানকার কলেজে পড়ায়।

—কমলার কথাই লিখেছে। অমর মুখ তুলিয়া বলে।

—তবে তো আর কোনো চিন্তাই নেই। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। তোমার বনোদির কর্ম এবং আশ্রয় দুই-ই জুটে গেছে।

কথাটা অবশ্য সত্য। কিন্তু বনলতার অতীত সম্পর্কে যাহার সামান্যতম জ্ঞান আছে—সেও জানে এই তুচ্ছ একটা কর্মসংস্থান এবং মাথা গোঁজার কোনোরকম একটা আশ্রয় বনলতার কাছে ভাগ্যের পরিহাস বই আর কিছু নয়। সূর্যদা কি পরমানন্দে এই পরিহাসটাই করিতেছে।

অমর নীরব। অন্যমনস্ক ভাবে বনলতা সংক্রান্ত আর পাঁচটা কথা ভাবিতেছে।

খাওযার পাট চুকিয়া যাইবার পর টেবিলের দু-পাশে দুই অসমবয়সী বন্ধু সিগারেট ধরাইয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিল।

—একটা কথা বলব সূর্যদা? অমর সহসা শুধায়।

—বলো।

—তুমি সত্যি সত্যি বনোদিকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

—এর আগেও এই একই কথা তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে অমর।

—হ্যাঁ, কিন্তু জবাবটা তুমি এমন ভাবে দিয়েছিলে যে আমার মনে হয়েছিল সেটা নেহাতই ওপর-ওপর কথা।

—ওপর ভেতর বলে আমার দু-রকম কিছু নেই অমর। অবশ্য ভেতরের যতটুকু আমার জ্ঞানে আছে। অজ্ঞানে কি আছে না আছে জানি না।

সূর্যশংকর যে এখন আর তরল মনে কথা বলিতেছে না, অমর অনুভব করিতে পারে। সূর্যশংকরের মনের কথা জানার এই একটা সুযোগ। ভীষণ একটা কৌতূহল এবং আক্রোশ যেন পাশাপাশি অমরের মাথায় দাপাদাপি শুরু করে।

—তুমি তাহলে মানুষ নও। অমর আচমকা বলে। 'মানুষের ওপর ভেতর কখনও এক হতে পারে না। না, তার অজ্ঞানে তো নয়ই, জ্ঞানেও নয়।

—কেন ?

—এই তার স্বভাব, তাই।

সূর্যশংকর অমরের তর্কজটিল মুখভাবটা লক্ষ্য করে। 'বই পড়া কথা বলছ অমর।'

—না, আমি জানি।

—ব্যক্তিগত ভাবে জানো ?

—হ্যাঁ। অমর মুখ ফিরাইয়া দেওয়ালের দিকে তাকায। পদ্ম যেন ওই অন্ধকারে বাতাসের মত অদৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এবং অমরের কথা সাগ্রহে শুনিতেছে।

একটু নীরবতা। সূর্যশংকর একটা সিগারেট শেষ করিয়া আর-একটা ধরায়। বলে, 'তোমার অভিজ্ঞতা কী আমি জানি না, অমর। তবে আমার কথা আমি যা বলছি তাতে কোনো লুকোচুরি নেই। স্বভাব থেকে সমস্ত লুকোচুরি বাদ দেবার চেষ্টা আমি বরাবর করে এসেছি। ভালো মন্দ আমার কাছে কোনো বিচার নয়, একমাত্র বিচার নিজের কাছে সিনসিয়ার হওয়া।

অমরের কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব আসে। কেন ? লুকোচুরি বাদ দেওয়ার কথায় হঠাৎ এত ভয় পাওয়ার তাহার কি আছে ?

আছে। অমর যে এই লুকোচুরির খেলায় অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে তাহার ধারণাটা তো সস্তলব্ধ। বই পড়া তত্ত্ব হইতে সমর্থন লওয়ার প্রয়োজন তাই পদে পদে।

—বনোদিকে সত্যিই তুমি আর ভালবাস না সূর্যদা ?

—না।

—ওর জন্যে তোমার মনে এতটুকুও জায়গা থাকল না ?

—থাকল, তবে সে-জায়গা অন্য রকম কিছু না, জানাশোনা মানুষের জন্য যেমনটা থাকে—তেমনি।

সূর্যশংকর এবার উঠিয়া পড়ে। একটু পায়চারি করে। দু-একবার কাশে। তারপর বলে, 'সোজা কথাটা বড্ড বেঁকা করে বোঝাই তোমাদের অভ্যেস। তুমি বনোকে ভালো করেই চেন অমর। তার স্বভাব অজানা নয় তোমার। কলকাতা শহরের সভ্য শালীন ফিটফাট আধা-ফিরিঙ্গী আধা-হিন্দু বাঙালী মেয়ের যে টেমপারামেণ্ট—তার সঙ্গে আমার মিল হয় না কোথাও। মনের মিল যদি পদে পদে হোঁচট খায় তবে আর মিলের দরকারটা কি ? সূর্যশংকর

আবার একটা সিগারেট ধরায়, 'বিয়ে করে ওর সঙ্গে কিছুদিন তো আমার কেটেছে। বড় অশান্তিতে ছিলাম অমর। ছোট অশান্তি আমার ভালো লাগে না। আমি অনেক বড় অশান্তির ভক্ত।'

বাহাদুর আসিয়া জানাইল, বাথরুমে জল দেওয়া হইয়াছে। রাত্রে শুইতে যাওয়ার আগে অর্ধ-উষ্ণ জলে স্নান করা সূর্যশংকরের এক অদ্ভুত অভ্যাস।

সূর্যশংকর উঠিয়া পড়ে।

ঈষদুষ্ণ জলে দেহটা ডুবাইয়া দিয়া সূর্যশংকর বনলতার কথাই ভাবিতেছিল।

আজ হইতে প্রায় বছর ছয়েক আগের ঘটনা। বনলতার তখন বিবাহ হয় নাই। কলেজে পড়ে, স্নেহান্ধ পিতার বক্ষপুটে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটায়। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই। গান গায়, উপন্যাস পড়ে, চায়ের নিমন্ত্রণে যোগ দেয়, বন্ধু-বান্ধব লইয়া গল্প করে। বনলতার মধুচক্রে যাহারা মৌমাছি হইয়া মধু আস্বাদনে ঘোরা-ফেরা করিত, সুকুমার ছিল তাহাদের অন্যতম। নিরীহ, গোবেচারী, ভালোমানুষ। এ-হেন সুকুমার আর সূর্যশংকর ছিল সহপাঠি। উভয়েই বিজ্ঞানের ছাত্র। সূর্যশংকর থাকিত হোস্টেলে। তাহার পিতা তখন জীবিত—রেঞ্জার্সের অফিসার—আসামের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান। সুকুমার ও সূর্যশংকরের প্রকৃতিতে আকাশ-পাতাল তফাত। তথাপি কেমন করিয়া না জানি নিরীহ সুকুমারের সহিত অস্থির অশান্ত সূর্যশংকরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সুকুমারের মারফতে বনলতার সহিত সূর্যশংকরের আলাপ পরিচয়। সে-আলাপ ক্রমশই যখন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন সুকুমার একদিন বলিয়া বসিল, 'বনোকে কি তুই বিয়ে করবি, সূর্য?' 'বিয়ে?' সূর্যশংকর হাসিয়া ফেলিয়াছিল। সুকুমার সে-হাসিতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল, 'বিয়ে যদি না করিস তবে অত মেলামেশা করিস কেন? তোদের নামে লোকে যা-খুশি বলছে।' সূর্যশংকর আরও মজা পাইয়া বলিয়াছিল, 'তাই নাকি, কি রকম?'…'কি রকম আবার, অত্যন্ত জঘন্য রকম।' কথাটা শুনিয়া সূর্যশংকর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বলিতে পারে নাই। মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সূর্যশংকর পরে বলিয়াছিল, 'ও, আচ্ছা ধরো যদি বিয়ে করি।' ,'করতে পারো—' সুকুমার বলিয়াছে, 'কিন্তু তার আগে তোমার চরিত্রদোষ সংশোধন করা প্রয়োজন।' চরিত্রদোষ বলিতে

সুকুমার কি ভাবিয়াছিল কে জানে তবে সূর্যশংকর সরাসরি বনলতার কাছে গিয়া বলিয়া বসিল, 'তোমার বন্ধুরা আমাদের নামে কুৎসা রটনা করছে। সুকু বলে, এ অপযশ ঘোচাতে হলে আমার উচিত তোমায় বিয়ে করা। আমি অবশ্য তোমার অপযশ চাইনে, কিন্তু তোমায় বিয়ে করতে চাই শুনলে আমার নামে তখন যে-সব কথা উঠবে তা কি তুমি অবজ্ঞা করতে পারবে! কেউ বলবে আমি প্রচণ্ড মদখোর, কেউ বলবে স্ত্রীলোকের প্রতি আমার অসীম দুর্বলতা।'

সূর্যশংকরের কথা শুনিয়া বনলতা স্তম্ভিত। লোকটার অসভ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া রাগে যে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সূর্যশংকর আর একদিন বলিয়াছিল 'দেখ, আমি মিথ্যাবাক্য বলি না। সভ্য শহুরে ছেলে নই। শহর আমার পছন্দসই জায়গাও নয়। উত্তরকালে সভ্য জগৎ থেকে সরে গিয়ে কয়লার দেশে বাসা বাঁধবো। সে সব তোমার সইবে তো? ভালো করে ভেবে দেখ।

বনলতা সময় চাহিয়াছিল। সূর্যশংকর সময় দিয়াছে। বনলতা যথেষ্ট ভাবিয়াছিল বোধ হয়। তবু সূর্যশংকরের আকর্ষণটা কেন যে ত্যাগ করিতে পারে নাই, কে জানে। খেয়ালের বশে বিবাহ করিয়া বসিল। অথচ বিবাহের পরে ক'মাস কাটিতে না কাটিতেই বনলতা অনুভব করিল সূর্যশংকর স্বামী হিসাবে অপাত্র, অযোগ্য।

ইহার পর কিছুকাল উভয়ের মধ্যে অশান্তি, মনোমালিন্য। বনলতাই একদিন স্বামী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তারপরও বহু পত্র লিখিয়াছে বনলতা। সমস্ত পত্রতেই সেই একই কথা—একই উপদেশ। সূর্যশংকরের মত শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান. ভদ্রযুবকের কি হওয়া উচিত—কিসে তাহার চরিত্রের উন্নতি হইবে, স্বভাব পরিবর্তিত হইবে—তাহারই দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা। সূর্যশংকর মনে মনে হাসিত। পত্রেব কোন উত্তর দিত না। অবশেষে একদিন বনলতা জানাইল, 'তোমার আমার সম্পর্কের এখানেই শেষ হল। আমার জীবন নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলতে পারব না। তোমার ওপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভালবাসা কিছুই আর আমার নেই। সঙ্কোচবশত কথাটা তোমায় এতোদিন জানাতে পারি নি।'

পুরানো ঘটনাটা মনে মনে ভাবিয়া সূর্যশংকর আপনমনেই একটু হাসে। কত সহজে এবং অনায়াসে একজনের উপর ইহাদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা

জাগিয়া ওঠে, আবার কত সহজেই নষ্ট হয়। নষ্ট হইয়াও শেষ নয়, আবার আচমকা হারানো জিনিস ফিরিয়া পাওয়ার মতন সব ফিরিয়া আসে। স্বভাবের আর মনের কী আশ্চর্য কৃত্রিমতা। ইহাই সভ্যতা! বনলতা সভ্য মানুষ!

*

নিস্তব্ধ নির্জন ঘরে অমর শুইয়া থাকে। মনের মধ্যে যে আশংকা অনেকবারই উঁকি মারিয়া গিয়াছে, সেই আশংকাই এবার বুঝি সত্য হইল! আশংকা করা এক, আর ঘটনা যখন ঘটে তখন তাহাকে গ্রহণ করা আর এক কথা।

অমর বিছানা ছাড়িয়া ওঠে। পায়চারি করে। সিগারেট ধরায়।

ওকি! সচকিত হইয়া অমর দালানের দিকে তাকায়। শব্দটা কিসের? ওই তো—আবার। বমির শব্দ না! পদ্ম বমি করিতেছে? অমর তাড়াতাড়ি দালানে আসে। রান্নাঘরের সামনে নালিতে বসিয়া পদ্ম বমি করিতেছে। অমর নীচু হইয়া পদ্মকে ধরে। ইঙ্গিতে পদ্ম তাহাকে সরিয়া যাইতে বলে। অমর নড়ে না।

আরও বার কয়েক বমি তোলার বিকৃত শব্দ ও ভঙ্গি করিয়া পদ্ম উঠিয়া দাঁড়ায়। বিরক্তি জানাইয়া বলে, 'যাও না। তুমি ঘরে যাও।'

অগত্যা অমরকে ঘরে ফিরিতে হয়। ঘর হইতেই অমর শোনে, পদ্ম ঘটি ঘটি জল ঢালিয়া মুখ হাত ধুইতেছে।

পদ্ম যখন ঘরে ঢুকিল তখন আর তাহার পরণে আগের শাড়ি নাই; মুখে চোখের সে ভাবটাও নাই। মুখে কপালে চুলে জল। টেবিলের কাছে আসিয়া পদ্ম চেয়ারে বসে। মুখ হাত মোছে; চুলটা ঠিক করিয়া লয়।

পদ্মকে বড়ই ক্লান্ত দেখায়। অমর বলে, 'তুমি একটু শোও না।'

—হ্যাঁ শুই! পদ্ম বিছানার দিকে তাকায়। তাহার চোখের দৃষ্টিতে গভীর ক্লান্তি; গলার কাছে দুটি সুস্পষ্ট নীল শিরা, কণ্ঠনালীটাও যেন ফুলিয়া রহিয়াছে।

পদ্ম বিছানার কাছে আসিয়া বলে, 'সরো, একটু শুই। তুমি ততক্ষণ চেয়ারে গিয়ে বোসো।'

—শোও না তুমি, আমি বরং মাথা টিপে দি।

—থাক্, কিছু করতে হবে না। যাও তো, যা বলছি শোনো, চেয়ারে গিয়ে বোসো।

অমর চেয়ারে আসিয়া বসে। পদ্ম হাত, পা, মুখ, গুঁজিয়া কুঁকড়াইয়া কাত হইয়া শোয়। পেটের তলায় একটা বালিশ আঁকড়াইয়া ধরে।

অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা বলে না। অবশেষে অমরই প্রশ্ন করে, 'হঠাৎ বমি হলো যে ?'

কোন উত্তর নাই। পদ্ম যেন অমরের কথা শুনিতেই পায় নাই। মুখ আড়াল দিয়া তেমনি ভাবেই সে শুইয়া থাকে।

—কি, জবাব দাও না কেন ?

এবার পদ্ম মুখের আড়াল সরায়। বলে, 'কি'

—শুনতে পাও নি ? বলছি, হঠাৎ বমি কেন ?

—হঠাৎ নয়।

—মানে ?

—মানে আবার কি ? বমির আবার কেন কিসের ? আজকাল নিত্যিই হচ্ছে।

পদ্ম যতটা সহজ সুরে কথাটা বলে অমর কিন্তু ঠিক ততটা সহজ ভাবে কথাটা গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্বিগ্ন হইয়াই অমর বলে, 'সে কি, রোজই বমি করো ?'

মাথা নাড়িয়া পদ্ম হ্যাঁ জানায়

—কি আশ্চর্য, এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

—জানি।

—জানো তো কি করেছ ?

—তোমায় বলেছি। ব্যবস্থা একটাই করার আছে। এবার তোমার যা করার করো।

অমর অবাক। বুঝিতে পারে না, পদ্ম তাহার সহিত কিসের হেঁয়ালি শুরু করিয়াছে। অথচ দুটি পেলব কমনীয় বাহুর উপর যে পরিচ্ছন্ন সুশ্রী ক্লান্ত মুখটি ফুটিয়া রহিয়াছে তাহার কোথাও এতটুকু রহস্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজ, সরল সুরে পদ্ম যে কথাগুলি বলিতেছে তাহার মধ্যে কোথাও অন্তত পদ্মর ইচ্ছাকৃত গোপনতা অবলম্বনের প্রয়াস নাই। অমরের কেমন যেন ভয় হয়। এতক্ষণ যে আশংকাটা মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল এবার যেন তাহা স্থির পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে।

—আমায় তুমি কি বলেছো ? আর যা বলেছো তা তো অন্য কথা।

—একই কথা। পদ্ম বিছানার উপর উঠিয়া বসে। খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল ঠিক করিতে থাকে।

অমরের মুখের ভাবটা এবার সম্পূর্ণভাবেই বদলাইয়া যায় মুখটা তাহার বিবর্ণ হইয়া ওঠে। ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে অমর তাকাইয়া থাকে, যেন একটা আক্রমণোদ্যত হিংস্র পশুর দিকে চাহিয়া আছে। বিচ্ছিন্ন-ওষ্ঠ, নির্বাক, নিস্পন্দ।

পদ্ম বিছানার কিনারায় সরিয়া আসে। অমরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহারও কেমন যেন ভয় হয়।

—কি হলো ?

অমর তবু নির্বাক। পদ্ম বিছানা হইতে নামিয়া আসে। অমরের কাঁধে নাড়া দিয়া বলে, 'আ, কি যে করো ছেলেমানুষের মতন! অমন করছো কেন ? বলো না, কি হয়েছে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমর কেমন যেন বুকচাপা স্বরে জবাব দেয়, 'এই জন্যেই বুঝি এখানকার সব পাট তুলে চলে যেতে চাও।'

পদ্ম কোনো কথা বলে না। শুধু নীরবে অমরের মাথাটা নিজের বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া তাহার মাথার চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে থাকে।

—বুঝলাম। কিন্তু—

—কি কিন্তু ?

—এ কি উচিত হবে ? 'উচিত' কথাটা দুজনারই কানে লাগে। অমর তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া বলে, 'না, মানে তা কি ভালো হবে ? এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা—'

—অন্য আর কি পথ খোলা আছে ?

অমর একটু ভাবে। বলে, 'ধরো যদি থাকে।'

—অন্য আর কিছুতেই আমি রাজী নই। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বর পদ্মর। খানিক পরে আবার বলে, 'আমার তরফ থেকে কোনো অন্যায়ই আমি করছি না। বরং অনেক সহ্য করে পরকে সুখী করার চেষ্টা করেছি এতোকাল। আমার কথা কে ভেবেছে বলো ? নিজের জন্যে—এখন যদি কিছু চাই, তার মধ্যে দোষটা কিসের ? আমি কি সিঁদুর-লেপা সংসারের জাঁতা ? কথার শেষের দিকটা পদ্মর গলার স্বর আবেগে উত্তেজনায় থরথর করিয়া কাঁপিতে-

ছিল। উদ্গত অশ্রু-বন্যায় তাহা রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কথা থামিলে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অমর অল্প কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলে,—'কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে কোথায়? আমার যে চালচুলো নেই।'

—এবার একটা চালচুলোর ব্যবস্থা করো।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। অমর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'হেমন্তদা এলেন! আমি—আমি যাই।'

—না, যাবে কেন? বসো। পদ্মর গলায় কঠিন আদেশের সুর।

অমর বসিয়া থাকে। পদ্ম সদর খুলিতে যায়। একটু পরেই হেমন্তবাবু ও পদ্ম ঘরে ঢোকে।

—এই যে ভায়া, এখনও আছো দেখছি। হেমন্তবাবু কোটটা আলনায় রাখিতে রাখিতে হাসেন।

—হ্যাঁ; আপনার যে আজ এতো দেরি?

—মাষের শেষ। কতকগুলো সরকারী কাগজ পাঠাবার ছিলো। স্টেশনই না হয় ক্ষুদে তা বলে কাজ কি কম ভাবো নাকি? হেমন্তবাবু বিছানার উপর আসিয়া বসেন।

অমর হেমন্তবাবুকে দেখিতে থাকে। অদ্ভুত লোক। না কি, লোকটা বাস্তবিকই বোকা। কিছুই দেখে না, বোঝে না, সন্দেহ করে না, বলে না।

—আমি আজ উঠি; বেশ রাত হলো।

—উঠবে আর কোথায়? আবার অতোটা পথ হাঁটবে। তার চেয়ে থেকেই যাও রাতটা। এক হাত খেলা যাক্।

—না না, বাড়িতে আবার ভাববে।

—বাড়িতে ভাববে? হেমন্তবাবু হঠাৎ সশব্দে হাসিয়া ওঠেন; 'বাড়িতে তোমার আছেটা কে হে যে ভাববে? তোমার সেই দিদি তো কবেই চলে গেছেন? আর আমাদের চৌধুরী সাহেব? তাঁকে এই তো স্টেশনে দেখে এলাম।'

—সূর্যদাকে স্টেশনে দেখলেন? কখন?

—এই তো একটু আগে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় চললেন। হেসে বললেন, এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। তা হ্যাঁ হে ভায়া, একটা কথা

শুনছিলাম, সেদিন ঘোষে সাহেব এসেছিলেন স্টেশনে তাঁর কাছেই। চৌধুরী সাহেব নাকি ছোটকিমাতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?

—তা জানি না। তবে ছেড়ে দিতেও পারেন।

—হঠাৎ?

—মালিকদের সঙ্গে গোলমাল।

অমর উঠিয়া পড়ে। বলে, 'আজ আর আড্ডা মারবো না হেমন্তদা, চলি। একটু পা চালিয়ে গেলে সূর্যদাকে ধরে ফেলতে পারবো।'

—যাচ্ছো যাও, দেখো যদি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গ ধরতে পারো। না পেলে ফিরে এসো।

—দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক চলে যাবো।

—দুশ্চিন্তা কি আর সাধে হয়, ভায়া। পাহাড়ি পথ-ঘাটের অবস্থা যে এখন ভালো নয়। কি বলো, ছোট বৌ! হেমন্তবাবুর পদ্মর ভাবান্তরহীন মুখের দিকে তাকাইয়া বলেন।

হেমন্তবাবুর কথার সুরে শ্লেষ নাই তথাপি কথাটা কানে শুনিতে ভালো লাগে না। অমর ও পদ্ম দুজনাই হেমন্তবাবুর দিকে তাকায়; কেহ কোনো কথা বলে না। একটু অপেক্ষা করিয়া অমর টেবিলের উপর হইতে নিজের টর্চটা তুলিয়া লয় এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাহির হইয়া যায়। যাইতে যাইতে শোনে পদ্ম বিদ্রূপের সুরে হেমন্তবাবুকে বলিতেছে, 'হলেই বা কি যায় আসে তোমার। তুমি কি আর ছোট বউয়ের ভাবনার ভাগ নেবে? না, সারারাত বুক-পিঠে মালিশ করার বায়নাটা কমিয়ে তাকে দুদণ্ড ভাববার সময় দেবে?'

—আহা হা, রাগ করো কেন? তোমার ভাবনার ভাগ কি আর আমি নিতে পারি? হেমন্তবাবু হাসিতে হাসিতে জবাব দেন।

বাহিরে আসিয়া অমর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। হেমন্তবাবুর চোখের সামনে প্রাণহীন একটা পদার্থের মতনই সে বসিয়া ছিল; বিমূঢ়, বিচলিত-অন্তর। গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত গলার কয়েকটা বাঁধাধরা আওয়াজ তুলিয়া অমর কোনরকমে সৌজন্যটুকু রক্ষা করিয়াছে। ইস্, এই ঠাণ্ডাতেও তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম জমিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসটাও স্বাভাবিক নয়; বুকে যেন কিসের ভার। চেষ্টা করিয়াও সে ভার লাঘব করা যায় না। কান, চোখ, মুখ জ্বালা করিতেছে। কোথায় যাইবে—কাহার কাছে, কি উদ্দেশ্যে—কোনো কথাই এখন আর মনে পড়ে না।

অল্প একটু হাঁটিয়া আসিবার পর পাথরে হোঁচট খাইয়া অমর সম্বিত ফিরিয়া পায়। তাই তো, হাতে টর্চ তবু অন্ধকারে বেহুঁশের মত সে কোথায় চলিয়াছে! টর্চ জ্বালিয়া অমর পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা অনুভব করিবার চেষ্টা করে। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরায়। চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। একবার রেল কোয়ার্টারের দিকেও ফিরিয়া তাকায়।

রাত্রি হইয়া আসিতেছে। এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে কোনো লাভ হইবে না। পাওয়ার হাউসের দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসাই ভালো। সূর্যশংকর বোধ হয় আগরওয়ালার বাংলোয় গিয়াছে। এ-তল্লাটে আর কে আছে সূর্যশংকরের বন্ধুজন? আর কাহারও নাম মনে পড়ে না।

সামান্য কিছুটা আগাইয়া আসিতেই সামনে বাঁ হাতে যে কুটিরখানি চোখে পড়ে অমর সে-দিকে একবার টর্চের আলো ফেলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কে যেন দরজা খুলিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়ায়। অমরের টর্চের আলো লোকটার গায়ের উপর পড়িয়াছে। কে? অমর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ওঠে। এই কুটিরটির সহিত বিশেষ একটা রহস্য-ইতিহাস নানা ভাবে জড়িত। অমর নিছক কৌতূহলের বশেই সেই মূর্তিটির মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে। পরক্ষণেই অদম্য বিস্ময়ে ডাক দেয়, 'সূর্যদা—।'

সূর্যশংকর দাওয়ার উপর হইতে সাড়া দেয়—'কে, অমর নাকি?'

—হ্যাঁ, আমি।

—ও, দাঁড়াও আসি।

সূর্যশংকর নামিয়া আসে। কাছে আসিলে অমর বলে, 'আমি তোমার খোঁজে আগরওয়ালার বাংলোর দিকে যাচ্ছিলুম।'

—আগরওয়ালা এখানে নেই। ছিঁদোয়াড়া গিয়েছে। আমার কথা তোমায় কে বললো, মাস্টারমশাই বুঝি?

—হ্যাঁ, তা তুমি হঠাৎ ওখানে? অমর কেমন যেন একটু সংকোচ জানায়।

—জায়গাটা নতুন তাই। সূর্যশংকর কৌতুকভরা স্বরে হাসে, 'মেয়েটার নাম হীরা। হীরেই বটে দুষ্প্রাপ্য এবং মহার্ঘ।'

অমর নিরুত্তরে সূর্যশংকরের সহিত পথ চলে। সূর্যশংকরকে হীরার কুটিরে দেখিয়া সে যে পরিমাণ না বিস্মিত হইয়াছিল শেষের কথাগুলি শুনিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক বিস্মিত হয়। 'জায়গা নতুন'—এ কথার অর্থ কি?

সূর্যশংকর কি এখানে পূর্বে কখনো আসে নাই, হীরাকে দেখে নাই। সংকোচের সম্পর্ক নয় তথাপি অমর খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করে, 'ও না বহুকাল ধরে এখানে আছে!'

—তাই তো শুনলাম। আগে কখনো দেখি নি।

অমর মনে মনে ভাবে, এ-অঞ্চলের বাসিন্দারা হীরাবাঈকে তো চেনেই—উপরন্তু তাহার নাড়ি নক্ষত্রের পর্যন্ত খোঁজ রাখে। আর এখানে এতকাল থাকিয়া তোমারই ভাষার 'মহার্ঘ' বস্তুটিকে চোখে দেখিলে না। অবাক হইবার মতই কথা বটে।

—মেয়েটা বাস্তবিক সুন্দরী। অমর বলে, 'তবে শুনেছি খুব ফেরোসাস।'

সূর্যশংকর কোনো জবাব দেয় না। মনে মনে বোধ হয় হাসে।

মুখ বুজিয়া উভয়েই পথ অতিক্রম করিতে থাকে। সূর্যশংকরকে দেখার পর অমর মনে মনে কেমন যেন একটু সান্ত্বনা পায়। আত্মঅপরাধ স্খলনের মত ক্ষীণ একটা যুক্তির সান্ত্বনাই হইবে বোধ হয়। নীতি, দুর্নীতি, ন্যায়, অন্যায়—মনে মনে অমর আত্মসমর্থনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তি শানাইতে থাকে। অথচ কে যে তাহার প্রতিপক্ষ সে নিজেই জানে না! হেমন্তবাবু? এখন পর্যন্ত হেমন্তবাবু কোনো কথাই বলেন নাই। এমনও হইতে পারে, এ জীবনে হেমন্তবাবু অমরকে বলার মত কোনো অভিযোগই সংগ্রহ করিতে পারিবেন না; শুধু পদ্ম, পদ্ম যদি একটু চতুর ও সতর্ক হইতে পারে। অমর সে-চেষ্টাই করিবে। পদ্মকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া রাজী করাইতে হইবে। হেমন্তবাবুই পিতৃত্বের মর্যাদাটুকু উপভোগ করুন, অমর তাহাতে বাদ সাধিতে যাইবে না। আর পদ্ম একান্তভাবে যাহা চাহিয়াছে, তাহা তো পাইলই। তবে আর এ নির্বুদ্ধিতা কেন? কোথায় যাইবে পদ্ম অমরের সাথে? অমরের জীবনটা স্রোতচালিত হালভাঙ্গা নৌকার মত। নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। জীবন রচনার জন্য কোনো উদ্যমই তাহার নাই; তিলমাত্র আকর্ষণও না। আজ যদি অমরকে অনিচ্ছায় পদ্মর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়—ভবিষ্যতে কাহারো পক্ষে মঙ্গল হইবে না। কিন্তু, অমর ভাবে, কেউ কিছু জানিল না, বলিল না; পদ্মও জননী হইয়া হেমন্তবাবুর সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনের খেয়াতরী ভাসাইয়া দিল, তাহাতেই কি অমরের মনের ভাঙ্গা আয়নাটা জুড়িয়া যাইবে। এই আয়নার যত ক্ষত বিক্ষত বীভৎস প্রতিচ্ছবিটা যে অহরহ তাহাকে পীড়া দিবে। অমর তাহাকে মুছিয়া

ফেলিবে কেমন করিয়া? অমর পথ হাঁটে আর রকমারি যুক্তির সিঁড়ি বাহিয়া ওঠা নামা করে। সামাজিক নীতিবোধটার অশরীরী প্রেতাত্মার সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইতে থাকে।

সূর্যশংকরও নীরবে হাঁটিয়া চলিয়াছে। সতর্ক চক্ষু। ছায়াছবির কয়েকটা খণ্ড-দৃশ্যের মতই ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা মনের মধ্যে যাওয়া আসা করে। দুর্যোগময় এক রাত্রিতে একটি ভীত নারী কণ্ঠস্বরের আকুতি, পরদিন প্রভাতে সূর্যের আলোয় চোখ মেলিয়া পরম বিস্ময় অনুভব করা। তারপর প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির আবর্তে পড়িয়া অসহায় হীরা স্বেচ্ছায় এক দিন, এক রাত কেমন করিয়াই না সূর্যশংকরের ছায়ায় ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। দুর্গম পথ, দুরন্ত বন্যা, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যভূমি—সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সূর্যশংকরকে কর্মস্থানে ফিরিতে হইয়াছে; আর ভরসা করিয়া যে চার পাঁচটি প্রাণী তাহার সঙ্গ লইয়াছিল হীরা তাহাদের অন্যতম। সূর্যশংকরের অপরাপর সঙ্গীরা হীরাকে দলে লইতে রাজী হয় নাই। একটা স্ত্রীলোককে সাথে করিয়া দুর্গম, অনিশ্চিত, বিপদসংকুল পথে কে পা বাড়াইতে চায়! হীরা তখন কাতর অনুনয় করিয়া জানাইয়াছে, তাহার বাড়ি না ফিরিলেই নয়। বাড়িতে তাহার অল্পবয়সী একটা বালিকা পড়িয়া আছে; একেবারেই একা। মেয়েটা ভয়ে ভাবনায় হয়তো এক কাণ্ড করিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া, কে বলিতে পারে বারবুয়া স্টেশনের কি অবস্থা হইয়াছে? ঘাঘরী নদীতেও বান আসিয়াছে নিশ্চয়। যে প্রচণ্ড দুর্যোগ গেল তাহাতে হীরার মাথা গুঁজিবার জায়গাটুকু আছে কি না তাহাই চিন্তার বিষয়। সমস্ত কথা শোনার পর হীরার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু মেয়েটা গোঁ ধরিল, সে তাহার নিজের পায়ে হাঁটিয়া যাইবে, কাহারো ঘাড়ে চড়িয়া নয়। কেন তবে তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইবে না?

অবশেষে সূর্যশংকরদের সাথী হইয়া হীরা পরম নিশ্চিন্তে পদব্রজে পথ ঘাট পার হইয়া চলিল। দুরন্ত, দুঃসাহসী নারী। সবল পুরুষদের মত স্বচ্ছন্দেই হীরা দীর্ঘ বন্ধুর পথ হাঁটে, পার্বত্য চড়াই ভাঙে, পিচ্ছিল পাথরে সাবধানে পা রাখিয়া খাল, বিল, নালা পার হয়! পথে নদী পড়িলে মেয়েটার যেন উত্তেজনা বাড়ে। সকলের আগেই স্রোতের বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়ে। হঠকারিতা করিতে গিয়া একবার মরিতে বসিয়াছিল, সূর্যশংকর বহু কষ্টে চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার ডুবন্ত দেহটাকে উদ্ধার করিয়াছে।

সকলের সাথে হীরাও বারবুয়া ফিরিল। স্টেশনের নিকটে আসিলে হীরার সে কী আনন্দ। তাকাইয়া দেখে তাহার বাড়ি, স্টেশন, সবই আগের মতন আছে। কোনো ক্ষতি হয় নাই। লছমী শুষ্ক মুখে রেল কোয়ার্টারের সামনে ভাঙ্গা একটা গাড়ির চাকার উপর বসিয়া রহিয়াছে। বাড়ির কাছাকাছি আসিলে খুশীর চোটে মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিতে শুরু করে। সে এক দৃশ্য। সূর্যশংকর মুগ্ধ অভিভূত দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যই দেখে।

সে-দিন নিজের বাংলোয় ফিবিবার পথে সূর্যশংকরের মনে হয়, আজীবনের একটা আক্ষেপ যেন খানিকটা মিটিল। আশ্চর্য, এত কাছাকাছি থাকিয়াও এমন একটি রত্নকে সে আগে দেখে নাই।

আকর্ষণ ছিল ; এবার তীব্র আকর্ষণই জাগিল। তথাপি কাজের চাপে ক'দিন আর সূর্যশংকর সময় করিতে পারিল না। দিন তিনেক পরে অবসর জুটিতেই সূর্যশংকর বাহির হইয়া পড়িল।

সেই কথাই মনে পড়ে। অতর্কিতে সূর্যশংকরকে চোখের সামনে দেখিয়া হীরা প্রথমটায় খুবই অবাক হইয়াছিল। ছোটকিমাতলার বড়সাহেব তাহার মত নগণ্য দীন দরিদ্রের কুটিরে আসিবে হীরা কল্পনাও করিতে পারে নাই। দৈব দুর্বিপাকে পড়িয়া সূর্যশংকর ও অন্যান্যদের সাথে হীরা যখন পথ হাঁটিয়াছিল—তখন না ছিল তাহার সংকোচ, না জড়তা। প্রকৃতির বিচিত্র পরিবেশের কোলে কতকগুলি মানুষ আদিম প্রাণীর মতই তখন জীবনের মূল তাগিদটাকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকাই ছিল তাহাদের একমাত্র কামনা।

খাটিয়া, রেড়ির তেলের অনুজ্জ্বল আলো, মাটির সরাই, বিড়ি সিগারেটের কৌটা, পান চুন খয়েরের থালা—পরিবেশটা হীরার মনকে পানওয়ালী হীরাবাঈয়ের বাস্তব বোধটাকে উস্কাইয়া দেয়। হীবা আড়ষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

হীরার আচরণের পরিবর্তনে সূর্যশংকর কৌতুক বোধ করে। বিনা আমন্ত্রণেই খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে হাসে।

হীরা লছমীর দিকে তাকাইয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কথা বলে না।

সূর্যশংকর একটু অপেক্ষা করিয়া লছমীর সহিত বাক্যালাপ শুরু করিবার

চেষ্টা করে। একেই তো সাহেবী বেশভূষা, তাহার উপর বন্দুক। লছমীও ভয়ে ভয়ে পিছু হটিয়া হীরার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়।

কি মুশকিল! অগত্যা সূর্যশংকর হীরার আড়ষ্টতা ভাঙিবার জন্য তাহার সহিত ঘরোয়া বাক্যালাপ শুরু করে। কতদিন হীরা এখানে আছে, তাহার দেশ কোথায়; হীরার আর কে কে আছে; তাহার জীবিকা কি—ইত্যাদি। কথায় কথায় হীরার আড়ষ্টতা ভাঙিয়া যায়। হীরা সব কথারই উত্তর দেয়। সূর্যশংকরও সব ভুলিয়া এ-অঞ্চলের গল্প শুরু করে। বিশেষ করিয়া জঙ্গল আর শিকারের কাহিনী। রোমাঞ্চকর সে-কাহিনী শুনিতে শুনিতে হীরার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। হীরা বলে, বড় সাহেব যে একজন খুব বড় শিকারী লোকমুখে তাহা সে শুনিয়াছে।

এক সময় সূর্যশংকর প্রশ্ন করে, 'পানি হায় না তোমারি ইঁহা? আচ্ছি পানি?'

—জী, ইঁদারা কা পানি।

—পিলাও না।

হীরা লোটা মাজিয়া ধুইয়া সূর্যশংকরকে জল দেয়। এক চুমুকে জল নিঃশেষ করিয়া সূর্যশংকর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

সূর্যশংকরকে চাহিয়া জল খাইতে দেখিয়া হীরার কেমন যেন সাহস বাড়ে।

দিন দুয়েক পরে সূর্যশংকর আবার আসে। হীরা সেদিন একা। গল্প জমিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময় সূর্যশংকর প্রশ্ন করে, 'তুমারি ডার না আতি?

—ডার—? না! ডারেগি কাহে? হীরা জবাব দেয়।

—আগর কোই হাম্‌লা মাচায়?

—অ্যাসে কোই না হায়, মালিক। হীরা অদ্ভুত স্বরে জবাব দেয়।

সূর্যশংকর কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে, 'তোমারি ইঁহা চোর, বদমাস ভি না হায়?'

—চোরোকা কিয়া মিলেগি হামারি ইঁহা? না সোনে, না চাঁদি। ঝুটি ঝুটি তক্‌লিফ ক্যারে কোন্? হীরাও এবার হাসে।

—সোনে চাঁদি মে কিয়া কাম! দুশরা কুছ্‌ না হায় ইঁহা! সূর্যশংকর এবার সশব্দে হাসিয়া ওঠে।

সূর্যশংকরের শব্দবহুল দমকা হাসিতে হীরা প্রথমটায় হতবাক হইয়া পড়ে। পরে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিলে সেও হাসিয়া ফেলে।

—সমাঝ্ আয়ি ?

—জী! হীরা হাসি মুখেই মাথা নাড়ে।

—আব না বাতাও, দুষমন ইয়ে চোর কোই আ যায় তব্ ?

হীরার ঠোঁটের সরল হাসিটা ক্রমশই বাঁকা হইয়া ওঠে। চোখের নীচে একটি দুটি কুঞ্চন স্পষ্ট ও প্রখর হয়। গ্রীবার বঙ্কিম অথচ দৃঢ় ভঙ্গিটা আরও লোভনীয় করিয়া হীরা জবাব দেয়, 'দুষমনোকা লাল্চ্‌কো বাস্তে চিজ্ রাখি হায় না!'

—সাবাস্! আগর ম্যায় লুঠেরা হো তব্। কথার শেষে সূর্যশংকরের মুখের সমস্ত হাসিটুকু মিলাইয়া যায়। পরিহাসদীপ্ত কৌতুক-মধুর দুইটি চোখের দৃষ্টিতে নিমেষে একটা উগ্রতা ফুটিয়া ওঠে।

সূর্যশংকরের দিকে তাকাইয়া মনে মনে হীরা ভয় পায়। মুখের কোথাও কিন্তু সে ভয়ের ছাপ পড়ে না। বরং চকিতে একবার পিছনে তাকাইয়া হীরা মাদকতা ভরা দেহটাকে একটু পিছু সরাইয়া লইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

—আগব মালিক লুঠেরা হো তো ভি—

হীরা হঠাৎ পিছু হঠিয়া আসে। আর চোখের পলকে কুলঙ্গি হইতে ভোজালিটা তুলিয়া লয়।

সূর্যশংকর তাকায়। তীব্র উত্তেজনাভরা কম্পিত, ক্রুর অগ্নি শিখার মতই হীরার সমস্ত দেহটা যেন জ্বলিতেছে। দাঁতে দাঁত চাপা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওষ্ঠভঙ্গি, হিংস্র দৃষ্টি। হীরার এ-রূপ সূর্যশংকর নীরবে তাকাইয়া দেখে। সুডৌল, সুছন্দ, কোমল বাহুতে সাদা হাড় বাঁধানো একটা ভোজালি যে অক্লেশে এমন একটা স্বাভাবিক সঙ্গতি সৃষ্টি করিতে পারে সূর্যশংকর তাহা জানিত না। দংশন-উদ্যত বিষাক্ত সাপের মতই হীরার বাহুটা যেন ফণা মেলিয়া আছে।

সূর্যশংকরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। কোনো কথা না বলিয়া খাটিয়ার দিকে পিছু হাঠিয়া আসিয়া সূর্যশংকর তাহার বন্দুকটা তুলিয়া লয়। তারপর পরম অবহেলা ভরে হীরার বুকের উপর ভীতিকর পদার্থটা তুলিয়া ধরে।

এমন পরিণতি হীরার আজানা। বহু দুষমনই যেভাবে ঘর ছাড়িয়া পথে

গিয়া নামিয়াছে—সূর্যশংকরও বাড়াবাড়ি করিলে যে সেই ভাবে সরিয়া পড়িবে ইহাই হীরা ভাবিয়াছিল। কিন্তু সূর্যশংকর পিটার নয়। বন্দুকের নলের দিকে তাকাইয়া হীরা সমস্ত হিংস্র-দীপ্তিটা নিভিয়া আসিতে থাকে। সূর্যশংকরের মুখের পানে তাকাইয়াও হীরা সঠিক কিছু ধারণা করিতে পারে না। ভাবান্তরহীন, অবজ্ঞাসূচক স্থির দৃষ্টিতেই সূর্যশংকর সোজাসুজি হীরার চোখে চোখ মেলিয়া আছে। লোকটা ভয়ংকর। হীরা যা আশঙ্কা করিয়াছিল, নিঃসন্দেহ হওয়ার মত তেমন কোনো তো কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। যেভাবে ওই মানুষটা বন্দুকটা তুলিয়া ধরিয়াছে তাহাতে যে সে কি করিবে, কি করিতে পারে—হীরা তাহা অনুমান করিতে পারে না।

ধীরে ধীরে ভোজালি সমেত হাতটা হীরার নামিয়া আসে। সূর্যশংকর দেখে, দংশন-উদ্যত, বিষাক্ত একটা সাপ যেন যাদুমন্ত্র বলে নিজের ফণাটা গুটাইয়া লইল।

—ডর গয়ি! সূর্যশংকর বন্দুক নামাইয়া প্রাণ-খোলা হাসি হাসে। হাসি থামিলে বলে, 'তব্ তুমে ভি ডর্ আতি! আচ্ছি বাত্।'

সূর্যশংকর হাসি-মুখেই দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যায়।

অমরের কথাটা এখন মনে পড়ে সূর্যশংকরের—মেয়েটা শুনেছি ফেরোসাস। ফেরোসাসই বটে। সুস্থ মানুষের মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থাটা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে, তোমাদের মত পুলিসের হাতে তুলিয়া দেয় নাই কিনা তাই ফেরোসাস।

অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া যে আকাশ অভিমানিনী প্রিয়ার মত দীর্ঘ দিন মুখ ফিরাইয়া ছিল তাহার অভিমান ভাঙ্গে। অবগুণ্ঠন সরিয়া যায়। চোখের কাজল-ভেজা জলের শুষ্ক কয়েকটি রেখা কপোল-কূলে কিছুদিন করুণ হইয়া ফুটিয়া থাকে। একদিন সে রেখাও মুছিয়া যায়। সদ্য অভিমান-ভাঙা আর্দ্র চক্ষুতে হাসির আভাস ভাসিয়া ওঠে। রৌদ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত দিগন্তে ক্ষণিক বৃষ্টিপাতের মতই হাসি-কান্নায় মাখামাখি হইয়া নভসীমান্ত অপরূপ দেখায়। আকাশ আবার হাসিতে, খুশিতে মধুময় হইয়া ওঠে। স্থল-প্রকৃতিও রূপ বদলায়। শান্ত, স্নিগ্ধ, সরস, কল্যাণী গৃহবধূর মতই স্থল-প্রকৃতি তাহার বিচিত্র সংসারশালায় অনুক্ষণ কর্মরত থাকে। ধীরে ধীরে কখন যেন শীতের একটা হাওয়া আসিয়া গায়ে লাগে।

আকাশ আর মাটির বেড়া দিয়া ঘেরা মানুষের এই রঙ্গশালা। মাটিতে তাহার বিচরণ, আকাশ তাহার স্বপ্ন। এখানে বাসা, ওখানে আশা। এই দুইয়ের কোনো একটিকেও বাদ দিয়া তাহার চলে না। আকাশ আর মাটির রূপ বদলের সাথে সাথে মানুষগুলিরও যদি কিছুটা পরিবর্তন ঘটে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। তবে আকাশ যখন মধুময় ও স্থল-প্রকৃতি শান্ত, তখন রঙ্গশালার কুশীলবরা সকলেই মধুর ও শান্ত রসের ভূমিকা অভিনয় করিয়া মনোহরণ একটি নাটকের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটাক এমন অধিকার তাহাদের কেহ দেয় নাই।

অলক্ষ্যে থাকিয়া যে শক্তিমান, নিষ্ঠুর নাট্যকার এ-সংসারের নাটক রচনা করেন তাঁহার নিকট হয়ত অভিযোগ করা যাইতে পারে, আমার সিংহাসন তোমার অধিকারে আসিল এত বড় রূঢ় পরিহাসটা আমি কি করিয়া মানিয়া লই? যে-বরমাল্য ছিল আমার, সেই বরমাল্যটা অপরের কণ্ঠে শোভা পাইবে —এমন নির্দয়তা কে সহ্য করে?

পিটার যে আর আসিবে না, হীরাবাঈ দিনের পর দিন পথ চাহিয়া দিন কাটাইবে, দীর্ঘনিশ্বাস আর চোখের জলে হীরাবাঈয়ের অমন আগুনের আঁচের মত উজ্জ্বল স্বর্ণাভ মুখখানি মলিন হইয়া যাইবে, অবশেষে একদিন পিটার আসিবে, পরিণতিটা বেশ মধুর হইবে—ইহাই না স্বাভাবিক। কিন্তু বিধাতার নাটকে এমন মিলনান্ত দৃশ্য বিরল।

পিটার মূর্খ নয়। ইয়ার্ড মাস্টার মিঃ কিংহামের আধিপত্য ও দুর্দণ্ড প্রতাপের কথা তাহার অবিদিত নয়। পিটার ইহাও ভুলিতে পারে না, মিঃ কিংহামের সুপারিশে পিটার রেল কোম্পানীর গার্ডের চাকুরিটা পাইয়াছে। এহেন কিংহাম-দুহিতা বেটসি কুরূপা, উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে কিন্তু খুঁটি ভালো। পিটারের চাকুরী-জীবনের উন্নতির পক্ষে সে অপরিহার্য।

অতএব বেট্‌সি যাহাই হউক, সে যখন পিটারের পাণি-প্রার্থিণী তখন কোনমতেই উহা প্রত্যাখ্যান করা চলে না। উদরের ক্ষুধা এবং চাকুরীর উন্নতির অপেক্ষা নিশ্চয় হীরার মূল্য বেশি নয়। কাজেই পিটার বেটসিকে বিবাহ করিয়া লোকোশেডের কাছে রেল কোয়ার্টার লইয়া ঘর পাতিল। পাতাবাহার আর ফুলগাছের টব সাজাইয়া, কাঠের জাফরিতে সবুজ রং ধরাইয়া পিটার-বেটসি মধুযামিনী যাপনে ব্যস্ত থাকিল।

শিবলাল হীরাকে পিটারের বিবাহ করার খবরটা আনিয়া দেয়। হীরাবাঈ শোনে। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিতে মন চায় না; পরে অবশ্য বিশ্বাস করিতেই হয়। কেননা, তিন মাসেরও বেশি হইতে চলিল পিটার হাসপাতাল ছাড়িয়াছে—অথচ আর একদিনের জন্যেও সে এমুখো হইল না। আর বেটসিকে তো হীরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছে; বেটসির হাত হইতে পিটার পরিত্রাণ পাইবে এমন দুরাশাই বা সে কেমন করিয়া করে।

মিয়া সাহেবের উপদেশটা হীরার আবার মনে পড়ে। হীরা ভাবে, এমন দুর্মতি তাহার কেন হইল। পিটার যে কি পদার্থ তাহা জানিবার জন্য সে লালায়িত ছিল না। কঠিন প্রকৃতির সুন্দরী হীরা ভালো করিয়াই জানিত—যতক্ষণ তাহার রূপ আছে ততক্ষণ ভালোবাসার লোক জুটিবার অভাব হইবে না। তাহার কাছে ভালোবাসাটা যেন নিজের ভাঁড়ারে জমা রাখা ডাল, তেল, লবণের মতই একটা সওদা করিবার বস্তু হিসাবে ছিল। ভাঁড়ারে জমা আছে যখন খুশি যাহাকে খুশি চড়া দামে বিকাইয়া দিলেই চলিবে। অতএব এ লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য, পিটারের মত একটা শয়তানকেই হীরা অকস্মাৎ ভাঁড়ার খুলিয়া সেই বস্তুটা দান করিয়া বসিল। শুধু দানই নয়, দান করার পর হীরা ইহাও বুঝিল—বিনি পয়সায় যে বস্তুটা সে হাতছাড়া করিল তাহা চাল, ডাল, লবণের মত খুব সহজ ও সুলভ নয়। বরং দুর্লভ। হীরা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই তাহার ভাঁড়ারে ভালোবাসা নামক যে বস্তুটা জমা ছিলো তাহা এমনই জটিল, বিচিত্র, বেদনাময়। দিনের

পর দিন এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, নানা অনুভূতির দোলা খাইয়া তবেই হীরা অনুভব করিল, রূপ থাকিলে ভালোবাসার লোক জুটিতে পারে ঠিকই কিন্তু যাহার রূপ আছে সে যখন-তখন যাহাকে খুশি ভালোবাসিতে পারে না। ভালোবাসাটা ব্যবসা নয়। পিটারের কি ছিল? নিতান্ত সাধারণ একটা পুরুষ মানুষ! না আছে তার শক্তি, না সাহস। বেশির ভাগ পুরুষের মতই সে লালসারই একটা মূর্ত প্রতীক। শয়তান, বেইমান। তথাপি কেন হীরা তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিল? কেন? ইব্রাহিম মিয়া উপদেশ দিয়াছিল, ভালোবাসিলে কঠিন হইতে হইবে। হায় মিয়া সাহেব—ভালোবাসিলে কি আর কঠিন হওয়া যায়! বরং তাহার কঠিন-হৃদয়ে কোমলতা আছে এ-কথাটা প্রমাণ করিতেই হীরা যেন আগেভাগেই ভালোবাসিয়া ফেলিল।

সেই পিটারই তাহার সহিত বেইমানী করিল। অবাক হইবার মতই কথা বটে। হীরাবাঈ যাহাকে স্বেচ্ছায় করুণা, সহানুভূতি, ভালোবাসা দিয়া আপন করিয়া লইয়াছিল—সেই লোকটাই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। হীরা মনে মনে শুধু আহতই হয় না, উপরন্তু আশ্চর্য একটা সন্দেহ জাগে। তবে এই রূপেরও কি কোনো মূল্য নাই? আঁচলে টাকা গুঁজিয়া দু'এক ঘণ্টার জন্য আনন্দের যোগান দেওয়াই তাহার একমাত্র সার্থকতা! রূপসী হীরাকে বরাবরের জন্য বুঝি কেহই কাছে রাখিতে চায় না? সে আগ্রহই অনুভব করে না? যদি তাহাই করিত, পিটার বেটসির মত একটা কুরূপাকে লইয়া ঘর বাঁধিল অথচ রূপসী হীরা বাতিল হইয়া গেল!

হীরা নিজের মনের মত করিয়া যাহা পারে ভাবে। চুলচেরা বিচার করিয়া সব কিছু ভাবিয়া দেখিবে সে বুদ্ধি তাহার নাই। তবে নানা অভিজ্ঞতায় হীরার খানিকটা বাস্তব জ্ঞান জন্মিয়াছে বইকি। সেই জ্ঞান হইতেই হীরা বুঝিতে পারে, পিটার সাহেব তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে। এ ধরনের প্রতারণা করা অনুচিত। ইহা দুশমনী।

পিটারের প্রতি ক্রমশই হীরার মন বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকে।

বিচিত্র এই নারী-হৃদয়! পিটারের প্রতি হীরার মন যতই বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকে ততই সূর্যশংকর হীরার কাছে একটা পরম আগ্রহের বস্তু হইয়া ওঠে।

যে-দিন সূর্যশংকর তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের ভয়ংকর দুটি নল তুলিয়া ধরিয়া নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকাইয়াছে সে-দিন শুধু যে হীরা তাহার ভোজালি সমেত হাতখানা ভয়ে ভয়ে নামাইয়া লইয়াছে তাহা নয়, উপরন্তু জীবনে সে সজ্ঞানে সেই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছে—এ-জগতে তারও ভয় পাওয়ার মত মানুষ থাকে। হীরার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনো হয় নাই। নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া অনেকেই তাহার কাছে ঘোরাঘুরি করিয়াছে, কুকুরের মত অনেকেই পদলেহন করিয়াছে, দাও দাও করিয়া ভিখ্‌মাঙ্গার দল ভিখ্‌ মাগিয়াছে, লালসার বিকৃতিতে তাহাদের মুখ চোখের রূপটাই কুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এমন ভাবে কেহ হীরাকে লুট করিতে আসে নাই। জীবনে সেই দিনই হীরা নিজেকে সত্য সত্যই অসহায় বলিয়া ভাবিয়াছে। কী বলিষ্ঠ ওই মানুষটা, অসাধারণ তাহার শক্তি। সে লুঠেরা, সে শের। হীরার নরম উষ্ণ দেহটাকে বুকের কাছে টানিয়া লইতে তাহার যেমন এক মুহূর্ত বিলম্ব হওয়ার কথা নয়, তেমনি আবার পর মুহূর্তে সেই কোমল কম্পিত উষ্ণ বক্ষের কাছেই বন্দুকের ভয়ংকর দুটি নল মেলিয়া ধরিতেও সে নির্বিকার।

হীরা বোধ হয় ভাবে, পিটার আর সূর্যশংকর দুজনাই পুরুষ—কিন্তু কী পার্থক্য! একজন ছল করিয়া নারীত্বহরণ করিতে আসে, বাধা পাইলে ভয়ে পালায়, বৃষ্টিতে ভিজিয়া অসুখ করিলে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার আসিয়া করুণা ভিক্ষা করে। তাহাকে আশ্রয় দাও, সেবা করো, তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করো। আর অপরজনের কোনো ছল নাই। বিপদের দিনে তোমায় আপন সবল বক্ষে আশ্রয় দিয়াছে, যখন খেয়াল হইবে সবল বাহুতে আকর্ষণ করিবে। লোকটা বাধা মানে না, ভয় পায় না, করুণা ভিক্ষা করিতে আসে না। তাহার আশ্রয় প্রয়োজন হয় না, সেবাও না। তাহার জন্য তোমার দুঃখ ভোগ করার কিছু নাই।

সেই ঘটনার পর দীর্ঘ তিনটা মাস শেষ হইয়াছে। সূর্যশংকর কয়েকবারই হীরার গৃহে আসিয়াছে, বসিয়াছে, গল্প করিয়াছে। সূর্যশংকর আসিলে হীরা আর সংকোচ অনুভব করে না। বরং অসংকোচেই কথা বলে, হাসে ভ্রূভঙ্গি করে, একটু বুঝি বা চঞ্চল হইয়া ওঠে। খুবই খুশী হয় সে। অথচ ভয় যে কিছু কম করে তাও নয়। প্রতিবারই হীরা ভাবিয়াছে, এবার বুঝি ওই ভয়ংকর লোকটা তাহার সর্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে। লুঠ করিলে হীরা

তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না—বাধা দিবেও না। কিন্তু আশ্চর্য, সুর্যশংকর কোনদিনই হীরাকে লুঠ করিল না।

হীরার আশংকা সত্যে পরিণত হইল না—ইহাতে তাহার সুখী হওয়ার কথা। তথাপি কে জানে কি কারণে হীরা ইহাতে বিশেষ সুখী হইতে পারে না।

*

পদ্ম শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিত ভাবেই বুঝিতে পারে অমর আসিবে না। ঠিক সময় মতই সে দৃশ্যপট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। ইহা আর নূতন কি! চিন্ময়ও একদিন এইভাবে সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, আর এবার অমর।

তবু অমরের চিঠি আসে। বনলতা একা; টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া বিদেশ বিভুঁয়ে মরিতে বসিয়াছিল। তার পাইয়া তৎক্ষণাৎ যদি অমর না যাইত বনলতা বাঁচিত না। দীর্ঘ দিন অমর মৃত্যুর সঙ্গে জীবন পণ করিয়া লড়িয়াছে। বনলতা এখন সুস্থ হইতে চলিয়াছে; তবে অত্যন্ত দুর্বল। শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতা নাই। সব কিছুরই তদারক অমরকেই করিতে হয়। আরো কিছুদিন তাহাকে নাগপুরেই থাকিতে হইবে। পদ্ম যেন কিছু না মনে করে। শেষ চিঠিতে অমর লিখিয়াছে:

আমি এখানে কিছু জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। কপাল ঠুকে এদিক ওদিক কয়েকটা আবেদনপত্রও পাঠিয়েছি। জানি না কি হবে। চাকরির বাজারে যে সব গুণের দরকার হয় আমার তার একটাও নেই।

চিঠির শেষে আভাসে আরো একটি কথা বলার চেষ্টা অমর করিয়াছে। কথাটা অবশ্য পুরাতন। মুখে এবং পত্রে এই কথাটা প্রতিবারই সে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করে। সরল ভাবে যাহার অর্থ হইল, অমরের উপর ভরসা না করিয়া পদ্ম যদি অন্য কোনো উপায়ে সমস্যাটার সমাধান করিতে পারে তাহা হইলেই সর্বাপেক্ষা ভালো হয়।

একই কথা বার বার শুনিতে শুনিতে পদ্ম শেষাবধি বীতশ্রদ্ধ, বিরক্ত ও হতাশ হইয়া ওঠে। সেই যে প্রথম দিন কথাটা শুনিবার পর শুষ্ক কণ্ঠে অমর তাহার অসামর্থ্যের কথা তুলিয়া সমস্ত ঘটনাটা ধামা চাপা দিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল তাহার বিরাম ঘটিল না। অমর জানে পদ্ম সোজাসুজি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কোনো মতেই তাহা হইবার নয়, হইতে পারে না। তবু কেন যে অমর কথাটা তোলে পদ্ম বুঝিতে পারে না।

এদিকে যতই দিন যাইতেছিল পদ্ম ততই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। বর্ষার শেষাশেষি বনলতার অসুখের সংবাদ পাইয়া অমর হঠাৎ উধাও হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বর্ষা শেষ হইয়া শরৎ আসিল। শরৎ শেষ হইতে চলিয়াছে তবু অমরের দেখা নাই। এ পোড়া দেশে অবশ্য বাঙলা দেশের মত শরৎকাল চোখে দেখার নয়। বর্ষা শেষ হইতেই আশ্বিন শেষ হয়; তাহার পরই শীতের হাওয়া বহিতে শুরু করে। একেই তো পদ্মর অল্পতেই ঠাণ্ডা লাগে, তাহার উপর এবার প্রথম শীতের হাওয়ায় শরীরটাও তাহার অসম্ভব খারাপ হইয়াছে। জ্বর-জ্বর লাগে। কিছুই মুখে দিতে ইচ্ছা হয় না। অসম্ভব ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমাইলেই নানা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে। যতক্ষণ পদ্ম একা থাকে ততক্ষণ যেখানে সেখানে গা এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ে আর ভাবে। পদ্মর শরীরটা খারাপ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া হেমন্তবাবু সদর হইতে রেলের ডাক্তার ডাকিতে চাহিয়াছিলেন। সে-কথা শোনা মাত্র পদ্মর সারা শরীর হিম হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া পদ্ম বলিয়াছে, 'থাক, অতো দরদে কাজ নেই। মেয়েদের শরীরের তুমি কি জানো? পেটের গোলমালে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, ডাক্তাররা তার কি করবে? তার চেয়ে নিজে বরং একবার যাও—দেখিয়ে এসো।'

পদ্ম তাই আজকাল দিশাহারা হইয়া ভাবে: এভাবে আর প্রকৃত ঘটনাটা কতদিন লুকাইয়া রাখা সম্ভব! স্বামী তো তাহার অন্ধ নয়। নেহাতই মানুষটা বোকা; নয়তো এতোদিন চোখে পড়িবারই কথা। কত সাবধানে যে পদ্ম দিন কাটাইতেছে! আজকাল হেমন্তবাবু যতক্ষণ বাসায় থাকেন পদ্ম ততক্ষণ জোর করিয়া কাজ অকাজ দুইই করে। কাজ না থাকিলে হেমন্তবাবুর সহিত গল্প করে, হাসে, তাস খেলে। সারাক্ষণ হেমন্তবাবুকে কোন কিছুতে মগ্ন রাখিতে পারিলেই যেন সে বাঁচে। সম্প্রতি কছুদিন ধরিয়া পদ্ম আর এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। সন্ধ্যার গোড়ায় হেমন্তবাবুকে সাথী করিয়া প্রায়ই সে গোঁসাইজীর কাছে যায়। যেদিন নিজে না যায়, হেমন্তবাবুকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া পাঠাইয়া দেয়। বলে, 'আহা যাও না! অমন মানুষের সঙ্গ তো আর খারাপ নয়। তবু দুটো ধর্মের কথা শুনতে পাবে। আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলে পরকালে তোমার কোন কাজটায় আসবে?'

শীতের হাওয়ার দাপট বাড়ে। দিনগুলির দীর্ঘতা কেমন করিয়া যেন হঠাৎ কমিয়া আসিল। দীর্ঘ বিলম্বিত রাত্রি। সে-রাত্রি যেন আর শেষ হয় না। দরজা জানালা বন্ধ। অন্ধকার ঘর। রুদ্ধ বাতাস। যেন নিঃসঙ্গ এক প্রেতপুরীর গুহার মধ্যে পদ্মকে কেহ নির্বাসন দিয়াছে; সঙ্গী নাই, আশা, ভরসা কিছুই না।

বিনিদ্র রজনীর সীমাহীন চিন্তাসমুদ্রের তটে বসিয়া পদ্ম ঢেউ গোণে। কি করিবে সে, কিই বা করিতে পারে। অমরের আশায় আশায় থাকিয়া দীর্ঘ সময় অপচয় করিয়াছে। আর কেন? যদিও বা অমর আসে, কি লাভ হইবে? কাঙ্গালপনা করিয়া পদ্ম মাতৃত্ব ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, অমর সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছে। তাহারই বা দোষ কোথায়? কোন্ দুঃখে সে পদ্মকে নিজের ভাগ্যের সহিত জড়িত করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিবে! অমর তো তাহাকে ভালবাসে না। পদ্ম বনলতা নয়; পদ্মর মর্যাদা নাই, অর্থ নাই। আর রূপ? ঈশ্বর, যৎসামান্য সাধারণ সে-রূপও তো আর অল্প কিছুকাল পরে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তুমিই বলো পদ্ম, অমর কোন্ লোভে তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে? কি তুমি তাহাকে দিতে পারো? বনলতার মত যদি তোমার গুণ থাকিত, বিদ্যা থাকিত তবুও না হয় একটা কথা ছিল—তুমি চাকুরী করিয়া অর্থ রোজগার করিতে, দেহে মনে সেবায় শুশ্রূষায় অমরের অলস জীবনটার কর্ণধার হইয়া থাকিতে। সন্তান পালনের দায়িত্বটাও পড়িত তোমার ঘাড়ে। অমরের দায়-দায়িত্ব থাকিত না।

পদ্ম ভাবে আর ভাবে। অবশেষে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে, যে-সম্পর্কের ভিতটাই নির্জলা লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত সে-সম্পর্কের ইমারত কোনো-কালেই সুদৃঢ় হইবে না। অমর যদি তাহাকে লইয়া যায়, তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ সুখের হইবে এমন কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পার! যে কোনো মুহূর্তে, যখন খুশি সে তোমায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। কিসের বন্ধন তাহার, কিসের বাধা? তখন—? তখন তো তুমি সেই একাই। অসহায়, নিঃসম্বল, উপায়-অক্ষম। তোমার সন্তান, তোমার জীবন, যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজন কে মিটাইবে?

অন্ধকারে পদ্ম হটাৎ হেমন্তবাবুর বুকে হাত দেয়। তবে কি তাই করিবে? স্বামীকে……! কিন্তু সে যে হয় না, হওয়ার নয়। তবে? তবে কি গোপনে যে আসিয়াছে তাহাকে তেমনি গোপনেই বিদায় করিয়া দিবে? ক্ষতি

কি? শুধুই রবির কিরণ, জল, মাঠ, বাতাস যখন তাহার জীবনের অভাবগুলি মিটাইতে পারিবে না তখন আর জন্মের সার্থকতা কি। দুগ্ধপোষ্য শিশু, অসহায় একটা মাংস পিণ্ড তাহারই কি কম দাবী। খাদ্য দাও, আশ্রয় দাও, সেবা দাও। শিশু কিশোর হয়। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, শিক্ষা দাও। তোমার নিরঙ্কুশ দাক্ষিণ্যে আমায় ঋণী করিয়া সংসারের রাজপথে আনিয়া দাও—তবেই না তুমি মা। নচেৎ অনাথ-আশ্রমের তালিকা ভারী করিয়া একটা প্রাণ-স্ফুলিঙ্গকে নির্বাপিত করায় কিসের সার্থকতা। এ তো সহজ। কে না পারে? প্রকৃতি সৃষ্টির হিসাব কষে না। সে অন্ধ। কিন্তু তুমি প্রকৃতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তুমি জননী; তোমায় জীবনের হিসাব কষিতে হইবে বই কি।

পদ্ম কখন যেন আতঙ্কে চিৎকার করিয়া হেমন্তবাবুকে আঁকড়াইয়া ধরে। হেমন্তবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন।

—কি হ'লো? এ্যাঁ, ও ছোট বৌ—ছোট বৌ—

পদ্ম জবাব দেয় না। চোখ মেলিয়া শুধু দেখে, সারা ঘরে কঠিন, নির্মম, নিবিড় অন্ধকার। কী ভয়ানক, কী কুশ্রী!

পদ্মর গায়ে নাড়া দিয়া হেমন্তবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেন, 'খারাপ স্বপ্ন দেখেছো বুঝি? বাতিটা জ্বালি।'

—জ্বালো। পদ্ম মৃদু স্বরে জবাব দেয়।

জ্বলুক। অসহ অন্ধকার। এ অন্ধকারের মধ্যে অন্তত একটুও যদি আলো থাকে তবুও পদ্ম অনেক সাহস পাইবে।

কম দিন তো নয়। বোধ কার ছয়মাস হইতে চলিল সুধাকর বাড়ি ছাড়িয়াছে। মুখের হিসাবে সময়টা হয়তো তেমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু মনের হিসাবে এই ছয়মাসই এক যুগ যেন।

প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে দুরন্ত লু বহিতেছে, সেই লুয়ের মধ্যে উত্তপ্ত আর এক দমকা হাওয়ার মতই সুধাকর আসিল এবং চলিয়া গেল। কুসুম থাকিল। আর রহিল সেই দুরন্ত বাতাসের জ্বালাময় অনুভূতি। বর্ষা থামিল। জলে, মেঘে, নির্জনে, নিঃসঙ্গতায়, নিশীথ-চিন্তায়—মনের জ্বালাটা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল বটে কিন্তু তাহার পরিবর্তে এমন একটা ব্যথাতুর বিষণ্নতায় মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল যাহা অবর্ণনীয়। কুসুম প্রতিদিন সেই অসহ্য অন্তর্বেদনা ভোগ করিয়াছে।

কুসুম অনেক ভাবিয়াছে। এ বেদনা কেন? কেন এই অব্যক্ত যন্ত্রণা? প্রথমটায় কিছুই ঠাওর করিতে পারে নাই। পরে মনে হইয়াছে ঠাকুরের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখই তাহার প্রাণে বাজিতেছে। ইহাই বিরহ। শ্রীরাধা না এমনই বিরহে দিন দিন কৃশ হইয়া উঠিয়াছিল। দিন রাত সব ভুলিয়াছিল। অধীরা, মানহারা, লজ্জাহীনা আকুল হইয়া বলিয়াছিল: কাঁটা, বন, লতা সব তুচ্ছ করে আমি এই বনের মধ্যে এলাম; তবু হরি আমায় বারেকের জন্য মনে করলেন না। সখি, আমার মরণই মঙ্গল। এ ছার প্রাণ ধারণে কোন লাভ নেই।

প্রাণটা যদি একটা পদার্থ হইত তাহা হইলে কুসুম অবশ্য সেই ছার পদার্থটাকে চীর বসনের মতই ত্যাগ করিত। পরিতাপের বিষয় কি না বলিতে পারি না, প্রাণটা পদার্থ নয়। প্রাণ আছে, প্রাণকে অনুভব করা যায়; প্রাণের প্রকাশ আছে, বিকাশ আছে কিন্তু তাহার রূপ নাই, ভার নাই। প্রাণ অস্পৃষ্ট, অব্যক্ত। তাহার গন্ধ নাই, কিন্তু রন্ধ্র আছে। সে রন্ধ্রে জীবন দেবতা সংগীতের লহরী তোলেন, আবার সেই রন্ধ্রপথেই কখন যে কোন্ নাগিনী আসিয়া ঘুমন্ত লখিন্দরকে দংশন করে কে জানে!

কুসুমের প্রাণের রন্ধ্রপথ দিয়া বুঝি কালনাগিনীই প্রবেশ করিয়াছিল আর বড়ই বিস্ময়ের বিষয় তাহার দংশনে বিষ-জর্জরিত হইয়া যিনি চিরনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন তিনি কুসুমের মনে গড়া ছায়া, চোখে দেখা কায়া নয়।

নির্বোধ কুসুম কাঁদিয়া কাটিয়া একসার হইয়াছে। পরমারাধ্যকে পুনর্জীবিত করিবার আশায় তাহার কৃচ্ছ্রতা সাধনের তিলমাত্র ত্রুটি ঘটে নাই। সম্ভবত কুসুমের মনের কৃষ্ণ ইহাতে দেবলোক হইতে হাসিয়াছেন। নবকলেবরে আবার যখন তিনি কুসুমের কাছে কায়া হইয়া দেখা দিলেন তখন কুসুম বিমূঢ়, বিহ্বল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্ল নয়নে, নিস্পন্দ হইয়া কুসুম দেখিল ; এ যে সুধাকর !

সুধাকর এবার বুঝি সুধাই আনিয়াছে।

আনমনে কুসুম গান ধরে, 'যদি জানিতাম মোর প্রিয়া যাবে রে ছাড়িয়া, পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।'

বাঁধিয়া রাখার কথা মনে হইতেই কুসুমের বুকটা শূন্য হইয়া আসে। চাহিলেও সব জিনিস বাঁধা যায় না। কেমন করিয়া সে সুধাকরকে বাঁধিবে ? সুধাকর তাহার আয়ত্তাতীত।

রাধারাণীর উপর কুসুমের বড় রাগ হয়। মা হইয়া কেহ এমন করিয়া মেয়ের শত্রুতা করে ?

কুসুম ভাবে, এ কি দুর্দৈব তাহার। সুধাকর যতদিন কাছে ছিল, ততদিন কুসুমের মনে সে ঠাঁই পাইল না ; এখন সুধাকর আর কাছে নাই। আর থাকিলেই বা কি হইত ? রক্তমাংসে গড়া স্বামীকে সে কি গ্রহণ করিতে পারিত ? মুখের ক'টা কথা সে-পথেও কঠিন বাধা হইয়া রহিয়াছে।

গোঁসাইজীর কাছে কুসুম ঘোরাফেরা শুরু করে। কি যেন বলিতে চায়, অথচ সাহসে কুলায় না। দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গোঁসাইজীকে সে দেখে আর দেখে।

—কি রে, কিছু বলবি নাকি কুসুম ? গোঁসাইজী মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করেন।

—না। কুসুম মাথা নাড়ে। বুকটা কেমন ধড়ফড় করে। মনে হয় এই বুঝি সে ধরা পড়িবে। কুসুম দ্রুতপায়ে গোঁসাইজীর নিকট হইতে সরিয়া যায়।

গোঁসাইজী মনে মনে হাসেন। বোকা মেয়ে ! তিনি হয়তো ভাবেন, তিনি অন্ধ নন। অথচ কুসুম তাঁহাকে বোধ হয় অন্ধ বলিয়াই মনে করে।

সে দিন দুপুরে কুসুম বিছানা ছাড়িয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছিল। শরীরটা তাহার মোটেই ভালো নয়। সর্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ধরিয়াছে, সামান্য জ্বরই হইয়াছে বোধ হয়, গা-ভরা আলস্য আর ক্লান্তি। সারাদিন কুসুম বিছানার উপর এপাশ ওপাশ করিয়া সময় কাটাইয়াছে। রান্নাঘরে পর্যন্ত যায় নাই। গোঁসাই স্বপাক আহার করিয়াছেন। এ-সময়টা কুসুম গোঁসাইজীর অন্নজল স্পর্শ করে না।

শীতের রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া কুসুমের মনটা আরও উদাস হইয়া আসে। দাওয়া জুড়িয়া রৌদ্রছায়ার লুকাচুরি। সুনীল আকাশে কয়েকটা চিল ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। সামনের সজী বাগানের একপাশে একরাশ গাঁদা ফুল আর অজস্র প্রজাপতি। একটা ঘুঘু থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে।

কুসুম দাওয়ায় হেলান দিয়া চুপচাপ গালে হাত রাখিয়া বসিয়া থাকে। নিরিবিলি, অলস দুপুরের বিচিত্র এক স্বাদ তাহার মনটাকে আরও মেদুর করিয়া তোলে।

কুসুম বুঝি ঘুঘুর ডাকে আনমনা হইয়া ভাবিতেছিল—এই নির্জন দুপুরে পা পা করিয়া সে সোহাগীর ভিটায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সোহাগী ঘরে নাই। সুধাকর একলা। মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া গুটি-সুটি দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাত-ডিউটির ক্লান্তি তাহার রুগ্ন মুখটিকে আরও শুষ্ক করিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালো রেখা, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখ হাঁ করিয়া নিশ্বাস টানিতেছে। স্বামীর জন্য কুসুমের বড় মমতা হয়। আহা। পাশে বসিয়া কুসুম সুধাকরের কপালে হাত রাখে। সুধাকর কিন্তু চোখ খোলে না। বরং কুসুমের ঠাণ্ডা হাতটাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া পরম শান্তিতে পাশ ভেরে। সুধাকরকে আর জাগাইতে ইচ্ছা হয় না। কুসুম ওঠে। সোহাগী হয়তো এখনই আসিয়া পড়িবে। কুসুম ফিরিবার জন্য পা বাড়ায়। হঠাৎ তাহার আঁচলে টান পড়ে। মুখ না ফিরাইয়াও কুসুম বুঝিতে পারে—সুধাকর তাহার আঁচল ধরিয়াছে—, ছাড়িবে না। তবে কি মানুষটা এতোক্ষণ ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়াছিল! কুসুমের হাসি পায়। এই সামান্য আকর্ষণটুকুও বড় ভালো লাগে আজ।

দিবাস্বপ্ন মিলায়। সত্য সত্যই আঁচলে টান পড়িয়াছে। কুসুমের চমক ভাঙে। দেখে, হরিণীর দুরন্ত ছানাটা কখন যেন পাশে আসিয়া তাহার

আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। টান দিতেই আঁচল ছাড়িয়া ছাগ-শিশুটা লাফাইতে লাফাইতে পালাইয়া যায়।

আর্দ্র বস্ত্র-প্রান্তটা হাতের মুঠায় করিয়া কুসুম তাকায়। সারা দাওয়াময় খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া ছাগ-শিশুটা হরিণীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব্জী বাগানের বেড়ার ছায়ায় হরিণী গা মেলিয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ছাগ-শিশুটা কয়েক মুহূর্তে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক তাকায়; মাথা নাড়ে, জননীর মুখে মুখ ঘষে, গা চাটে! তারপর হরিণীর কোলের কাছে পা মুড়িয়া এক বিচিত্র ভঙ্গিতে বসিয়া স্তন্যপান করিতে থাকে। হরিণী একবার ঘুম-চোখ খুলিয়া দেখে, তারপর আপন সন্তানটিকে কোলের কাছে পাইয়া নিবিড় আনন্দে আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

দৃশ্যটা সাধারণই। কুসুমও যে এমন দৃশ্য কখনো দেখে নাই, তাহাও নয়। তথাপি এই সাধারণ দৃশ্যই আজ অসাধারণ হইয়া দেখা দিল। কুসুমের সর্বাঙ্গ হঠাৎ কেমন যেন শির শির করিয়া ওঠে। সমস্ত দৃশ্যটা তাহার কাছে এক অজ্ঞাত রহস্যালোকের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া হাতছানি দেয়। সে হাতছানি কুসুম অবহেলা করিতে পারে না; নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়ায়। পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া যায়। হরিণীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া কুসুম দাঁড়ায়। তুলসী পাতার গন্ধে সমস্ত জায়গাটা অদ্ভুত এক বন্য ঘ্রাণে ভরা। নিশ্বাসের আকর্ষণে সেই ঘ্রাণ কুসুমের মনকে তীব্র ভাবে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। কুসুম অবাক বিস্ময়ে কি যেন দেখে, কি যেন খোঁজে। হরিণী ঘুমাইয়াছে, স্তন্যপানে তৃপ্ত ছাগ-শিশুটাও জননীর স্তনবৃন্তের কাছে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দূরে আবার ঘুঘুটা ডাকিয়া উঠিয়াছে—এক ঝলক হাওয়া বহিয়া গেল। তুলসী পাতার গন্ধটা আরও তীব্র হয়। সেই গন্ধে নেশাচ্ছন্ন কুসুমের মন স্রোত-কুণ্ডলীর অমোঘ আকর্ষণে ভাসমান নৌকার মত আগাইয়া যায়। অবশেষে কঠিন পাকের মুখে পড়িয়া অতল গর্ভে ডুব দেয়। কুসুম তলাইয়া যায়—এক অবর্ণনীয়, অনাস্বাদিত আকুলিত আকর্ষণ যেন তাহাকে দুরন্ত বেগে নিরুদ্দেশের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

কুসুম মন-সাগরের গভীর অতলে তলাইয়া গিয়া চোখ মেলিয়া দেখে, আলোয়, বর্ণে, ব্যঞ্জনায় সে এক স্বপ্নাতীত জগতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এখানের আকাশটা কী শান্ত, কী স্নিগ্ধ; এখানকার বাতাসে প্রগাঢ় নিদ্রার

আমেজ ! সিন্ধু গর্ভে কতোই না আশ্চর্য কুসুম ! কতো অব্যক্ত স্বাদ ! এক বিচিত্র ঝঙ্কারে তাহার হৃদয়খানিও মধুর ঐক্যতান সৃষ্টি করিয়া সুর ছড়াইতেছে। ঝুর ঝুর করিয়া এক পশলা রেণু উড়িয়া আসিয়া কুসুমের চোখের পাতা ভারী করিয়া তোলে। অর্ধনিমীলিত নেত্রে অলস পায়ে সে আগাইয়া যায়। দিকে এক অব্যক্ত মধুর গুঞ্জন। কিসের গুঞ্জন এ ! ওই যে পলকে কত না বর্ণালী পুষ্পের কুঁড়ি জাগে, ফুল ফোটে, ফলে ফলে রস আসে, রঙ ধরে, মাথা দুলাইয়া সবুজ পাতাগুলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, অত্যুষ্ণ বুকের তলায় ডানা চাপা দিয়া বিহঙ্গকুল সোহাগ ঝরায় এ গুঞ্জন কি তারই ! সৃষ্টির আনন্দে গাছ, লতা পাতা, ফল ফুল, পশু পাখি প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে অনুপলে যে হৃদয়খানি মেলিয়া ধরিতেছে এ গুঞ্জন সেই হৃদ্-ধ্বনির।

ফল ফুল, পাতার যবনিকা সরাইয়া হরিণীও কখন যেন ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়াছে। কুসুম হাত বাড়ায় ; হরিণী আরও কাছে আসে। হরিণীর গলা জড়াইয়া কুসুম মাটিতে বসিয়া পড়ে। হরিণীও ঘন হইয়া আসে। কুসুম হরিণীর মুখে গলায় হাত বুলাইয়া দেয়। মুখে মুখ চাপিয়া ধরে। শীতের হাওয়ার স্পর্শ পাইয়া ঘুমের ঘোরে সর্বাঙ্গ যেমন শির শির করিয়া ওঠে, দেহটা সঙ্কুচিত হইয়া আসে, কুসুমের দেহটাও তেমনি আশ্চর্য একটা স্পর্শানুভূতিতে সঙ্কুচিত, রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অজ্ঞান আবেগে কুসুম এবার হাত বাড়ায়—; হরিণীর অত্যুষ্ণ স্তনবৃন্তগুলি তাহার আঙুলের ছোঁয়া পায়। ঈষৎ কঠিন, বিদ্যুতস্পর্শ। রক্তকণিকারা চঞ্চল হইয়া ওঠে, একটা তড়িৎশিখা যেন বক্র গতিতে কুসুমের দেহটাকে বেড় দিয়া অদৃশ্য হয়। কুসুম আচ্ছন্ন, অবসন্ন। কয়েক বিন্দু শ্বেতসুধা। করপুট ভরিয়া প্রাণের দাক্ষিণ্য, স্নেহ ও জীবনের আনন্দময়তা। হরিণীর কী রূপ ! সে আর অসহায় চতুষ্পদ জীব নয়, একটা জীবন। সে জীবনে সেও জননী। যে অমূল্য রত্ন হরিণী বিলাইয়া দিল সে-রত্নের ভাণ্ডারখানি না জানি কত বিচিত্র !

আকস্মিক একটা আঘাত পাইয়া কুসুমের স্বপ্ন ভাঙ্গে। সম্বিত ফিরিয়া আসে। কুসুম দেখে, কখন যেন সে বাগানের কাছে আসিয়া হরিণীর পাশটিতে বসিয়াছিল। হাতখানিও আগাইয়া দিয়াছে। হাতটি সত্যসত্যই সিক্ত। হরিণী জাগিয়া উঠিয়াছে। ছাগশিশুও।

কুসুম উঠিয়া পড়ে। অজ্ঞানের ঘোরে টলিতে টলিতে সোজা নিজের ঘরে গিয়া খিল বন্ধ করে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে, ছায়া-ছায়া অন্ধকারে কুসুম নিজেকে আজ সম্পূর্ণ করিয়া দেখে। বিধাতা তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। হৃদয় পাত্র পূর্ণ করিয়া কুসুমেরও নৈবেদ্য সাজানো আছে। কিন্তু সে নৈবেদ্য অন্তঃসারশূন্য। এক কণাও সম্পদ নাই। সেখানে শুধু ব্যথা আর শূন্যতা, কাঠিন্য, কৃচ্ছ্রতা। এক বিন্দু স্নেহ ঝরে না। কুসুমের মনে হয় তাহার অধর-শোষণহীন যুগল পয়োধরে মরুর অন্তর্জ্বালা ও ব্যর্থতা। এ-ব্যর্থতা দেহের নয়, প্রাণেরই। কিন্তু কেন? অসহ্য বেদনায় কুসুমের বুকটা টন টন করিয়া ওঠে। চোখের জল নামে। কুসুম শুধু ভাবে একটা পশুর বুকেও যে ঐশ্বর্য ঠাঁই পাইয়াছে তাহার বুকে সেটুকুরও স্থান হইল না!

বৈকাল শেষ হয়, সন্ধ্যা নামে। কুসুম ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। গোঁসাইজী একবার ডাক দিয়া যান—কুসুম সাড়া দেয়না। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাও শেষ হয়, রাত নামে। কুসুম প্রদীপ জ্বালে না, কথা বলে না, দরজা খোলে না। অন্ধকারে, নির্জনে, স্খলিত-বসন কুসুম মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে।

রাত বাড়িয়া চলে। গোঁসাইজী আবার আসেন। ডাক দেন—'কুসুম, কুসুম!' কুসুম তবু সাড়া দেয় না। গোঁসাইজী আবার ডাকেন, দরজায় করাঘাত করেন। অবশেষে কুসুম জবাব দেয়—'যাই— '

গোঁসাইজী ঠাকুরঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কুসুম চৌকাটের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। গোঁসাইজী চোখ তুলিয়া তাকান।

কুসুমের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, সরব হৃৎপিণ্ডটা অশোভন ভাবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, উত্তেজনায় দেহটা থর থর করিয়া কাঁপে। তবু আজ সমস্ত বাধাকে মুহূর্তের জন্য জয় করিয়া কুসুম বলে, 'আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো, ঠাকুর।'

গোঁসাইজী বিস্মিত হন। একদণ্ড কুসুমের মুখের পানে তাকাইয়া থাকেন। অন্ধকারে কুসুমের মুখ দেখা যায়না। গোঁসাইজী শুধান, 'কিসের প্রায়শ্চিত্ত, মা?'

—পাপের। কুসুম এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া আবার বলে, 'এ-জন্মে কৃষ্ণ আর আমার কেউ নয়, ঠাকুর।'

গোঁসাইজী বিস্মিত হন না। তাঁহার ওষ্ঠে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া ওঠে; কেমন একটা আবেগে তাঁহার ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপে। সে-আবেগ দমন করিয়া গোঁসাইজী বলেন, 'কৃষ্ণ অনন্ত বিরহ ভোগ করেন, মা। জন্ম জন্ম কত লোকেরই তো তিনি আপনজন হতে পারেন না।'

একটু থামিয়া গোঁসাইজী তেমনি শান্ত ধীর গলায় আবার বলেন, 'কৃষ্ণ সমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণ নয় কুসুম যে, প্রতি পদে পদে তিনি ক্রটি ধরেন আর সমস্ত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুসুম চলিয়া যায়।

গোঁসাইজী কুসুমের যাওয়ার পথে অন্ধকারে চোখ মেলিয়া তাকাইয়া থাকেন। মনে পড়ে রাধারাণীর কথা। রাধারাণীও তাহার মেয়ের মত একদা সর্বস্ব দূরে ঠেলিয়া গোবিন্দের পাদপদ্মে শরণ লইতে চাহিয়া ছিল; সফল হয় নাই। নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে সে জোর করিয়া কন্যার হাতে তুলিয়া দিয়া গেল। একবারও ভাবিয়া দেখিল না, ধর্মটা মানুষের আত্মউপলব্ধির বস্তু— জোর করিয়া, অনুশাসনের বেড়ি পরাইয়া ধর্মকে রাখা যায় না। আর জীবনকে তো নয়ই।

গোঁসাইজীও কুসুমের আকুলতা দেখিয়া প্রথমটায় ভুল করিয়া ছিলেন। সে ভুল তাঁহার অল্পদিনেই ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলেন, মায়ের মত কুসুমও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া কাঙ্গালই হইয়াছে। আকুলতার সহিত তাহার হৃদয়ের সদ্ভাব নাই। হৃদয় ও মনের সদ্ভাব না হইলে কৃষ্ণ মেলে না। হৃদয় অঙ্গার, মন বায়ু, কৃষ্ণপ্রেম পাবক-শিখা। 'বায়ু বিনা সখি অনল জ্বলে না—অঙ্গার যতেক থাক্।'

উনানের আঁচ পড়িয়া গিয়াছিল, কয়লা দেওয়া হইয়াছে ; আঁচ আবার উঠিল বলিয়া। পদ্ম জোড়া-হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া পিঁড়িতে বসিয়াছিল। শীতের দিনে আগুন-তাপটা ভালোই লাগে।

রান্নাঘরের চৌকাটের সামনে নিঃশব্দে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। চোখ তুলিয়া পদ্ম দেখে অমর। প্রথমটায় বিশ্বাস হয় না। অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া পদ্ম অমরের উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়। অমরের বেশভূষা মলিন ; চোখ মুখ শুষ্ক, চুলগুলি বিশৃঙ্খল, চোখ দুটি লাল।

পদ্ম কোনো কথা বলে না। উনানের আঁচ লক্ষ্য করিতে থাকে। পদ্মর উদাসীনতা অমরের মনঃপুত হয় না। এতোদিন পরে অমর ফিরিয়া আসিল—পদ্মর মুখে একটু অন্তত সম্বর্ধনার হাসি ফুটিবে, ইহাই সে আশা করে। কিন্তু হাসি দূরে থাক পদ্ম এমন একটা ভাব দেখাইল যেন অমরের আসা-না-আসায় তাহার কিছু যায় আসে না।

—কি ব্যাপার, চিনতে পারছো না নাকি ?

পদ্ম সে কথার কোন জবাব না দিয়া বলে,—'ঘরে বসো। আসছি।'

আরও কয়েক মিনিট অমর সেখানে একই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পদ্মকে দেখে। পদ্মর শরীর বেশ খারাপ হইয়াছে। অনেক রোগা ও ফ্যাকাসে দেখায়। চোখ, মুখ দেখিলেই বুঝা যায় দুশ্চিন্তার কীট তাহার মনের ঘরে বাসা বাঁধিয়াছে, পাতা কাটিয়াছে অনেক—অনেক। অমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে, 'একটু তাড়াতাড়ি এসো। এইমাত্র ট্রেন থেকে নামলাম। বাসায় গিয়ে স্নান না করা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারছি না আর।'

অমর ঘরে গিয়া বসে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পদ্ম এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া ঘরে ঢোকে।

—তোমার দিদি ভালো আছেন ? চায়ের কাপটি আগাইয়া দিয়া পদ্ম প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, এক রকম ভালোই। অমর একটা চুমুক দিয়া আবার বলে, 'বনোদির কথা থাক্, তোমার কথাই বলো। কেমন আছো ?'

—ভালো না।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কী শরীরই করেছো ক'দিনে। অমর অনুযোগ জানায়, 'বোধ হয় ভেবে নিয়েছিলে আমি আর আসবো না। তাই না ?'

পদ্ম শাড়ির আঁচলে কপাল মুছিতে মুছিতে শান্ত গলায় জবাব দেয়, 'তা সে রকমই ভেবেছিলাম একসময়। পরে অবশ্য অন্য কথা ভেবেছি।'

—কি কথা ?

—আমার জন্যে আর তোমার আসবার প্রয়োজন ছিল না। পদ্ম একটু থামিয়া বলে।

—তাই নাকি ? তবে কার জন্যে আসার প্রয়োজন ছিল ? অমর পদ্মর গাম্ভীর্য ও স্বল্পভাষণকে অভিমানেরই নামান্তর বলিয়া মনে করে এবং সহাস্য লঘুস্বরেই কথাটা বলে।

—তা জানি না। তবে আমার জন্যে নয়।

—হঠাৎ এ-ধরনের সিদ্ধান্ত কবে করলে ? অমর তখনও লঘু স্বরে কথা বলিতেছে।

—বেশ কিছুদিন।

—চিঠিতে তো লেখোনি।

—আমি তোমায় এক মাসেরও বেশি কোন চিঠি লিখি নি।

—ও, সিদ্ধান্তটা তবে মাসখানেকের।

—তাই।

অমরের মুখের হাসি ক্রমশই মিলাইয়া আসিতেছিল। পদ্ম যে ভাবে কথাগুলি বলিতেছে তাহাতে ব্যাপারটাকে ঠিক অভিমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। চায়ের কাপ শেষ করিয়া অমর একটা সিগারেট ধরায়। বলে, 'এখন বাসায় চলি। খুব রেগে আছো দেখতে পাচ্ছি। রাগ একটু পড়ুক, বিকেলে আসবো।' অমর উঠিয়া পড়ে।

অমর চলিয়া যাইতেছিল, পদ্ম তাহার যাওয়ার পথে বাধা দিয়া কঠিন স্বরেই বলে, 'আমি মোটেই রেগে নেই। রাগ পড়ার অপেক্ষাও করো না। আমি তোমায় সত্যি সত্যি বলছি, তুমি আর এ-বাড়ি এসো না।'

মাথার উপরকার ছাদ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও অমর বোধ হয় এতোটা বিস্ময় অনুভব করিত না। পদ্মর কঠিন, দুর্বোধ্য মুখের দিকে তাকাইয়া অমর বিমূঢ় হইয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'ব্যাপার কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—বোঝার কিছু নেই। তুমি এ-বাড়িতে এসো না।

অমরের মুখটা হঠাৎ কালো হইয়া যায়। বুকটাও কাঁপিয়া ওঠে। শুষ্ক স্বরে প্রশ্ন করে, 'মাস্টারমশাই কি জানতে পেরেছেন?

—না।

—তবে?

—আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো না।

—যাবে না? অমর এবার বিস্ময়-নির্বাক, নিস্পন্দ।

—না।

—এখানে থাকবে?

—কোথায় থাকবো না-থাকবো জানি না! তুমি ছাড়া পেয়েছো, তুমি যাও।

—কিন্তু আমি যে একটা ব্যবস্থা করে তোমায় নিতে এসেছি। অমর আন্তরিক আবেগেই কথাটা বলে।

পদ্ম আর কোনো কথা বলে না। ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অমর পদ্মর হাত ধরিয়া ফেলে, 'পদ্ম—!' অমর দ্বিতীয় কোনো কথা বলিতে পারে না। তাহার ঠোঁট দুটি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, চোখের দৃষ্টিটাও স্থির।

পদ্ম একটুক্ষণ স্তব্ধ, অনড়; অমরের চোখে চোখে তাকাইয়া থাকে। পরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করে। বলে, 'আমি ছেলেমানুষী করছি না। আমায় একলা থাকতে দাও—একলা বাঁচতে দাও।'

তবু অমর পদ্মর হাত ছাড়ে না। বলে, 'সত্যি সত্যি তুমি যাবে না?'

—না।

—আমার ওপর আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই?

আবার একটা কঠিন অসহ মুহূর্ত। পদ্ম নীচু মুখে নিজেকে সামলাইয়া লইল। 'না—কিছুই নেই।'

পদ্ম দ্রুত পায়ে ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়। অমর স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত শেষ হয়। অমরের জ্ঞান, বোধ, চিন্তা, দৃষ্টি—সব যেন তালগোল পাকাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে অমরের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে চোখ তুলিয়া সে ঘরের মধ্যে চার-পাশে একবার তাকায়। সেই পুরাতন ঘর, সেই পুরাতন শয্যা,

সেই হেমন্তবাবুর গলাবন্ধ কোট, আলনায় পদ্মর শাড়ি। শূন্যঘরের মাঝে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অমর হঠাৎ অনুভব করে, পদ্মকে শ্মশানে দাহ করিয়া এই মুহূর্তে সে যেন ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত বুকটা অসম্ভব শূন্য হইয়া যায়।

অমর ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। উঠানে কেহ নাই- শুধু শীতের রোদ আর কটা চড়ুই পাখি।

বিকালে অমর আবার আসিয়াছে। পদ্ম দেখা করে নাই। অমর চেষ্টা করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিল না। অগত্যা সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া গিয়াছে, আর ভাবিয়াছে, পদ্মর হঠাৎ কি এমন হইল? অবধারিত ঘটনাটাকে হঠাৎ এমন ভাবে বানচাল করিয়া দিবার কারণ কি? পদ্মর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু না জানা মোটেই স্বস্তিকর নয়। কি যে হইল কে জানে। পদ্ম কি করিবে? তাহার বর্তমান, ভবিষ্যতই বা কি? অমরের মনে শত চিন্তার ঢেউ তোলপাড় করে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একসময় মনে হয়, পদ্ম আত্মহত্যা করিবে না তো! আত্মহত্যার কথা মনে হইতেই অমরের সারা শরীর হিম হইয়া আসে। অমর ভাবে আর ভাবে, কোন কূল কিনারা করিতে পারে না। সারারাত জাগিয়া ঘরময় পায়চারি করে; সিগারেটের স্তূপ জমায়। শেষ রাতে সূর্যশংকর বেহুঁশ অমরকে ঘরের মেঝে হইতে তুলিয়া লইয়া নিজের বিছানায় আনিয়া শোয়ায়।

সে রাত্রে পদ্মও শেষবারের মত তাহার মনস্থির করে। নিজের উপর তাহার আর এক তিলও বিশ্বাস নাই। এখানে থাকিলে কোন মুহূর্তে যে সে কি করিয়া বসিবে কে জানে! বিশেষত অমর ফিরিয়া আসিয়াছে। ভীষণ ভয় হয়, একটা গণ্ডগোলের মাঝে পড়িয়া পদ্মর সঙ্কল্প না ব্যর্থ হইয়া যায়।

মাঝরাতে পদ্ম বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। হেমন্তবাবু অঘোরে ঘুমাইতেছেন। অন্ধকার ঘরে টাইম্‌পিস্ ঘড়িটা টিক টিক করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে—একটানা একটি মাত্র শব্দ। পদ্ম সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। কনকনে শীত; কুয়াশার ঘনতায় কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। তিথিটা বোধ হয় পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা কিছু হইবে। অজস্র জ্যোৎস্না ভিজা কুয়াশার সহিত গায়ে গা জড়াইয়া একটা সাদা

চাদরের মত ঝুলিতেছে। পদ্মর শীত করে; থাকিয়া থাকিয়া সে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিয়া ওঠে—তবু ঘরে যায় না। এই নিস্তব্ধ শ্বেতরাত্রি তাহার ভালো লাগে। ভালো লাগে বিশ্বচরাচর ঢাকিয়া রাখা ওই ঘন কুয়াশা। পদ্ম যেন মনে মনে এমনই একটা স্থান চায়—নির্জন, নিঃসঙ্গ, গোপন। পৃথিবীতে কি এমন একটা স্থান নাই—যেখানে পদ্ম সকলের চোখের আড়ালে তাহার বাকি জীবনটা ক্ষয় করিয়া দিতে পারে। পদ্ম তো আর কিছু চায় না, এই বিরাট বিশ্বে এমন একটু স্থান খোঁজে যেখানে লোকচক্ষুর শ্লেষ, ব্যঙ্গ তাহাকে বিঁধিবে না, যেখানে পদ্মর মাতৃত্ব একটা কুৎসিত ইঙ্গিতের পরিচয় বহন করিবে না। নিজের মাতৃত্ব সম্পর্কে পদ্মর আজো একটু স্বপ্ন আছে। সংসারের সমস্ত আবর্জনার বাহিরে নিজের সন্তানকে সে মনের মত করিয়া মানুষ করিবে। মানুষের কাছে পদ্ম আর কিছু আশা করে না। আশ্রয়, বিশ্বাস, নির্ভরতা, শান্তি, মঙ্গল—মানুষ কি তাহাকে দিয়াছে? যদি সে বিশ্বাসই থাকিবে তবে আর আজ পদ্ম অমরকে ফিরাইয়া দিল কেন? পদ্ম জানে, মানুষ মানেই চিন্ময় আর অমর। তাহারা পুলিশের ভয়ে, না হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে তোমায় হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে আসে। স্বার্থের যোগ রাখিয়াই তাহাদের যাওয়া-আসা। যেদিন মন চাহিবে, ফুটা পাত্রের মত লাথি মারিয়া তোমায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। পদ্ম তেমন আশ্রয় চায় না, তেমন গৃহে তাহার আর লোভ নাই। ভালোবাসিয়া যে গ্রহণ করিল না, পদ্ম তাহার হাজার সাধুত্বকেও বিশ্বাস করে না। সে একাই গৃহত্যাগ করিবে। এবং কালই।

কে যেন গায়ে হাত দেয়। পদ্ম ভীষণভাবে চমকাইয়া ওঠে। হেমন্তবাবু।

—এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো এতো রাত্রে?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়া পদ্ম ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করে।

হেমন্তবাবু আবার প্রশ্ন করেন, 'অমনভাবে ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন? হয়েছে কি তোমার?'

—এমনি। মনে হলো কে যেন ডাকছে। পদ্ম হঠাৎ গলায় অদ্ভুত এক স্বর আনিয়া বলে, 'আমাকে বোধ হয় নিশিতে পেয়েছিলো!' বিছানায় শুইয়া পদ্ম গায়ে লেপ টানিয়া লয়।

—নিশিতে পাওয়া ভালো কথা নয়। মাঠে-ঘাটে টেনে নিয়ে ঘাড় মট্‌কে দেবে! হেমন্তবাবুও বিছানায় গা মেলিয়া হাল্কা স্বরে জবাব দেন।

পদ্মকে নিশিতেই পাইয়াছিল কি না কে জানে তবে পদ্ম ঘরের বাহিরে পা বাড়াইবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইল। সামান্য কিছু টাকা ছিল হেমন্তবাবুর। পদ্মর বাক্সেই। কিছু টাকা পদ্ম আলাদা করিয়া হাতবাক্সে রাখিল। তাহার সামান্য যাহা গহনা ছিল সেই গহনাগুলিও একটি ছোট কৌটায় ভরিয়া লইল। দু-চারখানা শাড়ি আর জামা। গোছ-গাছ করিয়া পদ্ম একটা পুঁটলি বাঁধিল—ছোট্ট পুঁটলি। কোনোরকমে খিদরগাঁও পৌছিতে পারিলে পদ্ম নিশ্চিন্ত। সেখানে কেহ তাহাকে চেনে না, জানে না। গাড়ি বদল করিবার সময় টিকিট কাটিয়া লইবে। যতো ভয় এখানে। বাড়ি হইতে গাড়ি—ক' পা মাত্র যাওয়ার অপেক্ষা, কিন্তু এই যাওয়াটুকুর মধ্যে ধরা পড়ার সম্ভাবনা পদে পদে। তবু যা হোক শীতকাল, গাড়ি ছাড়িতে ছাড়িতে অনেকটা অন্ধকার হইয়া আসে—লোডিং-এর দেরি হইলে তো কথাই নাই, গাড়ি ছাড়িতে বেশ অন্ধকার হইয়া যাইবে। সোজা পথে যাওয়া চলিবে না, ঘুরপথে গিয়া পিছন দিক দিয়া গাড়িতে উঠিতে হইবে।

এমনি করিয়া পদ্মর দুইদিন কাটিল। ইতিমধ্যে অমর আবার স্টেশনে আসিয়াছে, রেলকোয়ার্টারের কাছে ঘোরাঘুরি করিয়াছে। কোনটাই পদ্মর চোখ এড়ায় নাই। আর একদিনও অপেক্ষা করার ইচ্ছা পদ্মর ছিল না। পদ্ম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

সেদিন সকালেই পদ্ম ঘর-দোর পরিষ্কার করিল, স্নান করিল বেলাতে। হেমন্তবাবু মাংস খাইতে ভালোবাসেন। শিবলালকে দিয়া পাওয়ারহাউসের ফটক হইতে মাংস আনাইয়া রাঁধিল। আরও টুকটাক রান্না হেমন্তবাবু যা ভালোবাসেন।

দুপুরে পদ্ম যখন ঘরে আসিল তখন শীতের বেলা পড়োপড়ো। পদ্মর ডাকে হেমন্তবাবু উঠিলেন। তিনি যে ঘুমাইতেছিলেন তাহা মনে হয় না। বোধ হয় খাওয়াটা বেশি হইয়া পড়ায় ভদ্রলোক তন্দ্রার ঘোরে ছিলেন।

হেমন্তবাবু অফিস চলিয়া গেলে পদ্ম এবার দু' দণ্ডের জন্য চুপ করিয়া বসিল। সমস্ত দিনটাই কেমন যেন মনে হইতেছে। নিত্যদিনের এই ঘরখানাও আজ কেমন লাগে! মনে হয়, এই ঘরে এতদিন থাকিয়াও পদ্ম ঘরের আশ্চর্য নিবিড়তাটুকু এমন করিয়া অনুভব করে নাই। পদ্মর বুকটা বড় ফাঁকা হইয়া

যায়; আনমনা পদ্ম ঘরের মধ্যে ঘুরঘুর করে, এটা-সেটা নাড়ে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

বিকালের গোড়ায় শিবলাল চা লইতে আসিল। পদ্ম প্রশ্ন করে—'মাস্টারজীনে নেহি আয়েগা ?'

মাথা নাড়িয়া শিবলাল জানাইল, না। বলিল, মাস্টারজী জরুরী কাজ করিতেছেন। এখন আসিতে পারিবেন না।

শিবলালের হাতে চায়ের পাত্র তুলিয়া দিয়া পদ্ম তাহাকে বলিয়া দিল, মাস্টারজীকে যেন সে জানাইয়া দেয় যে, পদ্ম গোঁসাইজীর কাছে যাইতেছে। সন্ধ্যার পর ফিরিবে। সঙ্গে লছমী থাকিবে। কাহাকেও পাঠানোর দরকার নাই। তাহারা একলাই ফিরিয়া আসিবে।

দেখিতে দেখিতে সূর্যের আলো নিভিয়া আসিল। স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে; মালগাড়ি লাগিয়াছে; ইঞ্জিনও স্টীম লইতেছে। পদ্ম জানালা দিয়া দেখে। আর সময় নাই। পদ্মর বুক দুরুদুরু করে, ঠোঁট-জিব বারবার শুষ্ক হইয়া ওঠে। কে যেন পিছন হইতে টানিতেছে, কে বুঝি বিরাট একটা শূন্যতার বোঝাকে পদ্মর মনের চাকায় বাঁধিয়া গড়গড় করিযা গড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আর নয়, আর দেরি নয়। ট্রেন ছাড়িয়া দিবে। পদ্ম জানালার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলাইয়া লয়। এ-দেশী একটা রঙ-জব্‌জবে শাড়ি পরিল পদ্ম—শাড়ি পরার ধরনটাও করিল এ-দেশীয়। এবার চলো, পদ্ম এবার চলো। পদ্মর বুকের কাঁপন তীব্র হয়। কালীর একটা পট টাঙানো ছিল ঘরে। পদ্ম গলায় আঁচল দিয়া পটের কাছে দাঁড়াইল। চোখ বন্ধ। মনে মনে পদ্ম প্রার্থনা করে। কি প্রার্থনা, কে জানে।

পদশব্দে পদ্ম হঠাৎ চোখ খুলিয়া দেখে দরজার গোড়ায় হেমন্তবাবু। কেমন একটা হন্তদন্ত ভাব।

পদ্ম ধরা পড়িয়া যাওয়ার মত বিবর্ণ, বিমূঢ়, নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পুঁটলিটা টেবিলের উপর।

হেমন্তবাবু এক মুহূর্ত পদ্মর দিকে তাকাইয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, পদ্মর এই অদ্ভুত বেশভূষা কিছুই যেন তাঁহার চোখেই পড়ে না।

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলেন, 'ছোট বৌ, শীগ্রি আমার একটা ধুতি কোট বের ক'রে দাও। এই গাড়িতেই ছিঁদোয়াড়া যেতে হবে। কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে

গেছে গো।' হেমন্তবাবু গায়ের কোটটা খাটের উপর ফেলিয়া দেন। আবার বলেন, 'হাত-মুখে একটু জল দিয়ে নি। খাবার-দাবারের দরকার নেই—শুধু এক পেয়ালা চা চট্ করে তৈরি করে দাও। মিনিট দশেকের বেশি গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবো না বাপু, অনেক লেট্ হয়ে গেছে।' কথার শেষে হেমন্তবাবু গামছাটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যান।

পদ্মর পা আর পা নয়, পাথর। কি যে হইল, কি যে শুনিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতেই বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু আশ্চর্য, পদ্ম যেন অনেকটা স্বস্তি পায়। তাহা হইলে শেষমুহূর্তে সে ধরা পড়ে নাই! উঃ, কি ভয় যে হইয়াছিল পদ্মর! দ্রুত হাত পুঁটলিটি সরাইয়া রাখে।

চা খাইয়া কাপড়-জামা ছাড়িয়া হেমন্তবাবু প্রস্তুত হইলেন। সামান্য কিছু টাকা পকেটে পুরিয়া তিনি উঠিলেন।

—সাবধানে থেকো। রাত্তিরে লছমিটাকে ডেকে নিয়ো। শিবলালকে বলা আছে—নজর রাখবে। পরশু সকালে ফিরবো। আসি—। দুর্গা দুর্গা। হেমন্তবাবু কালীর পটের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম জানাইয়া বাহির হইয়া যান।

পদ্ম জানালা দিয়া দেখে। হেমন্তবাবু গার্ডের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ব্রেকে উঠিলেন। গার্ডের সিটি বাজিল, সবুজ ফ্ল্যাগ দুলিয়া উঠিল। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে। হেমন্তবাবু শিবলালকে ডাকিয়া কি যেন বলিতেছেন। ভীতু মানুষ। শিবলালকে বারবার হয়তো সাবধান করিয়া দিতেছেন। স্টেশনের চাবি যেন ভালো করিয়া রাখে। কাল সকালে খিদরগাঁও হইতে রিলিফ আসিলে যেন তাহাকে চাবি দেয়, তাহার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখে; বাড়ির উপর নজর রাখে। এমন কত কি!

গাড়ি ছাড়িল। পদ্মর চোখের উপর দিয়া শীতের পড়ন্ত বৈকালের আবছা অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়িটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল। দূরাগত শব্দটাও একসময় মিলাইয়া গেল। পদ্ম জানালা ছাড়িয়া নড়িল না। ফাঁকা রেল লাইনের দিকে চোখ রাখিয়া পদ্ম ভাবিতেছিল, যাওয়ার কথা তাহার, অথচ হেমন্তবাবুই চলিয়া গেলেন, পদ্ম পড়িয়া থাকিল। ভাবিতে ভাবিতে পদ্মর মনে হইল, এ ভালোই হইয়াছে। আগামী কাল বাড়ি ফাঁকা। হেমন্তবাবু থাকিবেন না। কাল সেও অনেক সহজ উপায়েই গাড়ির কামরায় আসন করিয়া লইতে পারিবে! ধরা পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

—মাজী!

পদ্ম জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া তাকায়। বারান্দায় দাঁড়াইয়া শিবলাল তাহাকে ডাকিতেছে। পদ্ম বারান্দায় আসে।

—মাস্টারজীনে বোলে উন্‌কো জেব্‌কে আন্দর এক চিঠ্‌ঠি হ্যায় আপ্‌কা। মাস্টারজীকো ইয়াদ না থা—।

শিবলাল চলিয়া যায়। পদ্ম আবার ঘরে আসে। বিছানার উপর অফিসের কোটটা তখনও পড়িয়া আছে। কাহার চিঠি আসিল আবার? পদ্মকে চিঠি লেখার লোক মাত্র দু-তিনজন। তাহার মধ্যে একজনের চিঠির পাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে সেই লোকটাই নাকি? অমর! অমর চিঠি দিবে কেন? কি দুঃসাহস লোকটার, আবার চিঠি দিয়াছে! যদি অমরের চিঠি হয়, পদ্ম না পড়িয়াই আগুনে দিবে।

পদ্ম চিঠিটা বাহির করে। রেলের খাম। মুখ আঠা দিয়া বন্ধ। খামের উপরে লেখা, শ্রীযুক্তা পদ্মরানী ঘোষ। হাতের লেখাটা হেমন্তবাবুর। পদ্মর সর্বাঙ্গ যেন হঠাৎ অসাড় হইয়া আসে। মুখ বিবর্ণ। হাত-পা ঠাণ্ডা। হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করিতেছে।

চিঠি হাতে করিয়া পদ্ম অনেকক্ষণ ভীত, আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া থাকে। ভয়, ভাবনা, কৌতূহলের বিচিত্র অনুভূতিগুলি পদ্মকে তিলে তিলে জর্জরিত করিতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে সাহস সংগ্রহ করিয়া পদ্ম খামটা ছেঁড়ে। দীর্ঘ চিঠি। পদ্মর হাত কাঁপিতে থাকে। রুদ্ধনিশ্বাসে পদ্ম চোখের সমস্ত দৃষ্টিশক্তিটুকু ব্যয় করিয়া পড়িতে থাকে—

পরমকল্যাণীয়া ছোটবৌ, আমি সামনে থাকিলে পাছে মনস্থির করিতে তোমার কষ্ট হয় তাই ছিঁদোয়াড়া যাইতেছি। পরশু সকালের ট্রেনে ফিরিব। তুমি মনস্থির করিবার যথেষ্ট সময় পাইবে। আমি তোমার সকল কথাই অবগত আছি এবং এ বিষয় লইয়া যথেষ্ট ভাবিয়াছি। ঘটনাটি জানার পর আমার মনে বিজাতীয় একটা ঘৃণা হইয়াছিল, তোমাকে অত্যন্ত খারাপ স্বভাবের স্ত্রীলোক এবং কুলটা বলিয়া ভাবিয়াছি। পরে অমার এ-ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। নিজের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, আমার কৃত অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফলই ঈশ্বর আমায় দিয়াছেন। অক্ষম, রুগ্ন দেহ, প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে এ-ধরনের বিবাহ যে কী মারাত্মক হইতে পারে তাহা দেখিলাম এবং বুঝিলাম। অপরাধ তোমার যেরূপ, আমারও তাহা অপেক্ষা

কম নয়। আমার মনে হয়, নিজের শারীরিক ব্যাধিটাকে লুকাইয়া তোমায় বিবাহ না করিলে তুমি কখনোই এরূপ করিতে না। যাহা হউক, আমি বহু ভাবিয়া অবশেষে বুঝিয়াছি, ঈশ্বর আমায় যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব। সংসারে আমি একা। মৃত্যুর পথে পা বাড়াইয়াছি। তুমি ছাড়া আমার নিকট অন্তরঙ্গ আত্মীয় কেহ নাই। এ-বয়সে তোমায় হারাইতে ইচ্ছা করে না। যখনই মনে হয় তুমি থাকিবে না—এ-সংসারকে তখনই সেবা-সান্ত্বনাহীন একটা ইটকাঠের খাঁচা বলিয়া মনে হয়। শূন্য সংসার লইয়া আমি কি করিব! কেমন করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত বাঁচিব? ছোটবৌ, আমি দেহের অক্ষমতার জন্য তোমায় যদি নিজের করিয়া গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকি, আমার স্নেহের দ্বারা, শুভেচ্ছার ও যত্নের দ্বারা আপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আজও সেই চেষ্টা করিলাম। তুমি থাকো। আমি যে-দিন চলিয়া যাইব—তোমার যেখানে খুশি চলিয়া যাইও, বাধা দিতে আসিব না। তোমার কাছে যে আসিবে, তাহাকে আমি সন্তানবৎ গ্রহণ করিলাম। সপত্নী-সন্তানদেরও তো তোমরা গ্রহণ করো, মানুষে দত্তক পুত্রও গ্রহণ করে। আমি কেন [illegible] না। ইহাই যখন আমার নিয়তি। যদি গৃহত্যাগ না করো, আ[illegible] যে কত সুখী হইব তাহা ভগবানই শুধু জানেন। আর যদি তুমি চ[illegible] যাও, একবার শুধু ভাবিয়ো—অসহায় রুগ্ন স্বামীকে কাহার হাতে দিয়া যাইতেছ। আশীর্বাদ লইও। ইতি—

একবার, দুইবার, তিনবার—পদ্ম বার কয়েক চিঠিটার আদ্যোপান্ত পড়ে। তাহার পর বাজ-পড়া একটা গাছের মত জীবনের সমস্ত অনুভূতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া বসিয়া থাকে।

সময় বহিয়া যায়। সন্ধ্যা ঘন হইয়া জানালা ভেদ করিয়া ঘরে ঢোকে, কুয়াশা আরও গাঢ় হয়, শীতের চাবুকের চোট আরও তীক্ষ্ণ; পদ্ম তবু ওঠে না। ঘর অন্ধকার; টাইমপিস ঘড়িটা টিক টিক করিয়া বাজিয়া যায়, কাছেই একটা কুকুর কাঁদিতেছে, জানালার বাহিরে জ্যোৎস্না-কুয়াশার জাল ফেলিয়া কে যেন নিঃশব্দে পদ্মকে হাতছানি দেয়। পদ্ম তবু ওঠে না।

রাত বাড়ে। বিছানায় বালিশে মুখ চাপিয়া পদ্ম অনেক, অনেক চোখের জলে তাহার বুকের বোঝাটা হাল্কা করে। বালিশের কানে কানে নিশ্বাসের সুরে সুরে পদ্ম যেন নিজের সকল কথা উজাড় করিয়া দেয়। বলে: এমন

করে আমায় তুমি কেন বাঁধলে গো। এর যে বড় জ্বালা। আমার চোখের সামনে যতদিন অন্য পুরুষের এই সন্তান আর তুমি একসাথে থাকবে ততক্ষণ যে আমি জ্বলে-পুড়ে মরবো। বিষ খেয়েছি, তার জ্বালা আমায় সহ্য করতে দাও, সে জ্বালা দ্বিগুণ করো না।

জ্যোৎস্না-কুয়াশার রাত্রে পদ্মকে আবার নিশিতে ডাকে। পদ্ম বাহির হইয়া আসে। সে মরিবে। সকল জ্বালার অবসান হইবে। আত্মহত্যা করার কথা পদ্মর যে কোনদিন মনে হয় নাই—তাহা নয়, তবে সে ইচ্ছার সামান্য মাত্র তীব্রতা ছিল না। আজ কিন্তু এই ইচ্ছাটাই তীব্র হইয়াছে। আত্মহত্যার মধ্যে সব শেষ। মৃত্যু তাহার বিরাট কৃষ্ণবক্ষে তোমার সব অপরাধ ঢাকিয়া দিবে, সব ব্যথা নিরাময় করিবে।

মরিতে গিয়াও পদ্ম মরিতে পারিল না। একটা গাড়ির গুরুগুরু শব্দ তাহার বুকটাকে হঠাৎ দমাইয়া দিল। এতো রাত্রে গাড়ি? কচিৎ কখনো এমন হয়। শুধুই একটা মালগাড়ি আসে। কয়লা বোঝাইয়ের তাড়া আর চাপ থাকিলেই তবে। আজ কি সেই গাড়ি আসিল! হেমন্তবাবুও ফিরিয়া আসিলেন। আসিলেও আসিতে পারেন। অসম্ভব নয়। তাঁহার কাজ তো চুকিয়া গিয়াছে। গাড়ির শব্দে শিবলাল লাফাইয়া উঠিল। হাঁক-ডাক শুরু করিল। বাতি জ্বালাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পদ্ম আবার ঘরের বিছানায়। হেমন্তবাবু হয়তো এখুনি আসিবেন।

সময় বহিয়া যায়, হেমন্তবাবু আসেন না। স্পেশাল্ গুডস্‌ট্রেনই আসিয়াছে; সেই ট্রেনে রিলিফ আসিয়াছে খিদিরগাঁও হইতে।

দিনের আলো ফুটিল। রাত্রের দুঃস্বপ্ন দিনে আরও ভয়ংকর হইয়া দেখা দিল। সারাদিন পদ্ম মনের দ্বন্দ্বে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিল। দিন শেষ হয়, দুপুর শেষ হয়, সন্ধ্যা নামে, অবশেষে রাত।

পদ্ম তবু মনস্থির করিতে পারে না। আত্মহত্যা সে করিবে না, মরিতে ইচ্ছা নাই। এ গৃহেও থাকা চলিবে না। হেমন্তবাবু যতোই বলুন, পদ্ম তো মানুষ! কোন মুখে সে স্বামীর কাছে দাঁড়াইবে! তাঁহার অসীম ক্ষমার মুখামুখি দাঁড়াইয়া পদ্ম নিয়ত বিবেকের যে বৃশ্চিকদংশন-জ্বালা অনুভব করিবে, সে জ্বালার তুলনা কোথায়? তবে! গর্ভের সন্তানটাকে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলিবে। তাহাতেই বা কি লাভ! অতীত তো আর মুছিয়া যাইবার নয়।

পদ্মর আজ মনে হয়—একদা একটি সন্তানের আশায় সে যতটা ব্যাকুল হইয়াছিল, আজ সেই সন্তানটির জন্য তাহার ঘৃণার অবধি নাই। পরম শত্রুকেও মানুষ এমন বিষচক্ষে দেখে না। যে মাতৃত্বের লোভে সমাজ সংসার, নীতি, ন্যায় অন্যায় সমস্তই সে তুচ্ছ করিয়াছে, আজ সেই মাতৃত্বই তাহার কাছে বিষম ভার লাগিতেছে। কলঙ্কচিহ্ন ছাড়া এ-মাতৃত্বের আর কি শুভচিহ্ন আছে! পদ্ম যাহা পাইয়াছে, হয়তো তাহা সম্পদই। ধরো শ্রেষ্ঠ সম্পদ—কিন্তু সম্পদ আহবণের নীতিটা তাহার অপহরণের নীতি। শঠতা, চাতুরী, বিশ্বাসভঙ্গের নীতি। তুমিই বলো পদ্ম, চুরি করিযা কৃষ্ণবিগ্রহ চুরি করিলেও সে চোরই, সাধু নয়। ইহা ছাড়া একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার বিচারবুদ্ধিটাও কতো সঙ্কীর্ণ। একচক্ষু হরিণের মত তোমার দৃষ্টি ছিল একদেশদর্শী। সংসারে যাহা পাও নাই তাহা লইয়া নিবন্তর বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে অভিযোগ স্তূপীকৃত করিয়াছ—মনের আকাশ কালো হইয়াছে। কিন্তু যাহা পাইয়াছিলে তাহার মূল্য তো কখনো দাও নাই। স্বামী তোমার বিরাট একটা অভাব মিটাইতে পাবেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি যাহা মিটাইয়াছিলেন তাহাও কি কম—! ওই অগাধ স্নেহ, নিবঙ্কুশ প্রীতি, অপাপ শুভেচ্ছা, পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাস—এ-সংসারে কি খুবই সুলভ। যদি তাহাই হইত, তবে কেন আজ এই মনস্তাপ, কেন অমবেব সহিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিলে না।

রাত শেষ হইয়া আসে। আর খানিকটা পবেই আকাশ ফরসা হইয়া আসিবে। আব কতক্ষণ! হেমন্তবাবু সকালের গাড়িতেই ফিরিযা আসিবেন। যাবার বেলা যে বহিয়া গেল!

পদ্ম বিছানা ছাড়িয়া উঠে। হেমন্তবাবুব চিঠিটা বিছানার উপরই পড়িয়া ছিল, আঁচল লাগিয়া মাটিতে উড়িয়া গিযা পড়ে

প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে ইজিচেয়ারটা আরো একটু আগাইয়া লইয়া সূর্যশংকর পা দুটি টান টান করিয়া মেলিয়া দেয়। কড়া তামাকের নেশায় সূর্যশংকরের মনের চিন্তাগুলিও পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মত ভাসিয়া উঠিতেছে।

চা আনিবার হুকুম লইয়া বাহাদুর চলিয়া যায়। আজকের ডাকের চিঠি-গুলির কথাই সূর্যশংকর ভাবিতেছে। দুখানা চিঠিই আজ বিকালে হাতে আসিল। কলিকাতার হেড অফিস হইতে একটি চিঠি আসিয়াছে, অপরটি অমরের।

কোনোটাই তুচ্ছ করার মত চিঠি নয়।

হেড অফিস হইতে মালিকপক্ষ জানাইয়াছেন, কোম্পানী সূর্যশংকরের অনুরোধ মানিয়া লইতে পারে না, দাবিও নয়। বে-আইনী কাজ কোম্পানী করিতে পারে না। সুতরাং সূর্যশংকরের অপর প্রস্তাবটি তাহারা মানিয়া লইল—অর্থাৎ কোম্পানী তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিল। নূতন ম্যানেজার নিয়োগ করিয়া পাঠানো হইতেছে। তিনি ছোটকিমাতলায় পৌঁছিলে সূর্যশংকর তাহার কর্মভার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইতে পারে।

চাকুরী খোয়ানোর জন্য সূর্যশংকরের মনে তিলমাত্র দুঃখ নাই। স্বেচ্ছায় সে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছে, সুতরাং দুঃখ হওয়ার কোন কারণ নাই। তবু দুঃখই বলো বা বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা যাহাই বলো, সেটা হইয়াছে সূর্যশংকরের সমস্ত চেষ্টাটাই বিফল হইয়াছে বলিয়া। আজ কয় মাস ধরিয়া কতো লেখা-লেখি, অনুরোধ, কতো নীতির বাণী, সবই বিফলে গেল। রামভরতের মৃত্যুর জন্য কোম্পানী দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না। কারণ? কারণ রামভরত টিপসই না দিয়াই খাদে নামিয়াছিল, আইনত প্রমাণ হয়—'অন্-ডিউটি'তে সে দুর্ঘটনায় পড়িয়া মারা যায় নাই। স্বেচ্ছায় সে খাদে নামিয়াছিল, কাজে কাজেই রামভরতের জীবনের ক্ষতিপূরণ দিতে কোম্পানী বাধ্য নয়।

মালিকদের সহিত এই বিষয়টি লইয়া আজ তিন-চার মাস হইতে সূর্যশংকরের বিবাদ বাধিয়াছিল। সূর্যশংকর বলে, চুলায় যাক তোমার টিপসহি। তাড়াতাড়িতে রামভরত টিপসহি না দিয়া খাদে নামিয়াছিল।

এমন ঘটনা কি হয় না? কতোই তো হয়। উপরন্তু আমি ম্যানেজার, আমার সহিত লোকটা ছিল, আমি তাকে স্বচক্ষে দুর্ঘটনায় মরিতে দেখিলাম; কুলি-কামিন অফিসের সকলেই দেখিল—অমন জোয়ান পুরুষটা সুস্থ দেহে খাদে নামিল, আর উঠিয়া আসিল একটা মাংসপিণ্ডতে পরিণত হইয়া—তথাপি কোন নীতিতে সে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অযোগ্য হইল? আর আইন। সূর্যশংকরের অসহ্য রাগ ধরে; কোলিয়ারীর আবার আইন! তথাপি না হয় বুঝিলাম, টিপসহি না দিয়া খাদে নামা বে-আইনী হইয়াছে, কিন্তু তোমার একজন কর্মচারী যে মারা গেল, সে কথাটা তো মিথ্যা নয়। গরীব একটা কুলির অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার স্ত্রীকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে তোমাদের আপত্তি হইবে কেন?

বাহাদুরের ডাকে সূর্যশংকরের তন্ময়তা ভাঙে। বাহাদুর চায়ের পাত্র ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

—চা ঢাল্। চা ঢালার হুকুম দিয়া সূর্যশংকর এই সরল বিশ্বাসী লোকটার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া থাকে।

বাহাদুর চা ঢালিয়া দেয়। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়া সূর্যশংকর বলে, 'কাল থেকে তোর অনেক কাজ, বাহাদুর। আমার জিনিসপত্র যা আছে গুছিয়ে বাঁ দিকের ঘরে সব টাল করে রেখে দিবি। এ খাট, টেবিল, চেয়ার সমস্তই কোম্পানীর। এ সব যেমন আছে তেমনি থাকবে। নতুন সাহেব আসছে। এখানেই থাকবে। আমি চলে যাচ্ছি।'

বাহাদুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। সূর্যশংকর তাহার চাকুরী যাওয়ার ব্যাপারটা বাহাদুরকে বুঝাইয়া দেয়।

কথার মর্ম বুঝিতে পারিয়া বাহাদুরের মুখের চেহারাটাই বদলাইয়া যায়।

—তোর ভাবনাটা কিসের? নতুন সাহেবের কাছে থাকবি। সূর্যশংকর সান্ত্বনা দেয়।

বাহাদুর আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবে এবং অবশেষে ব্যথিত মনে চলিয়া যায়।

অমরের চিঠির কথাটা সূর্যশংকরের এবার মনে পড়ে। কলিকাতায় পৌঁছাইয়া অমর চিঠি দিয়াছে, দীর্ঘ চিঠি। সে চিঠিতে অনেক কথা আছে, বনলতার কথাও। বনলতা পিতৃগৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

বনলতার জন্য সূর্যশংকরের কোন চিন্তা নাই। দুঃখ অমরের জন্য। তারুণ্যের দোষগুণ মেশানো এই বয়ঃকনিষ্ট স্নেহভাজন বন্ধুটি তাহার বাস্তবিকই জীবনের জটিল প্রবাহে ভাসিয়া গেল। সাধারণ, দুর্বলচিত্ত যুবক। পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। পৃথিবী অত সরল নয়। আর মানুষ তো বড়ই জটিল। মানব প্রকৃতি জটিলতম। অমরের মনের কিশোর কৌতূহল তাহাকে ভালোমন্দ ভাবিতে দেয় নাই। বিশেষত যে-আকর্ষণের মোহে মুগ্ধ হইয়া অমর মন্ত্রমুগ্ধ দুর্বল পশুর মত একটি সর্বনাশের মুখে গিয়া পড়িয়াছে সে-আকর্ষণ রোধ করার মত শক্তি তাহার ছিল না। ক'জনেরই বা থাকে? মনে পড়ে অমরের চিঠির কথা—'আমরা বাইরে যা ভেতরে তা নই, সূর্যদা। ভেতর বাইরে যদি এক হতাম তা হলে বিবেকের পাট বলে মানুষের কিছু থাকতো না। মানুষের বিবেক আছে, তা অল্প হোক কি বেশি হোক। এই বিবেকের আয়নায় স্বরূপ দেখার পর আমার আর কেনে আত্মমোহ নেই। প্রত্যহ নিজেকে ধিক্কার দি। এ বিবেক-জ্বালা অসহ্য। এর চেয়ে আত্মহত্যা ভাল। তবুতো জ্বালার হাত থেকে বাঁচবো—'।

সূর্যশংকর ভাবে এই একই কথা অমর আর একদিন তাহাকে বলিয়াছিল। এতই যাহাদের বিবেক তাহারা যে কেন বিবেক বিকায় কে জানে? অমর যেমন ভাবপ্রবণ ছেলে তাহাতে তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করা অসম্ভব নয়। বরং মতিগতি দেখিয়া যাহা মনে হইতেছে তাহাতে হয়ত শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা না করিলেও ছেলেটা যে সাধারণ মানুষের মানসিক ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বিকৃতমন হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয়, হউক। সূর্যশংকর কি করিতে পারে। এ-জগতই এমন!

পরের দিন সন্ধ্যায় সূর্যশংকর আসিল হীরার কাছে।

অনেকদিন পরে বড়সাহেবকে দেখিয়া হীরা খুবই খুশী।

খানিকটা আজে বাজে গল্প করার পর সূর্যশংকর হাসিমুখেই তাহার ছোটকিমাতলা ত্যাগ করার সংবাদটা জানায়।

হীরা প্রথমটায় বিশ্বাস করিতে চায় না। ঝুটা বাত্। বড়সাহেব আবার কোথায় যাইবেন? সাহেবদের আবার নোকৃরী যায় নাকি! না, না, মালিক তাহার সহিত তামাশা করিতেছেন।

সূর্যশংকর হীরার কথা যতই শোনে ততই হাসে। হীরা তাহাকে কী যেন ভাবিয়া লইয়াছে।

সূর্যশংকর হীরাকে বুঝাইয়া দেয়, তামাশা নয়। সত্যসত্যই সে ছোটকিমাতলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

—কাঁহা যাইয়েগা, মালিক? হীরা অদ্ভুত স্বরে প্রশ্ন করে।

—যাঁহা আঁখ্ যায়।

—ঘর? আপ্‌কো মুলুকমে?

সূর্যশংকর মাথা নাড়ে। বলে, 'না।'

—তব্?

—জাঙ্গাল্—!

—জাঙ্গাল? হীরা বিস্ময় প্রকাশ করে। বড়সাহেব কি তাহার সহিত রগড় করিতেছেন? জঙ্গল তো পশুর জায়গা, মানুষের নয়। 'জাঙ্গল ত জানোয়ারোকা মুলুক হায় মালিক, আদমিকা না—।'

এও তো জানোয়ারের জায়গা। এই মানুষ কি জানোয়ার নয়! তুমি কি তেমন জানোয়ার দেখনি হীরাবাঈ।

বড়সাহেবের তত্ত্বকথাটা হীরা না বোঝে এমন নয়। অনেকটা সময় চুপ করিয়া থাকে। পিটার কেন, অনেক জানোয়ারই হীরা দেখিয়াছে। তবু, তবু যেন এখানে কী একটা আছে। হীরা গুমোট ভাবটা কাটাইয়া পরিহাস করে, 'জাঙ্গালমে ডেরা কাঁহা মিলেগা আপকা? খানা?'

—ডেরাসে কাম্ কিয়া? পেড় না হায়! সূর্যশংকর মেয়েটার বাস্তব-বোধের পরিচয়ে কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে থাকে।

সূর্যশংকরের হাসিতে হীরা কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া নিজেও বোকার মত হাসিয়া ফেলে।

'তুমে ভি চালো না মেরা সাথ?'

হীরা হাত নাড়িয়া অসম্মতি জানায়। হাসিয়া বলে, না, সে জঙ্গল যাইবে না। সে তো বড়সাহেবের মত শিকারী নয়। বাঘ ভালুকের পেটে গিয়া লাভ কি?

সূর্যশংকর জবাব দেয়, বড়সাহেব তো তাহার সাথে সাথেই থাকিবে; তবে আর ভয়টা কিসের।

ভয় কিসের? হীরা কোনো কথা বলে না। সূর্যশংকরের চোখের দিকে

এক মুহূর্তের জন্য তাকাইয়া চোখ নীচু করে! ভয় যে কিসের সে কথা হীরাও কি ভালো করিয়া জানে? না, জানে না। তবে ভয় সে পায়; ভরসাও করে না।

সূর্যশংকর চলিয়া যায়। বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া হীরা তাকাইয়া থাকে। টর্চলাইটের আলোয় পথ দেখিয়া দেখিয়া বড়সাহেব আগাইয়া যাইতেছেন। ঘন কুয়াশায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু সাহেবের বিজলীবালা হাতবাত্তির আলোটাই চোখে পড়ে। দেখিতে দেখিতে তিনি অনেকটা চলিয়া গেলেন। হোমসিগ্‌ন্যাল পার হইয়া সোজা চলিয়া যাইতেছেন। হীরার দৃষ্টি হোম-সিগন্যালের গায়ে আটকাইয়া যায়। অন্ধকারের মাঝে একটি টকটকে লাল আলো। পিটারের কথাটাও অকস্মাৎ মনে পড়ে। অসুস্থ পিটার যখন তাহার ঘরে শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় জ্বরে চিৎকার করিত তখন তাহার চোখে দুইটিও অমনই ঘন লাল ছিল। পিটারের সেবা করিতে করিতে মাঝরাতে হীরা যখন ক্লান্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইত হোমসিগন্যালের লাল আলোটাই তাহার চোখে পড়িত। তখন ওই লাল আলোটাই ছিল হীরার ভয়ের বস্তু। আর আজ? আজ আর ভয় হয় না। হীরা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার ভাগ্যের আকাশে অমনই একটা লাল আলো জ্বলিতেছে। যাওয়া-আসার সমস্ত পথই বন্ধ। পানওয়ালী হীরাবাঈয়ের জন্য না ঘর, না জঙ্গল। পথের মাঝেই তাহাকে বাঁচিতে হইবে।

*

আর এক সূর্যোদয়।

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ার স্পর্শে কুসুম চোখ মেলিয়া তাকায়। দেখে, সুধাকর কখন যেন মাথার দিকের জানালাটি খুলিয়া দিয়াছে। আকাশে ভোরের রঙ। সুধাকর মাথার কাছটিতে বসিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া আছে।

কুসুম কেন জানি হঠাৎ বড় লজ্জা পায়। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে। সুধাকর হাসে। বলে, 'উঠ্‌লি যে।'

গায়ের কাপড় ঠিক করিতে করিতে কুসুমও মুখ ফিরাইয়া হাসে; কোন জবাব দেয় না।

কুসুম চলিয়া যাইতেছিল। সুধাকর ডাকে। কুসুম বলে, 'বলো।'

—শোন্ না। সুধাকর কাছে ডাকে।

—গোঁসাই উঠেছেন। কুসুম কাছে আসে।

কুসুমের হাত ধরিয়া সুধাকর কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। কুসুমও। হঠাৎ সুধাকর বলে, 'তুই কি সুন্দর রে কুস্‌মী।'

কুসুম হাসিয়া ফেলে। বলে, 'আমি যে কুসুম গো। কুসুম সুন্দরই হয়।'

*

শীতের সকালের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হেমন্তবাবুরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ মেলিয়া দেখেন ঘর শূন্য। জানালাটা খোলা। বিছানা ছাড়িয়া তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন।

—ছোট বৌ?

কোনো সাড়া শব্দ নাই। হেমন্তবাবুর বুকের মধ্যে একটা ভয় যেন আচমকা চাপিয়া বসে।

হেমন্তবাবু আবার ডাকেন, 'ছোট বৌ—'।

রান্নাঘর হইতেই এবার জবাব আসে, 'কি?'

—শোনো।

—যাই।

পদ্ম কাছে আসিলে হেমন্তবাবু উৎকণ্ঠার স্বরে বলেন, 'কি করছিলে এই সকালে?'

—স্টোভ ধরাচ্ছিলাম। চায়ের জল চড়াব বলে।

—না, না; তুমি ও-সব স্টোভ-টোভ ধরাবে না। কখনো নয়। হেমন্তবাবু পদ্মর হাত চাপিয়া ধরেন। চোখে মুখে এখনও স্পষ্ট এক আতংকের ছায়া।

পদ্ম নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। যেন পাথর। তাহার মুখে কথা নাই। দুঃসহ এক কান্না গলার কাছে আসিয়া পাক খায়, তবু পদ্ম আজ আর কাঁদিতে পারে না। ধীর পায় ঘরের দিকে আগাইয়া যায়।

